অতুলপ্রসাদ

মানসী মুখোপাধ্যায়

পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ : কলকাতা ১২



প্রকাশ :
শ্রাবণ ১৩৬৭

প্রকাশক
বিভাসচন্দ্র বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬

মুদ্রক
সিদ্ধার্থ মিত্র
বোধি প্রেস
৫ শংকর ঘোষ লেন
কলকাতা ৬
বাঁধিয়েছেন
অশোকা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৫০ পটলডাঙা স্ট্রীট
কলকাতা ৯

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পরম পূজণীয়েষু

ভূমিকা

বিগত তিন বছর ধরে অসুস্থতানিবন্ধন শয্যাশায়ী হয়েও চোখ মেলে চারিদিকে দেখছি শুধু অবক্ষয়ের ছবি। সাংস্কৃতিক জীবনের যে ক্ষতি দেখলাম তাকে ভাষায় প্রকাশের ক্ষমতা আমার নেই। বই পাড়ায় তো শুনি হাহাকার লেগেছে। এই অবস্থায় নতুন বই-এর প্রকাশনা সংবাদ নিশ্চয়ই আমার কাছে এক সঞ্জীবনী মন্ত্র নিয়ে এসেছে। এবং বাজার চলতি রমরমে কোনো উপন্যাস বা তথাকথিত বিপ্লবী বই এ নয়। এ বই নির্ভেজাল একটি জীবনী-গ্রন্থ। আর সে জীবনী এমন একজন মানুষের, যে মানুষটি ছিলেন দোষেগুণে গড়া শুধুই মানুষ—দেবতা বা মহামানব নয়।

আমাদের দেশ যেহেতু বহু-দেবতা পূজকের দেশ, তাই বোধ হয় আমরা প্রত্যহই আরও নতুন নতুন দেবতা গড়তেই আগ্রহী। মানুষকে কিছু গুণের আধার দেখলেই আমরা দেবতা বানিয়ে পূজা করতে শুরু করি। পৌরাণিক দেবতাদের চরিত্রে যদিও বা কিছু কিছু দোষের ছায়া পড়ে, কিন্তু আমাদের কল্পনা দিয়ে গড়া এই সব মানুষ-দেবতাদের হতে হবে সর্বদাই সর্বগুণাধার। তাই বাজারে যে সব জীবনীগ্রন্থ সমাদরে গৃহীত হয়, সেগুলিতে কোন মানুষের জীবনের বোধহয় ছাপ পড়ে না, পড়ে এক একজন পাথুরে দেবতার। সর্বমানবিক গুণ বা দোষমুক্ত এক অভ্রংলিহ কল্পনার পূজা করি আমরা সেই সব জীবনী-গ্রন্থ মারফত।

আবার তথাকথিত একদল গবেষক নামধারী লেখক কারো কারো চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করে হুজুগে-লোকের হাততালি কুড়োতে কোমর বেঁধে আসরে নেমে পড়েন। তত্ত্ববিকৃতি, তথ্যবিলোপ—কোনো পাপই বাদ দেন না এঁরা নিজ নিজ কার্যোদ্ধারকল্পে। এই দুটি ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে একটা গোটা মানুষের জীবনী বর্ণনার রীতি এদেশে বেশি প্রচলিত নেই। শ্রীমতী মানসী মুখোপাধ্যায়ের লেখা আলোচ্য 'অতুলপ্রসাদ' গ্রন্থটি পাঠের পর নিঃসন্দেহে ঘোষণা করতে পারি যে তিনি প্রকৃত গবেষকের ধর্মই পালন করেছেন।

অতুলপ্রসাদের জীবনী ও রচনাকে ভালো করে বুঝতে হলে তাঁর জীবনের

মূল মন্ত্রটি আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। অতি শৈশবেই ঈশ্বর-ভক্ত পিতার কাছেই তাঁর ধর্মজীবনের উন্মেষ। পরবর্তী জীবনের দুঃখ ও আঘাত তাঁকে আরও ঈশ্বরমুখীন করে তুলেছে, রুদ্রের শিবরূপই হয়েছে তাঁর আরাধ্য। "তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো"—এই ছিলো তাঁর প্রার্থনা। আঘাতের পর আঘাত পেয়ে, কোনো অভিযোগ না করে, তিনি প্রার্থনা করেছেন,—"আমারে ভেঙে ভেঙে করো হে তোমার তরী"। এই ঈশ্বরপ্রেমই তাঁর ব্যবহারিক জগতে মানবপ্রেমে রূপান্তরিত হয়েছিল, গেয়েছিলেন :—"সবারে বাস্ রে ভালো, নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে। আছে তোর যাহা ভালো ফুলের মতো দে সবারে", "আমারে রাখতে যদি আপন ঘরে, বিশ্ব-ঘরে পেতাম না ঠাঁই। দুজন যদি হত আপন, হত না মোর আপন সবাই"।

আমি অত্যন্ত সামান্য মানুষ ; কিন্তু আজকের দিনে আমি বোধহয় সব থেকে গর্বিত একজন মানুষও। কোন পুণ্যফলে জানি না, সারা জীবন ধরে এমন সব মানুষের সঙ্গ ও প্রীতিলাভ করেছি, যাঁদের মত মানুষ আর পরবর্তী শতাব্দীতে জন্মাতে দেখলাম না। অতুলপ্রসাদ তাঁদের একজন। তিনি ছিলেন আমার বয়োঃজ্যেষ্ঠ এক সুহৃদ। যাঁর স্নেহ-প্রেমে আমার জীবন ধন্য হয়েছে। কতো আলাপ-আলোচনা, কতো গল্প-গানে দিন কেটেছে তাঁর সঙ্গে, আজ স্মৃতির চলচ্ছবিতে যখন তাঁদের দেখি, মন এক স্বর্গীয় আনন্দে পূর্ণ হয়। মনে পড়ে, আমার বাড়িতেই তাঁকে গান শোনাচ্ছে আর এক গান-পাগল কবি স্নেহ-ভাজন নজরুল, গান শোনাচ্ছে শৈশবের বন্ধু অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে। কৃষ্ণচন্দ্র আজ অমর্ত্যলোকবাসী, নজরুল বেঁচে আছে, কিন্তু হায় মূক-স্মৃতিহারা! সুরের সে ত্রিধারা-সঙ্গমে স্নান আর কি কখনো হবে! শুধু আমার স্মৃতি ছাড়া আজ তার আর রেকর্ড কই?

পুণ্যশ্লোক আচার্য অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আমার পিতৃবন্ধু ; তাঁর সন্তানদের সঙ্গে ছিলো তাই আমাদের আত্মীয়তার বন্ধন। হরীন্দ্রের তখন কিশোর বয়স। ঐ বয়সেই সে কবিত্বশক্তি আর সঙ্গীতের গুণপনা দেখিয়ে আদর কেড়েছিল গীতপাগল অতুলপ্রসাদের। তৎকালীন ওয়েলেসলী প্লেসের বাড়িতে হরীন্দ্রকে রেখে তাঁকে গান শেখাতেন অতুলপ্রসাদ কি অসীম যত্ন নিয়ে, দিনের পর দিন তা দেখেছি। পরবর্তীকালে হরীন্দ্রের কবি এবং সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে প্রচুর খ্যাতিতে অতুলপ্রসাদের সযত্ন শিক্ষা আর আশীর্বাদই পথপ্রদর্শক বলে আমার একান্ত বিশ্বাস।

অতুলপ্রসাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ হতে পেরে তাঁকে যেভাবে জেনেছি, শ্রীমতী মানসী মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তার কোনও পার্থক্য নজরে পড়লো না। গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করে, রচনাকালে বিচার বিবেচনা করে তিনি যেভাবে অপ্রয়োজনীয় তথ্য গ্রহণ ও অবান্তর অংশ বর্জন করেছেন, তাতে মুগ্ধ হয়েছি। শ্রীমতী একজন গোটা-মানুষের জীবনকথাই বলতে চেয়েছেন, পাথরের দেবতা তৈরী করতেও চান নি, কিংবা নোংরা কাদা লেপে চরিত্র বিকৃত করতেও তাঁর অনীহা। এটাই সবচেয়ে বড় কথা। তাঁর এই জন্ম শতবার্ষিকীর প্রণাম সুধীজনের স্বীকৃতিধন্য হোক—এই কামনা।

১।৩।১৫সি, দমদম রোড,
কাশীপুর, কলকাতা ২

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

লেখিকার কৈফিয়ত

জীবনরংগমঞ্চ থেকে অপরিচয়ের আবরণ তুলে ধরার পর পাদপ্রদীপের আলোয় যে কাহিনী স্পষ্ট হয়ে উঠবে তার জন্য আমি প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সে জীবনকাহিনী হল কবি, গীতকার, সুরকার, রাজনীতিবিদ ও দরদী মানুষ অতুলপ্রসাদের। তাঁর জীবন শুধু বৈচিত্র্যময়ই নয়, তা যেন একটি নাটকের মতই হৃদয়গ্রাহী—একটি জীবননাট্যের সব গুণসহ তা অনবদ্য, আবার অভাবনীয়।

এমনিই এক জীবনের কথা আমি নিষ্ঠার সংগে লিখেছি, নির্বাচন করেছি এমনই এক চরিত্র যাঁর পারিবারিক জীবন বিশেষ করে ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত জটিলতাপূর্ণ ছিল। লিখতে বসে প্রথমেই অনুভব করলুম জীবনকথা লিখব ভাবা যত সহজ লেখা ততো সহজ নয়; জীবনীকারের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইংল্যাণ্ডের মহাপরাক্রমশালী শাসক ক্রমওয়েলের ইচ্ছে হল যে নিজের প্রতিকৃতি কোন চিত্রকরকে দিয়ে আঁকাবেন। চিত্রকর এলে ক্রমওয়েল তাকে প্রথমেই এই বলে সাবধান করে দিলেন যে, "আমার যেমন চেহারা, মুখের যেখানে যেমন কাটা দাগ, তিল, আঁচিল আছে ঠিক তেমনি করে আঁকতে হবে।" অর্থাৎ তাঁর প্রতিকৃতি হবে তাঁর যথার্থ প্রতিরূপ। পশ্চিমে জীবনী লিখতে গেলে যাঁর জীবনচরিত লেখা হয় তাঁর ডায়েরীও ব্যবহার করা হয় এবং নির্বিচারে তাঁর দোষগুণ সম্বন্ধে সমালোচনা করা হয়।

কিন্তু আমাদের দেশে জীবন সম্বন্ধে ধারণা অন্যরূপ। জীবন-চিত্র রচনা করতে গেলে যাঁর জীবনকাহিনী লেখা হবে তাঁর এবং তাঁর পারিপার্শ্বিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ভাল ছাড়া মন্দ কথা বা অপ্রিয় সত্যকথা লেখা চলবে না।

কিন্তু এমনি সীমাবদ্ধ পরিবেশের মধ্যে সত্যিকারের জীবনী লেখা হয়ে উঠতে পারে না। এজন্য আমাদের দেশে জীবনচরিত লেখায় উৎসাহ কম এবং সত্যিকারের জীবনী পাওয়া যায় না।

আমি শুধু জীবনী লিখতেই অগ্রণী হইনি, অতুলপ্রসাদের মত ব্যক্তির জটিল জীবনকথা লিখতে সাহসী হয়েছি। এ খবরে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ কেউ আমায় ইংগিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত

জীবনকে যেন বাদ দিয়ে লিখি। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনকে বাদ দিয়ে বিশেষ করে অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে—যাঁর জীবন ও সাহিত্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত—কি করে জীবনী লেখা সম্ভব এবং কি করে তা সত্যিকারের জীবনচরিত হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য অতুলপ্রসাদের কবিসত্তাকে তুলে ধরতে যতটুকু দরকার আমি ততটুকুই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের উল্লেখ করেছি।

কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যা লিখেছি তার জন্য তাঁর আত্মীয়পরিজন, বন্ধুবান্ধব, গুণমুগ্ধ এবং ভক্তদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন কবির সমগ্র জীবনের ছবি দেখার প্রয়াস পান, আংশিক জীবন দেখে যেন ক্ষুণ্ণ না হন।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কেন অতুলপ্রসাদের জীবনকাহিনী লিখতে প্রবৃত্ত হলুম।

অতুলপ্রসাদের গান শৈশবকাল থেকে শুনে আসছি। তাঁর গান 'কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জবনে' তখন খুবই জনপ্রিয় ছিল। গণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় 'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা' গানটি ঘরে ঘরে তখন শোনা যেত।

ঘটনাচক্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অতুলপ্রসাদের কর্মস্থান লখনৌয়ের বাসিন্দা হলুম। নতুন করে অতুল-সংগীতের সংগে পরিচয় হল ; যেমন করুণ ভাষা তাঁর গানের তেমনি হৃদয়ঝরা তার করুণ সুর। গাইতে গিয়ে নিজের চোখেই জল এসে যায়। অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে কত গল্প শুনতুম কিন্তু আমার মনে যে প্রশ্ন তার জবাব পেতুম না—তাঁর গানের ভাষা ও সুর কেন এত মর্ম-বিদারক ?

সে ১৯৬৫ সালের কথা। লখনৌ সম্বন্ধে কিছু লিখি ভাবতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ল অতুলপ্রসাদের কথা। যোগাযোগও হয়ে গেল। আমাদের প্রতিবেশী, একজন অতুল-ভক্ত আমার মনের কথা শুনে খুব উৎসাহিত করলেন এবং পরামর্শ দিলেন কার কার কাছে অতুলপ্রসাদের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে খোঁজখবর পাওয়া যাবে।

শুরু হল আমার দোর থেকে দোরে ঘোরা। কত বিশিষ্ট ব্যক্তির সংস্পর্শে এলুম ; কত অভাবনীয় কাহিনী শুনলুম, বিচিত্র রকম অভিজ্ঞতা হল। আমার সংগ্রহের ঝুলি এমনি ভাবে দিনে দিনে ভরে উঠতে লাগল।

অতুলপ্রসাদের জীবনী লিখব সংকল্প নেওয়ার সংগে সংগে মনে প্রশ্ন জাগল জীবন ও জীবনী সম্বন্ধে। সব মানুষের জীবন-ই তো জীবন কিন্তু সব জীবন

নিয়ে কি জীবনকাহিনী লেখা যেতে পারে? আমাদের জীবনে প্রতিদিন কত ঘটনা ঘটে, সব কি আমাদের মনকে নাড়া দেয়? সব নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে কি আমরা মুগ্ধ হই? জীবনকে যদি নদীর সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে বৈচিত্র্যময়ী নদীই আমাদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। যে নদী পাহাড়ের বুকে মাথা ঠুকতে ঠুকতে উদ্দাম গতিতে উত্তাল প্রবাহে পথের সব বাধা ঠেলে এগিয়ে আসে তার সে আগমন আমাদের মনে সম্ভ্রম জাগায়। তারপর ঊর্ধ্ব থেকে মহাকলরবে নেমে আসা বা উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে মধুর সুরে গান গেয়ে বয়ে যাওয়া; শেষে দুইপারে দুই হাতে ঐশ্বর্য ঢেলে দিতে দিতে সাগরের বুকে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে তার জয়যাত্রার দিকে আমরা পরম বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় তাকিয়ে থাকি, ভাবি এই হল যথার্থ নদী-রূপ।

যথার্থ জীবন সম্বন্ধেও ঐ এক কথা এবং তেমনি জীবন-ই সত্যিকারের জীবনচরিত হয়ে উঠতে পারে। অতুলপ্রসাদের জীবন এমনি নদীর মতই বৈচিত্র্যময় ও বিস্ময়কর; তার পরতে পরতে রয়েছে হর্ষ, বিষাদ ও রোমাঞ্চ।

অতুলপ্রসাদ নিজেই গেয়েছেন,—"আমারে ভেঙে ভেঙে কর হে তোমার তরী"।

ভগবান তাঁর জীবনের প্রারম্ভ থেকেই তাঁকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। মা'র দ্বিতীয় বিবাহে অতুলপ্রসাদের বেদনাতুর মানসিক অবস্থা ডিকেন্সের স্মরণীয় চরিত্র ডেভিড কপারফিল্ডের মতই করুণ। তারপর তরুণ বয়সে সেই যুগে সমাজের বিরুদ্ধাচারণ করে নিজের মাতুল-কন্যাকে বিবাহ করার মধ্যে তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা ও অমিত দুঃসাহসের পরিচয় আমাদের মনে সম্ভ্রম জাগায়। সেই থেকে তাঁর সংগ্রামময় জীবনের সূত্রপাত

এরপর অতুলপ্রসাদ লখনৌয়ে এলেন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। বাংলাদেশে তিনি কবি ও সুরকার রূপে বিখ্যাত। একটি মাত্র গীতিকাব্যগ্রন্থ—"গীতিগুঞ্জ" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবি ও গীতকার রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। ঐ একটি মাত্র গ্রন্থের জন্য তিনি অমরতা লাভ করেছেন। দ্বিতীয় আর একটিও গ্রন্থ না লিখে একজন কবির এই সার্থকতা মনে হয় সাহিত্য জগতে এক দুর্লভ ঘটনা।

অতুলপ্রসাদ জীবনে এত সফলতা লাভ করলেও দাম্পত্যজীবনে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী সুখী হতে পারেন নি। হেমকুসুম নানা বাধার বিরুদ্ধে একক

সংগ্রাম করে এবং ক্রোধের আগুনে দগ্ধ হয়ে কক্ষচ্যুত তারকার মতই একদিন নিঃশেষ হয়ে গেছেন।

অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে তাঁর আত্মীয়া সুবালা আচার্য তাঁর প্রবন্ধ "অতুল"-এ লিখেছেন, 'মানুষ মাত্রেই দোষত্রুটি ও দুর্বলতা আছে। তাঁহারও তাহা থাকা স্বাভাবিক'। অতুলপ্রসাদ নানা সদগুণের অধিকারী এবং একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তবু তিনি আমাদেরই মত রক্ত-মাংসের মানুষ ছিলেন এবং মানুষ হিসাবে তাঁরও যে দুর্বলতা ছিল উপরোক্ত উদ্ধৃতি তার প্রমাণ।

তাঁর জীবনের দুঃখ কষ্টকে তাঁর দুর্বলতার পরিণাম একথা না বলে বরং বলা উচিত তাঁর নিয়তিই তাঁর জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। অমন বিচিত্র নিয়তি বড় একটা দেখা যায় না।

অতুলপ্রসাদের জীবনী লিখতে বহু ব্যক্তির অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়ে ধন্য হয়েছি। বলা বাহুল্য তাঁদের সহযোগিতা ও সাহায্য না পেলে, বিশেষ করে অতুলপ্রসাদের আত্মীয়-আত্মীয়াদের, এ জীবন-কাহিনী লেখা কখনো সম্ভব হত না।

অতুলপ্রসাদের কিছু সংখ্যক চিঠি ও কয়েকটি ভাষণ ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় নি। তাঁর ডায়েরীটি (পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য) প্রধানতঃ তাঁর গানের খাতা। কাজেই অতুলজীবনীর বিষয়বস্তু সংগ্রহ করতে সত্যপ্রসাদ সেনের ডায়েরী ব্যতীত অতুলপ্রসাদকে গভীর ভাবে জানতেন এমন দায়িত্বসম্পন্ন বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা, তাঁদের সহযোগিতা ও স্মরণশক্তির ওপর আমায় নির্ভর করতে হয়েছে। অবশ্য প্রত্যেক শোনা বৃত্তান্ত যখন একাধিক ব্যক্তির দ্বারা সমর্থিত হয়েছে তখনই তাকে বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করেছি।

এই গুরুত্বপূর্ণ জটিল জীবন-চিত্র রচনা করতে যাঁরা আমায় সাহায্য করেছেন তাঁদের নাম এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে দেওয়া হল। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের সকলের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি।

অতুলপ্রসাদকে অন্তরঙ্গভাবে জানতেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়-সেকালের একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সুধী। তিনি তাঁর ৮২ বছর বয়সে অনুগ্রহ করে এই গ্রন্থখানির জন্য একটি ভূমিকা লিখে এর গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। আমি এজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

এ ছাড়া শ্রদ্ধেয় শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় এই জীবন-কাহিনী রচনায় নানা উপদেশ

ও উৎসাহ দিয়েছেন এবং প্রীতিভাজন শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় আমার এই গ্রন্থ প্রকাশে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

অন্যতম সুগায়ক শ্রী এম. আর. গৌতম সংগীত সম্বন্ধে নানা তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে আমায় খুবই উপকৃত করেছেন। তাঁর কাছে সেজন্য আমি বিশেষভাবে ঋণী।

গ্রন্থ মুদ্রণে পরম স্নেহভাজন শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঋণ আমি অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করি।

মানসী মুখোপাধ্যায়



অতুলপ্রসাদ



পিতা ডাক্তার রামপ্রসাদ সেন



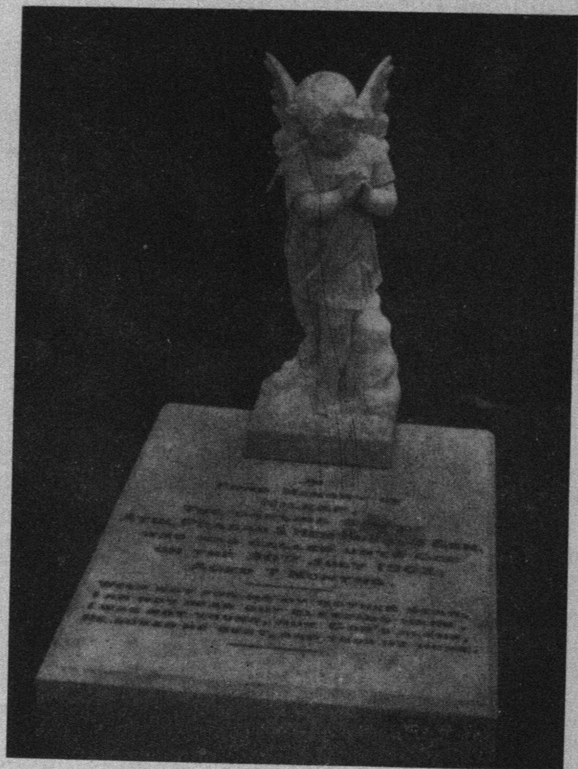
মাতা হেমন্তশশী দেবী



পত্নী হেমকুসুম দেবী ও পুত্র শ্রীদিলীপকুমার



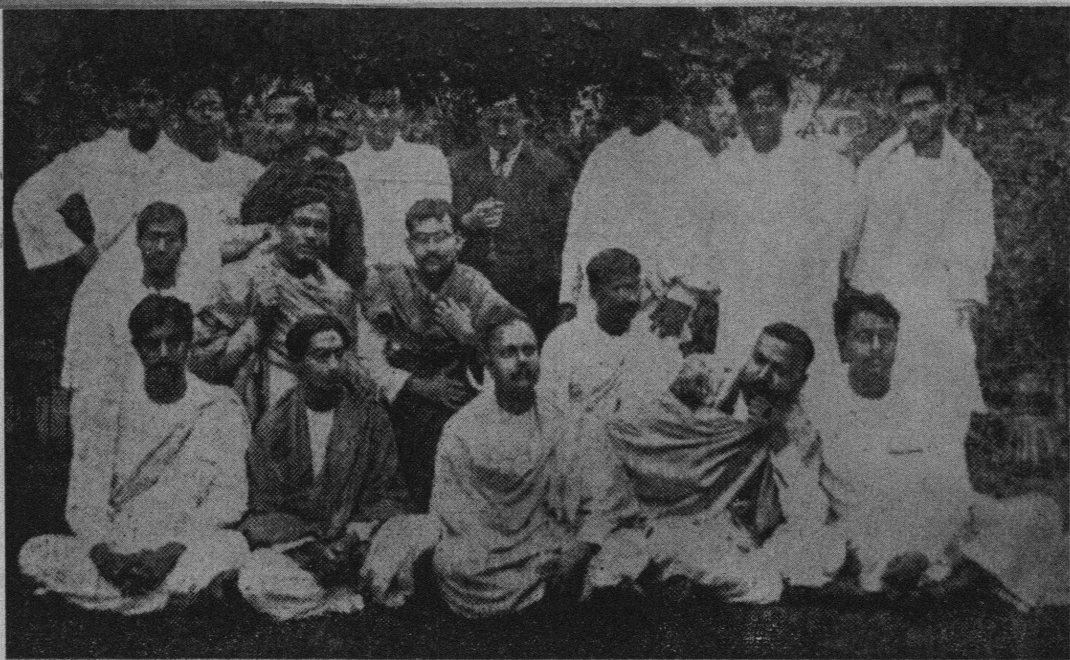
শ্রীদিলীপকুমারের যমজ ভ্রাতা
নিলীপকুমার, শৈশবেই বিলাতে থাকা কালে মারা যান



লণ্ডনে নিলীপকুমারের সমাধি



রামগড়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অতুলপ্রসাদ



মনডে ক্লাবে অতুলপ্রসাদ।

প্রথম সারিতে বসে ঃ—সুবিনয় রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, অতুলপ্রসাদ, শিশিরকুমার দত্ত, সুকুমার রায়।

মাঝের সারিতে বসে ঃ—যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমল হোম, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জীবনময় রায়।

দাঁড়িয়ে ঃ—হিরণকুমার সান্যাল, অজিতকুমার চক্রবর্তী, কালিদাস নাগ, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র সেন, গিরিজাশঙ্কর রায়চোধুরী।



শেষ শয্যায়

অতুলপ্রসাদের হস্তলিপি

সূচনা

[ঢাকা শহর। হিন্দু ও মুসলিম রাজত্বের রাজধানী ঢাকা, বহু হিন্দু ও মুসলমান সাধক, পীর, মহাপুরুষদের মহান স্মৃতিবিজড়িত ঢাকা, ইংরাজ রাজত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে তরুণ-বীরত্বের গৌরবমণ্ডিত ঢাকা। আবার মরমী গীতিকার ও সুললিত সুরকার অতুলপ্রসাদ সেনের পুণ্য জন্মভূমিও ঢাকা।]

অতুলপ্রসাদ যে শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে শতাব্দীকে চেতনার নবজাগরণের যুগ বলা যায়। ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যম ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শ শিক্ষিত তরুণদের দৃষ্টিকে আধুনিকতা দান করেছিল এবং জীবনের ধাপে ধাপে আলোড়নের ঝড় তুলেছিল বিশেষ করে ধর্মে সাহিত্যে ও রাজনীতিক্ষেত্রে। ১৮৫৮ থেকে ১৮৮৫ সাল, এই সময়ে আলোড়ন অত্যন্ত তীব্র রূপ ধারণ করে এবং বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও বিবর্তনবাদের পথ অনুসরণ করে নতুন নতুন ভাবাদর্শের উন্মেষের দ্বারা শতাব্দীটিকে স্মরণীয় করে তোলে।

একদিকে করুণা ও মৈত্রীর মূর্তিমান অবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সর্বধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টা ও ভক্তিবাদে ধনী-দরিদ্র সকলকে সহজ সরল ভাষায় অনুপ্রাণিত করছেন। অন্যদিকে যৌবন ও নবীনতার প্রতীক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তাঁর বলিষ্ঠ আদর্শে ও ওজস্বিনী ভাষণে বাংলার শিক্ষিত যুবকদের উত্তপ্ত করে তুলছেন। প্রাচীন ব্রাহ্ম নেতাদের সামনে নিত্য নতুন দাবি রাখছেন—ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন সরিয়ে দিয়ে সবাইকে এক শ্রেণীভুক্ত হতে হবে; অন্যায়কে সব শক্তি দিয়ে অন্যায় বলে প্রতিবাদ জানাতে হবে; স্ত্রীজাতিকে এগিয়ে নিয়ে পুরুষদের পাশাপাশি স্থান দিতে হবে। নিজের কিশোরী পত্নীকে পরিবারের বাইরে, সভায় নিয়ে গিয়ে তিনি নিজের বক্তব্যের সততা দেখালেন। বাংলা তথা সারা ভারতকে বক্তৃতায় মুগ্ধ করে বাগ্মী কেশব গেলেন ইংলণ্ডকে বিমোহিত করতে।

সাহিত্যে চিরাচরিত গণ্ডী অতিক্রম করে বিদ্রোহী মধুসূদন শ্রীরামচন্দ্রকে বাদ দিয়ে রাবণিকে নিয়ে রচনা করলেন নতুন ছন্দে নতুন কাব্যে "মেঘনাধ বধ"! রামচন্দ্রের সিংহাসন ত্যাগের চেয়ে লংকা রাজ্যভূমি—নিজের দেশের জন্য ইন্দ্রজিতের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ প্রশংসনীয় আদর্শ।

বিদ্রোহ ও দেশাত্মবোধক সুর যা প্রথম কবি রঙ্গলালের কাব্যে অনুরণিত হয়েছিল এবং পরে নবীনচন্দ্র এবং হেমচন্দ্র অনুসরণ করেছিলেন মধুসূদনের "মেঘনাদ বধ" কাব্যে তা-ই নতুন নিটোল রূপে দেখা গেল। নবীন লেখকরা নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেন, তরুণ পাঠকরা বিস্মিত ও উদ্বেলিত।

এরপর সাহিত্যের দিগন্ত উদ্ভাসিত করে উপস্থিত হলেন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র! রঙ্গলালের দ্বারা যার সূত্রপাত হয়েছিল, মধুসূদনের লেখনীতে যা নিটোল রূপ পেয়েছিল তাকে পরিপূর্ণতার সার্থক রূপ দিলেন সাহিত্য-সম্রাট।

আর রূপক নয়, পুরাণ নয়, কাহিনীর বিষয়বস্তু হল বাস্তব ঘটনা, চরিত্রের স্থান নিল সাধারণ মানুষ। ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের পর সন্ন্যাসী-বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে রচিত হল তাঁর "আনন্দ মঠ" পরবর্তীকালে বিপ্লবীদের 'বেদ'। আনন্দ মঠ-এ দেশের মাটি হলেন মা—আরাধ্যদেবী, আর তাঁরই বন্দনা গান হল 'বন্দেমাতরম্'।

তরুণ প্রাণ দেশাত্মবোধক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হল। এবার প্রয়োজন ভগীরথের যিনি বা যাঁরা সেই চেতনাগঙ্গাকে বহন করে সারা দেশকে সিক্ত, প্লাবিত, প্রাণবন্ত করে তুলবেন।

দেখা দিলেন দেশগুরু, বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রহ্মানন্দের ধর্মপ্রচার বা পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার সংগ্রাম প্রধানতঃ বাংলা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

সুরেন্দ্রনাথ শুধু বাংলা নয় সারা ভারতকে নতুন চেতনার সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়ে তুলতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পরিভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলেন, বিরামহীন পরিভ্রমণ। তার ফলে একদিন প্রতিষ্ঠা হল জাতীয় কংগ্রেস, কালে যা রাষ্ট্রীয়বোধ ও জাতীয় সংগ্রামের কেন্দ্রস্থল হল।

এ যুগের শিশুরা সাধারণত তাই ধর্ম, জাত সম্বন্ধে উদার, সাহিত্যে নতুন পথের দিশারী, পরিবর্তনের পূজক ও দেশাত্মবোধ, দেশানুগত্যের প্রতি তাঁদের অপলক দৃষ্টি এবং তদগত চিত্ত।

অতুলপ্রসাদ তাঁর যুগের যথার্থ প্রতিচ্ছবি।

॥ এক ॥

শরৎ কাল। শরতের ঝকঝকে আকাশে মেঘের আল্পনা, প্রকৃতির গায়ে উজ্জ্বল সবুজ রঙের পোশাক, নদী, খাল, বিল, পুকুর জলে পরিপূর্ণ হয়ে আনন্দে যেন টলটল করছে।

ঢাকায় ভাটপাড়া নিবাসী ঋষি কালীনারায়ণ গুপ্তের লক্ষ্মীবাজারের বাড়ি সেদিন উত্তেজনা ও আনন্দে চঞ্চল, উচ্ছল। তবে সে টলটলে আনন্দের মাঝেও বাড়ির মানুষগুলির মুখে-চোখে থেকে থেকে দেখা দিচ্ছে উদ্বেগ ও আশংকার ছায়া।

কালীনারায়ণ এবং তাঁর পত্নী অন্নদা দেবী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও বিচলিত; আবার উৎকর্ণও—কখন শোনা যাবে একটি শিশুকণ্ঠের কলধ্বনি। তারই অপেক্ষায় প্রতি পল প্রতি মুহূর্তের হিসেব করে চলেছেন, কিন্তু আর কত দেরি—

ক্রমে দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হল, ভাবনা তলিয়ে গেল আনন্দের তরংগাঘাতে। ভূমিষ্ঠ হল ফুলের মত অনুপম একটি শিশু। সে দিনটি ছিল ২০শে অক্টোবর, ১৮৭১ সাল। বাংলা মতে কার্তিক মাস ১২৭৮ সাল।[১]

মাতামহ কালীনারায়ণের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত, বিগলিত। সহর্ষে তিনি নবজাতককে ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদরূপে বুকে তুলে নিলেন। এইটি তাঁর সর্বপ্রথম দৌহিত্র। ভগবানের আশীর্বাদস্বরূপ পাইয়া তার নাম দিয়াছিলেন "অতুলপ্রসাদ"।[২]

অতুলপ্রসাদ ডাক্তার রামপ্রসাদ সেনের এবং হেমন্তশশী দেবীর প্রথম সন্তান।

পূর্ব পাকিস্তানে ফরিদপুর জেলায় মাদারীপুর পরগণার অন্তর্গত দক্ষিণ বিক্রমপুরের 'মগর' গ্রামে ৺রামলোচন সেন ও কৃষ্ণচন্দ্র সেন বসবাস করতেন। পরে ঐ গ্রাম 'পঞ্চপল্লী' ডাকঘরের অন্তর্গত হয়।

কৃষ্ণচন্দ্রের পেশা ছিল কবিরাজী। ইনি দরিদ্র গৃহস্থ ছিলেন। এঁর তিন

১—অতুলপ্রসাদ সেনের জন্মকাল থেকে আরম্ভ করে তাঁর বিলাত যাত্রা পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে ৺গুরুপ্রসাদ সেনের পুত্র ৺সত্যপ্রসাদের ডায়েরীতে পাওয়া গেছে। তাঁর ডায়েরীর ওপর ভিত্তি করেই সে পর্যন্ত লেখা হয়েছে।

২—৺সুবালা দেবী—"অতুল"

পুত্র ও দুই কন্যা ছিল, যথা—দুর্গাপ্রসাদ (এঁর অকালে মৃত্যু হয়), উমাতারা, গুরুপ্রসাদ, ভবসুন্দরী, রামপ্রসাদ। গুরুপ্রসাদ ভবসুন্দরীর ও রামপ্রসাদ উমাতারার স্বামীগৃহে থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন। গুরুপ্রসাদ শিক্ষাশেষে নিজেদের গ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন। রামপ্রসাদ পণ্ডিৎসায় উমাতারার নিকট থেকে বাংলা, পারসী ইত্যাদি শিক্ষালাভ শেষ করে প্রথম জীবনে জপ্‌সা গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী রামপ্রসাদের চঞ্চল মনকে ছোট্ট জপ্‌সা গ্রাম বেশিদিন কঠিন হাতে ধরে রাখতে পারে নি। দু চোখে আশার উজ্জ্বল স্বপ্ন নিয়ে রামপ্রসাদ একদিন গ্রাম ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন। বহু কষ্ট স্বীকার করে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় নিঃশঙ্ক রামপ্রসাদ শেষে কোলকাতায় পৌঁছুলেন।

তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্মের দিক্‌পালরা সব জীবিত ছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে রামপ্রসাদ মহর্ষির সহিত সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছিলেন। সহায়হীন পূর্ববঙ্গবাসী যুবকের দুঃসাহস, দৃঢ়চিত্ততা ও উদ্যম দেখে মহর্ষি মুগ্ধ হন। তাঁর দয়া ও সাহায্যে রামপ্রসাদ মেডিকেল কলেজে বাংলা ক্লাসে ভর্তি হবার অনুমতি লাভ করেন। তখন বাংলায় ডাক্তারি পড়ানো হত।

ডাক্তারি পাস করার পর রামপ্রসাদ প্রথমে সরকারী চাকরি গ্রহণ করে ঢাকায় পাগলা গারদের চার্জে কিছুকাল ছিলেন।

ব্রাহ্ম নেতাদের সাহচর্যে এসে বিশেষ করে মহর্ষির সংস্পর্শে এসে রামপ্রসাদ ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন; তাঁদের বিশ্বাস, ত্যাগ-স্বীকার, ঈশ্বর-নির্ভরতা দেখে বিমোহিত ও মুগ্ধ হন। শেষে মহর্ষির প্রভাবে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

চাকরিতে নিযুক্ত থাকাকালে রামপ্রসাদ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।[৩]

বলা বাহুল্য ব্রাহ্মধর্মে ধর্মান্তরিত অন্যান্য ব্রাহ্ম সন্তানদের মত তিনিও গৃহ ও সমাজচ্যুত হয়ে একাকী জীবন যাপন করেন।

৩—৺সত্যপ্রসাদ সেন তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন, "আমার জন্মের কিছুকাল পূর্বে খুড়া-মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণপূর্বক বিবাহ করেন।" সত্যপ্রসাদের জন্ম ২৩শে আষাঢ় ১২৭৮ সাল (ডায়েরী)। কেশবচন্দ্র সেনকে রামপ্রসাদ অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। মনে হয় কেশবচন্দ্র ১৮৬৯ সালে ৭ই ডিসেম্বর যখন তৃতীয়বার ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য ঢাকায় গিয়েছিলেন তখন রামপ্রসাদ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন।

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে রামপ্রসাদ ঋষি কালীনারায়ণ এবং অন্নদা দেবীর কন্যা হেমন্তশশী দেবীকে বিবাহ করেন।[৪]

হেমন্তশশী দেবী সুন্দরী, গুণবতী এবং অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা ছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি তিনি যেমন গভীর বিশ্বাসে নির্ভরশীলা ছিলেন তেমনি সাহসিনীও ছিলেন। তিনি স্নেহময়ী, সেবাপরায়ণা এবং স্বভাবে সহিষ্ণু ছিলেন। কবিতা ও গান রচনায় তাঁর আগ্রহ ও দক্ষতা ছিল। অবসর সময়ে ছোট ছোট কবিতায় তাঁর খাতা ভরে উঠত।

স্বাধীনচেতা রামপ্রসাদ পরের গোলামী করে সুখী হতে পারেন নি। বিবাহের পর স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেন। এরপর তিনি ঢাকাতেই হাসনা বাজারে মিরাতারের ভাড়া বাড়িতে 'মিট্‌ফোর্ড' হাঁসপাতালের বিপরীত দিকে 'নিউ মেডিকেল হল' নামে ডিস্‌পেন্সারি স্থাপনা করেন। ঐ ডিস্‌পেন্সারি তখন ঢাকায় সবচেয়ে বড় ওষুধের দোকান ছিল এবং রামপ্রসাদ ওখানে ডাক্তার হিসাবে প্রভূত যশ ও অর্থ অর্জন করেন।

রামপ্রসাদ স্বভাবে অত্যন্ত উদার ছিলেন। তিনি বিধবাবিবাহ তো সমর্থন করতেনই এমন কি সেই যুগে স্ত্রী হেমন্তশশীকে একদিন বলেছিলেন, "আমার অবর্তমানে তুমি পুনরায় বিবাহ করো।"[৫]

তিনি সুবক্তা ছিলেন, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সভায় যোগ দিয়ে বক্তৃতা করতেন। তাঁর গান রচনার দুর্লভ গুণ ছিল। হোলি ইত্যাদি পর্বোপলক্ষে নিজে গান রচনা করে সকলের সঙ্গে গাইতেন। তাঁর বাড়িতে নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ছিল। ফুল, ফল খুব ভালবাসতেন। বাড়িতে ফুল ও ফলের বাগান ছিল যা তিনি নিজে অবসর সময়ে তদারক করতেন।

চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন হলে রামপ্রসাদ নিজেদের গ্রামে "একটি স্কুল স্থাপন করে ছিলেন।"[৬]

রামপ্রসাদ যখন মিরাতারের বাড়িতে আসেন তখন অতুলপ্রসাদের জন্ম হয়। ওখানেই তাঁর চঞ্চল বাল্যের আনন্দ ও বিস্ময়ভরা দিনগুলি অতিবাহিত হয়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে মা-বাবার সব সদ্‌গুণগুলি বিকশিত হতে থাকে।

৪—৺সত্যপ্রসাদ সেন ডায়েরীতে লিখেছেন, "খুড়ামহাশয় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণপূর্বক বিবাহ করায় দেশে ধোপা-নাপিত বন্ধ হইয়া যায়।"

৫—৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।

৬—৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।

আর একজনেরও দুর্লভ সদ্‌গুণ তাঁর স্বভাবে একাকার হয়ে তাঁকে এক অসাধারণ, অসামান্য চরিত্র দান করেছিল। কিন্তু সে পরের কথা।

শৈশবকালে অতুলপ্রসাদের জীবনে দুটি মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু করুণাময়ের অপার করুণাঘন আশীর্বাদে তিনি মৃত্যুর কবল থেকে আবার জীবনের আলোয় ফিরে আসেন।

১২৮৩ সাল, পূর্ব বাংলার ভয়াবহ সময়। রামপ্রসাদের জীবনেও একটি মৃত্যু-ভয়-ভরা দিন।

রামপ্রসাদ সেবার শৈশবের লীলাভূমি নিজের গ্রামে স্ত্রী-পুত্রসহ বেড়াতে গিয়েছিলেন। প্রতি বছরই যেতেন। তখন ফেরার পালা। বজরায় করে প্রকৃতির থমথমে রূপ দেখতে দেখতে চলেছেন।

হঠাৎ যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করে প্রচণ্ড বেগে শুরু হয়ে গেল ঝড়-তুফান। তাই দেখে ভয়ংকরী নদী পদ্মা অট্টহাস্যে চঞ্চল হয়ে উঠল। ঝড়-তুফানের দাপটে ও পদ্মার তরংগাঘাতে বজরা চরের কাছাকাছি এসে খেলাঘরের নৌকোর মত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

মাঝি-মাল্লাদের সংগে সস্ত্রীক রামপ্রসাদ চরের উপর আশ্রয় নিলেন। কিন্তু সর্বগ্রাসী বন্যার জল তখন হু হু করে স্ফীত হয়ে উঠেছে। রামপ্রসাদ শিশু অতুলপ্রসাদকে নিজের কাঁধে তুলে নিলেন; পাশে সন্তানবতী স্ত্রী। জল তখন ভীমগর্জনে ওঁদের গলা অব্দি পৌঁছে গেছে।

শেষে মৃত্যুরূপী বন্যা সংযত হয়ে ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল। ভগবানের অশেষ করুণায় মৃত্যুর দ্বার থেকে ওঁরা সবাই প্রাণ নিয়ে আবার ঢাকায় ফিরে এলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা ঢাকাতেই ঘটেছিল। হেমন্তশশী পুত্র অতুলকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে লক্ষ্মীবাজারে যাচ্ছিলেন। বিদ্যুৎগতিতে ঘোড়া দুটি খালের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে; খুরে খুরে তাদের যেন চকমকির আলো। সভয়ে হেমন্তশশী দু হাতের বন্ধনে শিশু অতুলকে আঁকড়ে ধরে আছেন।

হঠাৎ-ই যা ঘটবার ঘটে গেল। ঘোড়া দুটি তাল সামলাতে না পেরে খালের জলে গাড়ি সমেত পড়ে গেল। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় অতুলসহ হেমন্তশশী খালের ধারে নরম মাটির ওপর ছিটকে পড়ায় মৃত্যুর সীমানা থেকে আবার প্রাণের জগতে উঠে এলেন।

কবি, গায়ক, ভক্ত রামপ্রসাদ প্রতিদিন খুব প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করতেন। তখনই শুরু হত তাঁর উষাবন্দনা ও সংস্কৃত শ্লোক পাঠ। উষাকে উদ্দেশ করে প্রতিদিন তিনি গাইতেন :—

অয়ি সুখময়ী উষে কে তোমারে নিরমিল
বালার্ক সিন্দূর ফোঁটা কে তোমার
ভালে দিল।

গানের কলি শিশু অতুলপ্রসাদকে প্রভাত হবার সংবাদ দিত। তিনি চেতনাজগতে ফিরে আসতেন; সুরের লহরী তাঁর মনে যেন ইন্দ্রজাল রচনা করত।

অতুলপ্রসাদ যখন প্রায় সাত বছরের তখন গুরুপ্রসাদ সেনের পুত্র সত্যপ্রসাদ ঢাকায় পড়াশোনা করবেন বলে মিরাতারের বাড়িতে আসেন। রামপ্রসাদই ব্যবস্থা করে তাঁকে আনিয়েছিলেন। তিনি অতুলপ্রসাদের চেয়ে কয়েক মাসের বড় ছিলেন।

রামপ্রসাদের গান শেস হতেই দুই বালককে উঠতে হত। তিনি তখন গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতেন; বালক দুইটিকে মুখস্থ করাতেন।

রামপ্রসাদের কণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক অতুলপ্রসাদকে আশ্চর্য ও মুগ্ধ করত। তিনি সেসব শ্লোকের মানে বুঝতেন না, বুঝবার বয়সও তখন নয়। কিন্তু সেসব সুরেলা শ্লোক তাঁর মনে যেন ঢেউ তুলত, মানে না বুঝলেও তার অনেকগুলি তিনি শুনে শুনে মনে ও কণ্ঠে ধরে রেখে দিতেন।

এই সংস্কৃত শ্লোকের প্রভাব তাঁর মনে কী গভীর রেখাপাত করেছিল এবং মনের গহনে কেমন সুরবোধ জাগিয়ে তুলেছিল তার কথা অতুলপ্রসাদ তাঁর পরবর্তী জীবনে বন্ধুবান্ধবের কাছে নিজেই উল্লেখ করে গেছেন।

প্রাতঃরাশের পর রামপ্রসাদ তার ডিস্‌পেন্সারীতে গিয়ে বসতেন। প্রতিদিন কত লোক তাঁর কাছে আসত—রুগী, অভ্যাগত, বন্ধুবান্ধব। ডাক্তার-বন্ধুরা এখানে তাঁর সংগে নিয়মিত মিলিত হতেন—ডাক্তার সূর্যনারায়ণ সিংহ, ডাক্তার দুর্গাদাস রায়, ডাক্তার প্রিয়নাথ বসু, কাশীচন্দ্র দত্তগুপ্ত এবং আরো অনেকে। তাঁরা এসে চা খেতেন, ধর্মালোচনা করতেন, গল্পও চলত। এখানে তাঁদের যেন ক্লাব ছিল।

রামপ্রসাদ এবার অতুলপ্রসাদ ও সত্যপ্রসাদকে স্কুলে দেবার কথা চিন্তা করলেন।

ডাক্তার দুর্গাদাস রায় সে সময়ে ঢাকায় 'মডেল স্কুল' নামে একটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। সাধারণ স্কুলে ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষা হয় না বলে তাঁর অনুযোগ ছিল। তাঁর স্কুলে পড়াশোনার সংগে সংগে ছাত্রদের নৈতিক-শিক্ষা-লাভ হবে এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

রামপ্রসাদ অতুলপ্রসাদ ও সত্যপ্রসাদকে দুর্গাদাসের স্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

অতুলপ্রসাদের সংগে দুর্গাদাসের তিন পুত্র জ্ঞানেশ, পরেশ ও দীনেশ পড়তেন। বংগচন্দ্র-পুত্র যোগেশ ও আরো কিছু ব্রাহ্ম ছাত্ররা ঐ স্কুলে ছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই অতুলপ্রসাদ অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও লাজুক প্রকৃতির ছিলেন আবার মিশুকও ছিলেন তাই সহপাঠীদের সংগে অন্তরংগ হয়ে উঠতে তাঁর দেরি হত না।

ঐ স্কুলের শিক্ষকরা সবাই নববিধান সমাজের লোক ছিলেন। প্রায় সকলেই একই বাড়িতে থাকতেন। প্রাতে উপাসনা শেষ হতে বারোটা বেজে যেত। স্নান-আহার সেরে স্কুলে আসতেন বেলা একটায়। এরপর পড়াশোনা বিশেষ হত না, কারণ ছাত্রদের স্কুলে এসেই পড়ার অভ্যাস গড়ে না ওঠায় তাঁরা সারা সময় কেবল গোলমাল করে কাটিয়ে দিতেন।

দুর্গাদাসের স্কুল এই ভাবে দু'বছর কেটে গেল। পড়াশুনার অগ্রগতি দেখে রামপ্রসাদ চিন্তিত হলেন। তারপর অতুলপ্রসাদ ও সত্যপ্রসাদকে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। অতুলপ্রসাদ নবম শ্রেণীতে ও সত্য-প্রসাদ দশম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন।

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন সাহেব জনসন পোপ। তিনি অত্যন্ত সদাশয় ও দয়ালু ছিলেন। কৈলাশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন অ্যাসিসটেন্ট হেড-মাস্টার। অন্যান্য শিক্ষক যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন অন্নদাচরণ সেন, গুরুপ্রসাদ ভৌমিক, দীননাথ সেন, সূর্যকুমার অবস্থি, প্রসন্ন বিদ্যারত্ন, সারদাচরণ রায়, সারদা পণ্ডিত এবং শশীভূষণ দত্ত—অতুলপ্রসাদের মেসোমশাই।

এই স্কুলে অতুলের কয়েকজন প্রিয় সতীর্থ ছিলেন, যেমন—প্রাণকৃষ্ণ বসু, নলিনী নাগ, নগেন্দ্র সোম। শেষোক্তজন পরবর্তীকালে মাইকেল মধুসূদনের জীবনী লিখেছিলেন।

পোপ সাহেবের পর প্রিন্সিপ্যাল হয়ে আসেন বুথ সাহেব। ইনি প্রকৃতিতে পোপ সাহেবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। গম্ভীর, রাশভারী মানুষ অংগ-ভঙ্গি করে ক্লাসে পড়াতেন।

অতুলপ্রসাদ ও তাঁর সতীর্থরা একত্র হয়ে পরামর্শ করলেন। তারপর বুথ সাহেবসহ অন্যান্য শিক্ষকদের নিয়ে একটি পদ্য লিখলেন :—

বুথের প্রধান কাজ অংগভংগি করা।
গোলমালে অবস্থির ঘণ্টা হল সারা।
বিদ্যানিধি ডাক্তার রায় বলিতে অক্ষম।
প্রসন্ন তাহাকে ভাবে সদা অনুপম।
সাহেবী ফ্যাসানে দক্ষ সারদারঞ্জন।
বুক ফুলিয়ে হাঁটেন বাবু সূর্যনারায়ণ।

স্কুলের সহপাঠী ছাড়াও আনন্দচন্দ্র রায়ের পুত্র সুধীর এবং গোবিন্দচন্দ্র রায়ের পুত্র সুবোধের সংগেও অতুলপ্রসাদের বন্ধুত্ব ছিল। সুবোধ খুব ভাল গান গাইতে পারতেন। তাঁর বাবার গান—'কত কাল পরে' ও 'নির্মল সলিলে' বার বার গাইতেন। আগ্রায় থাকার দরুন উনি হিন্দী গানও ভাল গাইতেন। ওঁদের সংগে গলা মিলিয়ে সুকন্ঠ অতুলপ্রসাদ গান করতেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহ নিয়ে ব্রাহ্মসমাজে আদর্শগত এবং নীতিগত ভেদের সৃষ্টি হয়েছিল। তার ফলে তুমুল আন্দোলন হয়েছিল যার জন্য ভারতীয় ব্রাহ্ম-সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়।[৭]

এ বিভেদের ঢেউ ঢাকাতেও গিয়ে আঘাত করল যার জন্য সেখানেও ব্রাহ্ম সভ্যরা দু ভাগে বিভক্ত হলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করলেন পণ্ডিত

৭—৺সত্যপ্রসাদ সেন তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন, "আমাদের ছোট সময়ে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার বিবাহ নিয়া মতভেদ হওয়ায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভাঙ্গিয়া নববিধান সমাজ আরম্ভ হইল।"

আসলে কেশব-কন্যার বিবাহ নিয়ে মতভেদ হওয়ার ফলে "পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি 'ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ' পরিত্যাগ করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র তখন ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের নাম রাখেন—'নববিধান সমাজ' (১৮৭৮)।"

"Brahmananda
Keshub Chandra Sen
Testimonies in Mamorium"
G. C. Banerjee.

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ঋষি কালীনারায়ণ গুপ্ত, রজনীকান্ত ঘোষ, প্রসন্নকুমার মজুমদার, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, পি কে রায় প্রভৃতি।

কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান সমাজকে প্রথম সমর্থন জানালেন রামপ্রসাদ সেন। তিনি কেশবচন্দ্রের অত্যন্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আরো যাঁরা কেশবচন্দ্রকে সমর্থন করেছিলেন তাঁরা হলেন বংগচন্দ্র রায়, কৈলাশচন্দ্র নন্দী, গোপীকৃষ্ণ সেন, বৈকুণ্ঠ ঘোষ, দুর্গানাথ রায়, ডাক্তার দুর্গাদাস রায় প্রভৃতি।

ঢাকায় তখন নববিধান সমাজের নিজস্ব উপাসনাগৃহ ছিল না। রামপ্রসাদের মিরাতারের বাড়ির দরজা সর্বদা উন্মুক্ত, অবারিত। প্রতি রবিবার সেখানেই উপাসনা-সভা বসত এবং গানবাজনা হত। ঋষি কালীনারায়ণ যদিও সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্য ছিলেন তবু ঐ উপাসনা-সভায় নিয়মিত যোগদান করতেন।

বালক অতুলপ্রসাদ ঐ উপাসনা-সভায় উপস্থিত থাকতেন; গানবাজনা শুনতেন এবং নিজেও শোনাতেন। রামপ্রসাদ যখন ব্রহ্মসংগীত গাইতেন তখন বালক অতুলপ্রসাদ পিতার খোল নিয়ে তাঁর গানের সংগে সংগত করতেন। তাঁর প্রয়াস দেখে মুগ্ধ রামপ্রসাদ তাঁকে একটি ছোট খোল কিনে দিয়েছিলেন।

কিন্তু একটি বাজনাতেই অতুলপ্রসাদের সুরেলা মন তৃপ্ত ছিল না। ঐ বয়সেই তিনি হারমোনিয়াম, বেহালা, বাঁশি ইত্যাদি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন।

কিন্তু বেশিদিন মিরাতারের বাড়িতে উপাসনা-সভার আয়োজন করা যায় নি। বাড়িওলার তাগাদায় রামপ্রসাদের ইচ্ছা ও আগ্রহে ছেদ পড়েছিল।

মিরাতারের কালীপ্রসন্ন বসুর বাড়িতে রামপ্রসাদ ভাড়া ছিলেন। ঐ বাড়িতে তাঁর এগারো বছর বসবাস করা হয়ে গিয়েছিল। বারো বছর বসবাস করলে বাড়ির ওপর তাঁর স্বত্ব জন্মে যেত তাই তাঁকে বাড়িওলার অনুরোধে বাড়ি ছেড়ে দিতে হয়।

নীড় ভেঙে গেল, ভেঙে গেল জীবন-ও। হেমন্তশশী অতুলপ্রসাদ, সত্যপ্রসাদ, হিরণ, কিরণ ও প্রভাকে[৮] নিয়ে কালীনারায়ণের নিকট চলে যান। রামপ্রসাদ ডিস্পেন্সারির পাশে একটি ঘর নিয়ে দিনের বেলায় থাকতেন, রাত্রি বেলায় লক্ষ্মীবাজারে চলে যেতেন।

৮—হিরণবালা, কিরণবালা ও প্রভাবতী—ডাক্তার রামপ্রসাদ ও হেমন্তশশীর তিন কন্যা। অতুলপ্রসাদের কনিষ্ঠা এঁরা।

উপাসনার স্থান নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। স্থির হল যে, সমাজের নিজস্ব একটি উপাসনা-গৃহ তৈরি করা হবে। টাকা চাই। রামপ্রসাদ ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন। ঘরে ঘরে ও দোকানে দোকানে চাঁদা সংগ্রহ করে বেড়াতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে তাঁর সম্মানীয় আত্মীয়-বন্ধুরা তাঁকে কত বিদ্রূপ ও কত নিন্দে করেছেন। কিন্তু আদর্শবাদী রামপ্রসাদ তাঁদের ব্যবহারে কখনো বিচলিত হন নি বা নিজের কর্তব্যকর্মে বিরত হন নি।

এরপর রামপ্রসাদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটি ব্রণ বিষাক্ত ফোড়ার আকার ধারণ করে। দুঃসাহসী রামপ্রসাদ আয়নার সাহায্যে নিজের ফোড়া নিজেই অপারেশান করেন।[৯] তাঁর বহুমূত্র রোগ ছিল। ফোড়া শেষে কার্বাংকলে দাঁড়ায়। রোগ বৃদ্ধির সংগে সংগে তাঁকে লক্ষ্মীবাজারে স্থানান্তরিত করা হয়।

সেদিন ১৬ই কার্তিক, ১২৯১ সাল। মৃত্যুর নিকষ কালো ছায়া ধীর অথচ দৃঢ় পায়ে রামপ্রসাদের শয্যাপার্শ্বে এগিয়ে এলো। তিনি আর উষার রাঙা আলো দেখার সুযোগ পেলেন না। পত্নী, প্রিয় পুত্র ও কন্যাদের সংগে সব বন্ধন ছিন্ন করে পরলোকে গমন করলেন।

এই মর্মান্তিক ঘটনার পর শোকাতুরা হেমন্তশশী পুত্র-কন্যাদের নিয়ে লক্ষ্মী-বাজারে থেকে যান।

সত্যপ্রসাদও কালীনারায়ণের স্নেহের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হন নি।

॥ দুই ॥

অতুলপ্রসাদের জীবনে তাঁর মাতামহের প্রভাব অসামান্য এবং অম্লান।

অতুলপ্রসাদ তাঁর মাতামহকে 'ঠাকুরদাদা' বলে ডাকতেন। শৈশব থেকেই তিনি ঠাকুরদাদার সদগুণ ও মামারবাড়ির শিল্পী-পরিবেশের সংগে পরিচিত ছিলেন।

কালীনারায়ণ প্রথম জীবনে অত্যন্ত ধার্মিক হিন্দু ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর সেই ধর্মকে নিষ্ঠার সংগে মান্য করে চলতেন।

৯—৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।

তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছেন শুনে মা ভাগীরথী দেবী[১] রেগে অস্থির। কালীনারায়ণ মার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে তাঁকে নত হয়ে প্রণাম করতে গেলেন। ক্রুদ্ধ ভাগীরথী দেবী দ্রুত পা সরিয়ে নিতে গেলে কালীনারায়ণের মাথায় তাঁর পা লেগে যায়। তিনি তখন শান্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, মা, আমার কী সৌভাগ্য! আমি তোমার পায়ের ধুলো নেবার আগেই তুমি তা আমার মাথায় দিয়ে দিলে।

পরব্রহ্মের প্রতি কালীনারায়ণের একান্ত বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ছিল। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের অকাল মৃত্যু হলে তিনি মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে প্রথমে ওঁ ব্রহ্ম উচ্চারণ করে প্রার্থনা জানালেন, 'হে প্রাণারাম, তুমি যে আজ দয়া করিয়া আমার স্নেহের ধনকে রোগ-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া দিলে এজন্য কৃতজ্ঞতা-ভরে তোমায় প্রণাম করিতেছি।'

তাঁর মধ্যে জাতের অহংকার ছিল না। হিন্দু মুসলমান—তাঁর প্রজাদের তিনি একই দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর নিজের একটি কালো পাথরের ভাত খাবার থালা ছিল। প্রতিদিন তিনি খাবার পরে তাঁর বাড়ির কুড়ি বছরের পুরনো মেথরকে ঐ একই কালো পাথরের থালায় খেতে দেওয়া হত। পরে সে থালাটি ধুয়ে তুলে রাখা হত পরের দিনের ব্যবহারের জন্য। প্রতিদিনই ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলত।

একবার গ্রামের এক নফর প্রথমে পাগল হয় ও পরে মারা যায়। কালী-নারায়ণ ঐ পাগলকে সপরিবারে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পাগল মারা গেলে তার মৃতদেহ দাহ করতে সবাই অস্বীকার করে। কালীনারায়ণ নিজেই তখন কীর্তন করতে করতে মৃতদেহ বহন করে দাহ করে আসেন।

তিনি মানুষের সঙ্গ বড় ভালবাসতেন এবং মানুষকে খাইয়ে বড় আনন্দ পেতেন। মাঘোৎসবের সময় তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রজাদের খাওয়াতেন। অন্ধ-আতুর-দীন-দুঃখী সবাইকে দু হাতে দান করতেন।

তাঁর গান রচনা করবার সহজাত শক্তি ছিল এবং 'ভাব সঙ্গীত' নামে তাঁর একটি গানের বই আছে। আবার অপূর্ব গায়কও ছিলেন। যখন কোন পর্বোপলক্ষে মৃদঙ্গ গলায় ঝুলিয়ে কীর্তন করতে করতে রাস্তা দিয়ে চলতেন

১—কালীনারায়ণ গুপ্ত কাওরাইদের নিঃসন্তান জমিদারের বিধবা পত্নী ভাগীরথী দেবীর দত্তক পুত্র ছিলেন। পালিতা মা হলেও কালীনারায়ণ ভাগীরথী দেবীকে নিজের মার মতই ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন।

তখন শত শত লোক মুগ্ধ হয়ে তাঁর সংগ নিতেন আর আনন্দে মত্ত হয়ে নৃত্য করতেন। "তখন হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান কাহারো ধর্মভেদ জ্ঞান থাকিত না।"[২]

কালীনারায়ণের চিত্রাংকন এবং মূর্তি গঠনের স্বাভাবিক গুণ ছিল। প্রজারা তাঁর স্বহস্তে নির্মিত পুতুল দিয়ে সাজানো কাছারিবাড়ির নাম দিয়েছিল—রংমহল।

হাস্যরসিক, মজলিশী ও সদানন্দ পুরুষ বলেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।[৩]

অতুলপ্রসাদ ঠাকুরদাদার প্রিয়তম নাতি বলে তাঁর সংগ নিবিড়ভাবে পেয়েছিলেন। ঠাকুরদা ও দিদিমা তাঁকে আদরে সোহাগে ঘিরে রেখেছিলেন। কিন্তু অত্যধিক আদর পেয়েও অতুলপ্রসাদের স্বভাবে বিকৃতি ঘটে নি। তিনি সর্বদা সব বিষয়ে তাঁর ঠাকুরদাদার অনুকরণ করতেন এবং এইভাবে ঠাকুরদাদার সব সদগুণগুলি তার মধ্যে অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে।

সংগীত ছিল অতুলপ্রসাদের রক্তে, হৃদয়ে ও কণ্ঠে। ঠাকুরদাদা প্রায়ই নগর-কীর্তনে বেরিয়ে পড়তেন। বালক অতুলপ্রসাদ তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করতেন, ঠাকুরদাদার কীর্তনে সকলের সংগে তিনিও দোহার দিতেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা যেত বালক অতুল মাতোয়ারা হয়ে মূল গায়েন হয়েছেন আর ঠাকুরদাদাসহ অন্যান্য সকলে তাঁর সংগে দোহার দিচ্ছেন।

দানশীল ঠাকুরদাদা যাকে যা দিতে চাইতেন তা শিশু অতুলের কচি হাতের মারফত দেওয়াতেন। অতুলপ্রসাদও শৈশবকাল থেকে উদারমনা ছিলেন; কাউকে অল্প জিনিস দিয়ে তাঁর মন তৃপ্ত হত না, আনন্দ পেতেন না। এজন্য হেমন্তশশী মাঝে মাঝে হাসিমুখে বলতেন, "অতুলের জন্য আমায় ভিক্ষার চাউল সর্বদা ভাণ্ড ভরিয়া রাখিতে হয়। অল্প দিয়া তার প্রাণ কিছুতেই তৃপ্ত হয় না।"[৪]

অতুলপ্রসাদের খাওয়া শোওয়া বেড়ানো সবই ঠাকুরদাদার সংগে হত। খুব কাছাকাছি থাকার দরুন ঠাকুরদাদার সংগীতে, কাব্যে, চিত্রে অনুরাগ তাঁর শিশুমনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করত; খেলার ছলে চলত অনুকরণের

২—৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।

৩—বিমলা দাস—পিতৃস্মৃতি। বিমলা দাস কালীনারায়ণ গুপ্তের কন্যা।

৪—৺সুবালা দেবী—"অতুল"।

কাজ। তাঁর ঠাকুরদাদাকে অনুকরণ করা নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে।

কালীনারায়ণ গুপ্ত রোজ একটি চেয়ারে বসতেন। তাঁর পাশের চেয়ারে অতুলপ্রসাদ বসতেন। একদিন অতুলপ্রসাদ লক্ষ্য করলেন যে চেয়ারে বসা সত্ত্বেও তাঁর ঠাকুরদাদার পা দুটি মাটি ছুঁয়ে আছে কিন্তু চেয়ারে বসলে তাঁর পা মাটি ছুঁয়ে থাকছে না। শিশুবুদ্ধিতে তার কারণ বুঝতে না পেরে তিনি কেবলি চেয়ার থেকে ওঠানামা করছেন। জিজ্ঞাসা করলে বললেন যে, তিনি চেষ্টা করছেন চেয়ারে বসেও কি করে ঠাকুরদাদার মত পা মাটিতে রাখা যায়।

পিতৃবিয়োগের পর মামারবাড়িতে ঠাকুরদাদার সঙ্গ আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। সত্যপ্রসাদ তাঁর প্রাণাধিক সঙ্গী তো ছিলেনই, এখন সুবালা মাসী, পানিমামা ও বিনয়মামা[৫] তাঁর সঙ্গী হলেন।

পানিমামা ও বিনয়মামা গান-বাজনা ও চিত্রাঙ্কনে পটু ছিলেন আবার হাস্যরসিকও ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে অতুলপ্রসাদও ঐসব সুকুমার বৃত্তির চর্চা করতেন। কখনো তাঁর সুধা-কণ্ঠের গান শুনিয়ে সকলকে মুগ্ধ করতেন। আবার অন্যকে নকল করার বিশেষ ক্ষমতাও তাঁর ছিল। তাই দেখিয়ে সকলকে হাসিয়ে অস্থির করতেন, আনন্দ দিতেন।

মামারবাড়ির শিল্প-সঙ্গীতের আবহাওয়া ছাড়াও ঢাকা শহরে তখন এমন মহল্লা ছিল না যা সঙ্গীতচর্চা-মুক্ত। গানের আসর তো বসতই আবার বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে ঢাকা শহর গান-বাজনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত—যেমন হোলির সময়।

যখনি কোথাও গান-বাজনা হত সঙ্গীত-পাগল অতুলপ্রসাদের উত্তেজনা উৎসাহের সীমা থাকত না; সুরের স্রোতে তিনি যেন আনন্দে নিজেকে ভাসিয়ে দিতেন। গান-বাজনা শোনা বা নাটক দেখার সুযোগ হলেই তিনি ঠাকুরদাদা বা মামাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়তেন, সময় নষ্ট করতেন না।

হোলির সময় ঢাকায় গান নিয়ে প্রতিযোগিতা চলত। এক বছর লক্ষ্মী-বাজারে রাজাবাবুর ময়দানে ও অন্য বছর উর্দুবাজারে লালাবাবুদের বাড়িতে পালা করে হোলির গান হত। সুর-তান-লয় নিয়ে সে-সব গানের আবার বিচারও হত। গানের মধ্যে এমন ভাষা ব্যবহার করা হত যে গায়ক গানের ছলে

৫—৬কালীনারায়ণ গুপ্তর তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ (পানি), বিনয়চন্দ্র।

প্রশংসা করছেন কি কটূক্তি করছেন বোঝা মুশকিল হত। 'ভানু' নামে এক ওস্তাদ গাইয়ে ছিলেন। তিনি একবার গাইলেন :

'ভানু কী জ্যোতি সে ভর দেগা তেরা চাঁদবদন।'

শুনে অতুলপ্রসাদের রসিক মন উছলে উঠল। চুপিচুপি বিনয়মামাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভানু ওস্তাদ 'ভানু কী জ্যোতি সে' বললেন, না, 'ভানু কী জুতি সে' বললেন ?

মামাও রসিক। জবাব দিলেন, ও দুটো কথাই বলে ভানু ওস্তাদ।

ঢাকায় আর একটি দর্শনীয় উৎসব ছিল জন্মাষ্টমীর মিছিল। উৎসবের প্রারম্ভেই জনজীবনে উত্তেজনা ও উৎসাহ দেখা দিত। অতুলপ্রসাদের উৎসুক উদ্‌গ্রীব মনে যেন সাড়া পড়ে যেত। মামাদের সঙ্গে রুদ্ধশ্বাসে পরামর্শ হত, সদলবলে হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়াতেন, নিঃশব্দ পায়ে এ-রাস্তা ও-রাস্তা দিয়ে খালের ধারে পেঁছে যেতেন।

নয়া সরকারের খালের ধারের দক্ষিণে তাঁতিবাজার ও উত্তরে নবাবপুর। এ স্থান থেকে জন্মাষ্টমীর মিছিলের যাত্রা শুরু হত। ঢাকাবাসীরা কাতারে কাতারে এখানে এসে জমা হতেন মিছিল দেখতে, মেলা দেখতে। ঐ সময় জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে মেলাও বসত।

জন্মাষ্টমীর মিছিল এক এলাহী ব্যাপার ছিল এবং খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করা হত। মিছিলের প্রথমে থাকত শতাধিক ঘোড়া ও পঞ্চাশ-ষাটটি হাতি। বহু মূল্যবান পোশাক পরিয়ে তাদের সাজানো হত। বড়বড় চৌকি সঙ্গে যেত যার ওপর পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ঘটনার অপূর্ব চিত্র আঁকা থাকত।

শীতকালে আর এক উৎসব হত—বনবিহার। বালক শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-বিহারের নানা দৃশ্য মাটির পুতুলের সাহায্যে দেখানো হত, অদ্ভুত সুন্দর সব মাটির পুতুল।

কালীনারায়ণ গুপ্ত অতুলপ্রসাদ সহ অন্যান্য নাতিদের এই উৎসব দেখাতে বহুবার সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজে শিল্পী ছিলেন। শিল্পীর চোখ দিয়ে মূর্তিগুলি দেখতেন এবং তাদের গুণাগুণ বিচার করে নাতিদের বোঝাতেন। কখনো আবার হাসি-গল্পের মধ্য দিয়ে তাদের সরল ব্যাখ্যা করেও শোনাতেন।

শৈশবকালে অতুলপ্রসাদ ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা প্রথম যে নাটক দেখার সুযোগ

পেয়েছিলেন তা হল নবাবপুকুরের "শকুন্তলা"। করুণরসসিক্ত কাব্যপূর্ণ জীবননাটক শকুন্তলা কি রোমাঞ্চ ও বিস্ময় নিয়ে রুদ্ধনিঃশ্বাসে অতুলপ্রসাদ দেখেছিলেন! তারপর একে একে দেখলেন "সীতার বনবাস", "নীলদর্পণ" ইত্যাদি।

এই সব নাটকের প্রাণ ছিলেন অতুলপ্রসাদের সেজমামা (পানি)। তিনি যেমন নাটক সম্বন্ধে মহাউৎসাহী ছিলেন, তার জন্য পরিশ্রম করতেন, আবার অভিনয়ও করতেন।

শকুন্তলা নাটকের কোন কোন গানের সুর অতুলপ্রসাদের কোন কোন্ গানে পাওয়া যায়। যেমন :—

"বধূ ধর ধর মালা পর গলে"।

তাঁতিবাজারেও নাটক হত। "মালতী-মাধব" নামে একটি নাটক হয়েছিল যার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন চন্দ্রনাথ রায়। ইনি একটি বাউলের দল করেছিলেন। বাউল সেজে সকলে রাত্রিবেলায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে বাউল গান গেয়ে শোনাতেন। এই বাউল গানের রেশ অতুলপ্রসাদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল ; তার উদাসী সুরের ঝর্ণা তাঁর মনে বুঝি প্লাবন এনে দিয়েছিল। তাই দীর্ঘ সময়ের সীমানা পেরিয়েও তাকে ভুলতে পারেন নি। পরবর্তীকালে তাঁর অনেক গান তাই বাউল সুরে রচিত হয়েছে।

নাটক ব্যতীত ঢাকাতে সে সময় যাত্রাগান হত। গোবিন্দ কীর্তনীয়া অপূর্ব কীর্তন গাইতেন। এ ছাড়া কবিগান এবং খেমটা নাচও হত।

অতুলপ্রসাদের মুসলমান-প্রীতি ছিল আশৈশবের। তার প্রথম কারণ ছিল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব। তখনকার দিনে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনকার দিনের মত বিদ্বেষ এমন তীব্রভাবে দেখা দেয় নি। "তখন হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়াই এই সকল আমোদে যোগ দিত। কি মহরমের তাজিয়া, কি জন্মাষ্টমীর মিছিল, কি হোলির গান হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর পরস্পরের উৎসবের আনন্দে গলাগলি হইয়াই উপভোগ করিত।"[৬] এমনি সব উৎসবে অতুলপ্রসাদ ঠাকুরদাদার সংগে অংশ নিয়ে আনন্দ পেয়েছেন, আনন্দ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় কারণ, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার জন্য উচ্চবর্ণ হিন্দুদের দ্বারা অতুল-প্রসাদের পরিবার পরিত্যক্ত হন। নীচজাতীয় হিন্দু এবং মুসলমানদের সংগে

৬—৺সত্যপ্রসাদ সেনের ডায়েরী।

তাঁদের মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তা যেন আত্মীয়তায় পরিণত হয়।[৭] এই প্রকার আত্মীয়ের ন্যায় মেলামেশা করার দরুন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিশ্বস্ত ও প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল অতুলপ্রসাদের জীবনে সায়ংকালেও তার পরিবর্তন ঘটে নি বা তা বিচ্ছিন্ন হয় নি।

অতুলপ্রসাদ নানা গুণে কীর্তিমান ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রধান কীর্তি এবং শ্রেষ্ঠতম অবদান হল তাঁর গীতিকবিতা যার প্রথম স্ফুরণ সাধারণের চোখে পড়ে, যখন তিনি মাত্র চোদ্দ বছরের কিশোর।

পারিপার্শ্বিক প্রভাব ও অনুকূল পরিবেশ অতুলপ্রসাদের মনে যেন সোনার কাঠির স্পর্শ দিল। তিনি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে চোখ মেলে তাকালেন; হৃদয়ের অতলে সুপ্ত কাব্যপ্রতিভা ও কল্পনাশক্তি এবার একটি একটি করে পাপড়ি খুলতে লাগল।

"ছেলেবেলা হইতেই তাহার কবিতা লিখিবার অভ্যাস ছিল…।"[৮] এবং এ বিষয়ে অতুলপ্রসাদ যে তাঁর কাব্যিক ঠাকুরদাদা ও শিল্প-সংগীতপ্রিয় পানিমামা, বিনয়মামার কাছ থেকে সমর্থন, উৎসাহ পেতেন তা স্বাভাবিক। একদিন একটি অপূর্ব গীতিকবিতা লিখে তিনি বাড়ির সবাইকে বিস্মিত ও বিমোহিত করেছিলেন।

সেদিন সকালে পড়ার ঘরে কারুরই পড়াশোনায় মন বসছে না। বাড়িতে আজ উৎসব; ছোট্ট বোন তপুসির[৯] আজ অন্নপ্রাশন। সবাই হৈ হৈ করে বেরিয়ে গেলেন। চুপচাপ বসে রইলেন শুধু অতুলপ্রসাদ; মৌনমুখে তিনি যেন কোন ভাবনায় নিমগ্ন।

পরে আস্তে কাগজ-কলম টেনে নিলেন। মনের মধ্যে তখন বুঝি শত তরঙ্গের জলোচ্ছ্বাস, প্রকাশের জন্য কল্পনার অসহ্য আকুলতা, আনন্দ ও উত্তেজনায় কবি-চিত্ত অস্থির। ক্রমে কিশোর-কবি শান্ত হলেন। তারপর তিনি লিখলেন:—

৭—৺সত্যপ্রসাদ সেন তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন, "খুড়ামহাশয় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণপূর্বক বিবাহ করেন। সেই জন্য দেশে ব্রাহ্মণ সমাজ নাকি আমাদের বাড়ীর লোকদিগকে একঘরে করেন।……অন্যদিকে আমাদের নীচ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক ছিল, আমরা কাউকে দাদা, কাকা, খুড়ী জেঠী ইত্যাদি সম্বোধন করিতাম।

৮—৺সুবালা দেবী—"অতুল"

৯—তপসী (ইলা সেন)—৺কালীনারায়ণ গুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের কনিষ্ঠ কন্যা।

তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে
উঠিল কুসুম ফুটিয়া।
এ নব কলিকা হউক সুরভি
তোমার সৌরভ লুটিয়া।
প্রাণের মাঝারে নাচিছে হরষ
সব বন্ধন টুটিয়া।
আজি মন চায় অঞ্জলি লয়ে
ধাই তব পানে ছুটিয়া।
যে প্রিয় নামটি দিলাম শিশুরে
স্নেহের সাগর মথিয়া।
সে নামের সাথে তব পূত নাম
থাকে যেন সদা গ্রথিয়া।
হাসি দিয়ে এরে কর গো পালিত
তব স্নেহ-কোলে রাখিয়া ;
নয়নেতে দিও, মাগো স্নেহময়ী,
প্রেমের অঞ্জন আঁকিয়া।
যেন স্বার্থের কঠিন আঘাতে
যায় না কুসুম ঝরিয়া।
রক্ষিও নাথ, তোমার বক্ষে
সকল দুঃখ হরিয়া
দেখ প্রভু দেখ চালাইয়ো এরে
তুমি নিজ হাতে ধরিয়া ;
মঙ্গল-পানীয় দিও তুমি দিও
পরাণ পাত্র ভরিয়া।
দীর্ঘায়ু হোক এ কোমল শিশু
সকলের প্রেমে বাড়িয়া ;
সে জীবন প্রভু, যেন কোথা কভু
না যায় তোমারে ছাড়িয়া।

গীতিকাব্যটি পড়ে মনে হয় তপসির 'ইলা' নামটি অতুলপ্রসাদই দিয়েছিলেন।

অতুলরা লক্ষ্মীবাজারে থাকাকালীন পানিমামার বিবাহ হয়। বিবাহের পাত্রী ছিলেন ডাক্তার দুর্গাদাস রায়ের একমাত্র কন্যা বিনোদিনী, অতুলপ্রসাদের বাল্যসঙ্গিনী। কী বিস্ময়, কী আনন্দ! সেজমামী যেন শুধু মামী নন, আরো কিছু বেশি।

বাংলার মাটিতে স্বদেশপ্রেম লুকিয়ে আছে, আকাশে-বাতাসে তারই আহ্বানবাণী, মানুষের রক্তের প্রবাহে রয়েছে উন্মাদনা। বাংলার কিশোর, তরুণদের তাই আখড়া হাতছানি দিয়ে ডাকে, সাহিত্য তাদের মনে আগুন জ্বালায়, উত্তেজনা যোগায়। অতুলপ্রসাদের কিশোর বয়সে বাংলাদেশের আবহাওয়া এমনিই ছিল।

সেই আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করে তুললেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতায়। তাঁর বক্তৃতা শুনে বাংলার কিশোর তরুণ তখন মুগ্ধ, উত্তেজিত, বিক্ষুব্ধ। ঐ সব কিশোরদের মধ্যে অতুলপ্রসাদও একজন ছিলেন।

অতুলপ্রসাদের মধ্যে অল্প বয়স থেকেই বক্তৃতা করবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সুমধুর বক্তৃতা অনেকবার শুনেছেন। মনমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, টি. পালিত প্রভৃতি যিনি যখন ঢাকায় এসেছেন অতুলপ্রসাদ তাঁদের দেখতে ও বক্তৃতা শুনতে যেতেন।

আবার রাজনৈতিক নেতারাও আসতেন—যেমন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ ইত্যাদি। অতুলপ্রসাদ আগ্রহের সঙ্গে তাঁদের বক্তৃতা শুনতেন। শুনে তাঁদের বক্তৃতার নকল করার চেষ্টা করতেন।

শ্রীহট্টের ভূতপূর্ব মাস্টারমশাই দুর্গাদাসের পুত্র সত্যেন, জ্ঞান রায়, সত্যপ্রসাদ, অতুলপ্রসাদ, রূপবাবু বা আনন্দ মাস্টারমশায়ের বাগানবাড়িতে গিয়ে সেখানকার নিভৃত পরিবেশে নিশ্চিন্তে আলোচনা করতেন।

আলোচনার বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা, কেদারবাবুর বক্তৃতা এবং কংগ্রেসের কার্যাবলী। অতুলপ্রসাদের চোখে সুরেন্দ্রনাথ তখন আদর্শ পুরুষ। আলোচনাকালে অতুলপ্রসাদ সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করে শোনাতেন।

একবার সুরেন্দ্রনাথ ঢাকায় আসবেন, তখনো এসে পৌঁছান নি। কিন্তু তাঁর আসা অবধি অতুলপ্রসাদ ধৈর্য ধরে থাকতে পারেন নি। তিনি রওনা হয়ে আগেই নারায়ণগঞ্জ পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং সাক্ষাৎ সেরে সুরেন্দ্রনাথের

সংগে আলাপ-আলোচনা করতে করতে ঢাকায় ফিরে এসেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের মনে দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তাঁকে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে তাই অতুলপ্রসাদ অত্যন্ত বিশ্বাস ও ভক্তি করতেন। যেবার সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে যোগ দিলেন না, অতুলপ্রসাদ ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন—"The National Congress without Surendra Nath Banerjee is a mere farce."

বিধবা হবার পর হেমন্তশশী প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। বেশী শরীর খারাপ হলে বড় ভাই স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ তাঁকে কোলকাতায় এনে নিজের কাছে রেখে চিকিৎসা করাতেন।

কখনো কখনো হেমন্তশশী একা একটি ঘর নিয়ে অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিন কাটাতেন, ভগবানের নাম করতেন, কবিতা লিখতেন। আবার কখনো চিন্তা করতেন তাঁর চারটি সন্তান-সন্ততি—অতুলপ্রসাদ, হিরণ, কিরণ, প্রভার ভবিষ্যৎ।

সেবার তখন তিনি কোলকাতায়। অতুলপ্রসাদ ঢাকায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছেন। তাঁর হাতে দীর্ঘ, অফুরন্ত সময়। রবিবার দিন তাই ঠাকুরদাদা ও মামাদের সংগে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যেতেন।

১৮৯০, জুন মাসের এক রবিবার অতুলপ্রসাদ ঠাকুরদাদা, সত্যদাদা ও মামাদের সংগে ব্রাহ্মসমাজে গিয়েছিলেন।

সবাই ফিরে এসে দেখলেন বাড়ির চেহারা যেন কার অভিশাপে হঠাৎ বদলে গেছে; সবাই যেন শোকে, দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। অতুলপ্রসাদ দেখলেন তাঁর বোনেরা কাঁদছে, মাসীরা কাঁদছেন, সবচেয়ে শোকাতুরা হয়ে কাঁদছেন তাঁর দিদিমা। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন, কী ব্যাপার! তবে কী কোলকাতায় মার কিছু হয়েছে? দিদিমাকে ভয়ার্ত কণ্ঠে মার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে কোন উত্তর পেলেন না। তাঁর হাতে একটি চিঠি ধরা ছিল।

চিঠি পড়ে জানা গেল সেটি লিখেছেন স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ, বড়মামা। তিনি চিঠিতে জানিয়েছেন যে, হেমন্তশশী দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন। যাঁকে বিবাহ করেছেন তিনি হলেন দুর্গামোহন দাশ। [১০]

১০—দুর্গামোহন দাশ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জেঠা। দুর্গামোহন যথেষ্ট ধনী ছিলেন এঁরই এক পুত্রের সঙ্গে কালীনারায়ণ গুপ্তের এক কন্যার (বিমলা) বিবাহ হয়েছিল, সেই সূত্রে দুই পরিবারের মধ্যে পরিচয় এবং যাতায়াত ছিল। হেমন্তশশী কোলকাতায় থাকাকালে দুর্গামোহন দাশ তাঁর খবরাখবর করতেন।

হঠাৎ কি আকাশটা বিকট শব্দে মাথার ওপর ভেঙে পড়ল! বিরাট এক ভূমিকম্পে পৃথিবী কি অন্ধকারের আড়ালে তলিয়ে গেল! বিস্মিত অতুলপ্রসাদ যেন এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তারপর দ্রুতপায়ে পড়ার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

পিতৃবিয়োগের পর মা-ই ছিলেন একাধারে সব। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অতুলপ্রসাদের কত নির্ভরতা, কল্পনা, স্বপ্ন আর......চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে গেল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে হেমন্তশশী অতুলপ্রসাদকে চিঠি দিলেন। লিখলেন, অতুল যেন বোনেদের নিয়ে কোলকাতায় চলে আসেন।

অতুলপ্রসাদের মন তখনো প্রচণ্ড অভিমানে আচ্ছন্ন। মনে মনে সংকল্প করলেন যে বোনেদের মার কাছে পৌঁছে দিয়ে নিজে অন্যত্র চলে যাবেন।

একদিন সত্যদাদা, বিনয়মামা, সুবালামাসীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হিরণ-কিরণ-প্রভা সহ কোলকাতায় রওনা হলেন। লক্ষ্মীবাজারের মামারবাড়ির সংগে সব সম্পর্ক ছিন্ন হল, ছিন্ন হল ঢাকার সংগেও; কত সুখদুঃখের স্মৃতিঘেরা এই শহর। এবার সবই স্বপ্ন হতে চলেছে।...

॥ তিন ॥

পদ্মানদীর দেশ থেকে পদ্মার মতই অশান্ত মন নিয়ে অতুলপ্রসাদ কোলকাতা মহানগরীতে এসে পৌঁছলেন। বোনেদের দুর্গামোহন দাশের বাড়ি মার কাছে পৌঁছে দিয়ে এলেন। নিজে মার সংগে সাক্ষাৎ করলেন না। মার প্রতি অভিমানে তাঁর মন তখন ক্ষতবিক্ষত। তিনি সোজা পানিমামার বাড়ি গিয়ে উঠলেন।[১] পানিমামা তখন ইনকাম ট্যাক্স্-অ্যাসেসর। অতুলপ্রসাদকে পেয়ে বিনোদিনীমামী মহাখুশি।

অতুলপ্রসাদ এরপর বড়মামার বাড়ি গেলেন। স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ তখন রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার। সেখানেও সবাই তাঁকে আদর করে কাছে টেনে নিলেন। মামাতো বোনেরা সহর্ষে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল, 'ভাইদাদা এসেছে!'

১—৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।

মামার বাড়ির সহৃদয় স্নেহ-মমতাপূর্ণ ব্যবহার অতুলপ্রসাদের আহত, বিক্ষুব্ধ মনের ওপর যেন পরম সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দিল। তিনি শান্তি পেলেন, সাহস পেলেন। না, এ বিশাল জগতে তিনি একা নন। তিনি সহজ হলেন, প্রফুল্ল হলেন।

এবার পড়াশোনা করা দরকার। অতুলপ্রসাদ প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন। মামারা তাঁদের বড় আদরের ভাগ্নেটিকে যত্ন করে পড়াতে লাগলেন।

অতুলপ্রসাদও পড়াশোনায় যেন তলিয়ে গেলেন। তাঁকে ভাল ভাবে পাস করতে হবে ; দু'চোখে তাঁর উজ্জ্বল স্বপ্ন, তিনি ব্যারিস্টার হবেন। বিলেত দেশটা কেমন দেখবেন।

এই কলেজে তাঁর সমসাময়িক ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, বিহারীলাল মিত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।[২]

দুর্গামোহন অতুলপ্রসাদের মনের ভাব বুঝে প্রথম দিকে তাঁকে বিব্রত করতে চান নি। তবে কিছুদিন পর তিনি একাধিকবার অতুলপ্রসাদের মেজমামার বাড়িতে যাওয়া-আসা শুরু করে দেন ; অতুলপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর বাড়ি যেতে এবং হেমন্তশশীর সঙ্গে দেখা করতে বার বার অনুরোধ জানান। ছেলের জন্য মা যে কত উতলা তা নানা ভাবে ব্যক্ত করেন।

মার জন্য অতুলপ্রসাদের মনও উতলা হত, কিন্তু তার চেয়েও বেশী ছিল তার অভিমান। ফলে দুর্গামোহনবাবুর অনুরোধ-উপরোধ অতুলপ্রসাদের নিঃশব্দ প্রতিবাদের কাছে গিয়ে ব্যর্থ হত, নিষ্ফল হত।

পরে অবশ্য মা-ছেলের সাক্ষাৎ ঘটে, দুজনের অশ্রুজলে দুজনে সিক্ত হন। তবে সে সাক্ষাৎ দুর্গামোহনবাবুর বাড়িতে নয়, অতুলপ্রসাদ আরো অনেক পরে দুর্গোমোহনবাবুর বাড়িতে যান। মার সঙ্গে অবশ্য এরপর থেকে তিনি মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ করতেন।[৩]

"বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টার হওয়ার প্রবল বাসনা অতুলের প্রাণে কিশোর বয়স হইতেই ছিল।"[৪]

এজন্য অতুলপ্রসাদ শুধু মনে মনে বাসনা নিয়ে বা স্বপ্ন দেখেই নিশ্চিন্ত

২—শ্রীযুক্তা বেলা সেন—"স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেন"। 'আমাদের কথা'

৩—সেন পরিবারের একজন নিকট আত্মীয়া—সাক্ষাৎ।

৪—৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।

ছিলেন না। তার জন্য তাঁর চেষ্টা এবং প্রস্তুতিও ছিল। তাই জানা যায়, "পাঠ্যাবস্থাতেই তার খুব বক্তা হইবার সাধ ছিল। যখন কলেজে পড়িত অনেক সময় দেখিয়াছি ছাদে পায়চারি করিতে করিতে বিড় বিড় করিয়া কি বলিত। পিছন হইতে 'কি করছ' বলিলে চমকিয়া জানাইত, 'কিছু না। এক জায়গায় কিছু বলার জন্য ছাত্রবন্ধুরা ধরেছে, তাই যা বলব তা অভ্যাস করছি'।"[৫]

অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে মনে আশার জাল বুনে চলেছিলেন। যে আশার কথা একদিন ছোটমাসীর কাছে ব্যক্ত করে ফেলেন, "আমার বিলেত যেতে এত ইচ্ছে করে কি বলব। যদি কেউ চাকর করেও আমায় সঙ্গে নিয়ে যায় আমি যেতে রাজী আছি।"[৬]

তাঁর আগ্রহ ও আন্তরিকতা এবার সার্থকতার রূপ নিল ; শেষ হল আশা-নিরাশার মাঝে দোলায়মান থাকা। তিনি বিলেত যাবেন। পাঠাবেন তাঁর মামারা।……"যৌবনে সাংসারিক ঘটনায় অতুলের প্রাণে এত আঘাত লাগিতেছিল। ফলে মাতুলদের কাহারো কাহারো প্রাণে এত সমবেদনা জাগিয়া উঠিয়াছিল যে অতুলকে দূরদেশে পাঠাইয়া তাহার প্রাণের জ্বালা প্রশমিত করিতে চেষ্টা করা সমীচীন মনে করিলেন। যা প্রায় অসম্ভব ছিল তাহা সম্ভব হইতে চলিল।"[৭] অতুলপ্রসাদ এ কথা তাঁহার সত্যদাদাকে (৺সত্যপ্রসাদ সেন) পরে বলেছিলেন যে এ বিষয়ে তাঁর মেজমামা তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। "এ জন্য অতুল আজীবন কৃতজ্ঞ ছিলেন। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ মাতুল-কন্যা সাহানাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। শুনিয়াছি সাহানাকে বলিতেন সে যেন তার আবশ্যকীয় টাকাকড়ি অতুলের বাক্স হইতে নেয় এবং কাহাকেও যেন তাহা না বলে।"[৮]

অতুলপ্রসাদ বিলেত যাচ্ছেন এ খবর সবাই জানলেন। হেমন্তশশীর নিকটও সে খবর পেঁছিল। অতুলপ্রসাদ মার সঙ্গে দেখা করলেন। জানালেন, মা, আমি বিলেত যাচ্ছি, এবার ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে আসব।

শুনে মার উজ্জ্বল দু চোখ আনন্দাশ্রুতে টলটল করতে লাগল। আহা, অতুলের এ তো আশৈশবের স্বপ্ন! কত রাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে গল্প শোনার সময় যখনি প্রশ্ন করেছেন, 'অতুল বড় হয়ে তুমি কি হবে বাবা', দ্বিধাহীন

৫, ৬—৺সুবালা দেবী—"অতুল"

৭, ৮—৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী

কণ্ঠে অতুল জবাব দিয়েছে, 'আমি বড় হয়ে ব্যারিস্টার হব'। তার সে স্বপ্ন সফল হতে চলেছে।

হেমন্তশশী তখনি এ খবর দুর্গামোহনবাবুকে দিলেন। বললেন, অতুলকে এমনভাবে পাঠাতে হবে যাতে বিলেত গিয়ে সে কোন কষ্টে না পড়ে।

নিশ্চয়ই, সমর্থন করেন দুর্গামোহনবাবু, তাকে বিলেত পাঠিয়ে ব্যারিস্টার হতে আমরাও সাহায্য করব।

অতুলপ্রসাদ দুর্গামোহনবাবুর উদারতার কথা শুনলেন, আশ্চর্য ও মুগ্ধ হলেন। হেমন্তশশী নিজে সেতু হয়ে দুজনের মিলন ঘটালেন।[৯] তাঁর দুই পরম প্রিয়জন এবার মিলিত হল। কী শান্তি!

মামাদের এবং দুর্গামোহনবাবুর মিলিত আর্থিক সাহায্যে অতুলপ্রসাদ বিলেত যাবার জন্য দ্রুত তৈরি হতে লাগলেন।[১০]

এর পূর্বে অতুলপ্রসাদ ঢাকা ও কোলকাতার বাইরে কোন দিন যান নি। এখন চলেছেন সুদূর বিলেতে—তাঁর স্বপ্নের দেশে। কিন্তু আত্মীয়বিচ্ছেদের কথা ভেবে অতুলপ্রসাদের কোমল মন বেদনায় কাতর হল।

বেদনা-কাতর হৃদয়ে অতুলপ্রসাদ ১৮৯০ সালে জাহাজে করে বিলেতের উদ্দেশে রওনা হলেন। জাহাজ তাঁকে নিয়ে দেশের কূল থেকে যত দূরে সরে যায়—ততই এক অব্যক্ত বেদনায় বুক যেন ভরে ওঠে। দেশের মাটি আর মাটি নয়, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর চোখে দেশপ্রেমের পরশপাথর ছুঁইয়ে তাঁর দৃষ্টি খুলে দিয়েছেন। মাটি তাই এখন জন্মভূমি মা, বন্দিনী, দুঃখিনী মা।

আবার গর্ভধারিণী মার জন্যও তাঁর বেদনা, ভাবনা। তাই পুত্রবিচ্ছেদ-ব্যথায় মা যেমন কাতর তেমনি তাঁর অতুল। তবে উজ্জ্বল কল্যাণকর ভবিষ্যতের কল্পনা করে দুজনের কাছেই দুজনের ব্যথা সহনীয় হয়ে উঠল।

৯—সেন পরিবারের একজন নিকট আত্মীয়া—সাক্ষাৎ

১০—শ্রীযুক্তা বেলা সেন বলেছেন যে, দুর্গামোহন দাশ আমাদের পরিবারকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। আমাদের শ্বশুরমশাইকে বিলেতের খরচ দেওয়া, তাঁর তিন বোনের বিবাহ দেওয়া সবই তিনি করেছেন। তাঁর খরচের একটি খাতা ছিল দেখেছি। এখন আর তা নেই।

শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দত্ত বলেছেন যে অতুলের ভগ্নীদের বিবাহ দুর্গামোহন দাশই খরচপত্র করে দিয়েছেন।

॥ চার ॥

অতুলপ্রসাদ আবার যেন শিশু হয়ে গিয়েছেন। সমুদ্রের বুকে জাহাজের দোলায় দোল খেতে খেতে কূল থেকে অকূলে ভেসে চললেন। সুবিশাল ভারতবর্ষ যেন সুনীল সাগরের পর্দার পিছনে নিঃসীম অন্ধকারে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। সহসা অতুলপ্রসাদ নিজেকে বড় একা বড় নিঃসংগ বোধ করতে লাগলেন।

কিন্তু তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন। এই জাহাজেই দেখা হয়ে গেল বাল্যবন্ধু জ্ঞান রায়ের সংগে। একক শূন্যময় সময় পূর্ণ হয়ে উঠল বন্ধুর পুনর্মিলনে, নির্মল আনন্দে।

এই জ্ঞান রায়ের সংগে বাল্যে একই স্কুলে পড়েছেন। কৈশোরে রূপ-বাবুদের বা আনন্দ মাস্টার মহাশয়ের বাগানবাড়ির নিভৃত বৈঠকে সবাই মিলিত হতেন। কতদিন তিনি রবিবাবুর কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন:

জ্ঞান বিলেত চলেছেন ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। অতুলপ্রসাদ জানালেন তিনি ব্যারিস্টারি পড়তে চলেছেন, তাঁর সুপ্ত বাসনাকে সফল রূপ দিতে চলেছেন। আরো কত কথা হল—নিজেদের কথা, পুরনো সংগীসাথীদের কথা। সমুদ্রযাত্রায় জ্ঞানের মত সংগী পেয়ে অতুলপ্রসাদ মহাখুশি।

তবে সে খুশিতে মাঝে মাঝে ভাটা পড়ত। জাহাজে ভারতীয়দের প্রতি শাসকজাতীদের অপমানকর ব্যবহার প্রত্যেক আত্মসম্মান-সচেতন ভারতীয়র মত স্পর্শকাতর অতুলপ্রসাদও অপমান বোধ করতেন এবং ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হতেন।

জাহাজ সুনীল সাগরের জলের উপর বিচিত্র রেখার নক্সা কেটে এগিয়ে চলেছে। আকাশের ঢাকনার নিচে শুধু কালচে নীল জল আর জল। সে জলের তরংগের মাথায় মাথায় যেন হীরার চালচিত্তির আর রাতের আঁধারে তাদের অংগে অংগে তারার আল্পনা। সে দৃশ্য অতুলপ্রসাদের সমুদ্রযাত্রার কষ্টকে অতিক্রম করে তাঁর কবিহৃদয়কে অসীম, অনাবিল আনন্দে ভরে তুলত।

ভূমধ্যসাগরে পেঁৗছে তাই ইতালীর ভেনিস নগরে গণ্ডোলা (একপ্রকার নৌকা) চালকদের গানের সমধুর সুর তাঁর মনকে সহজেই আলোড়িত ও আপ্লুত করে। পরে ঐ সুরে তিনি তাঁর বিখ্যাত গান "উঠ গো ভারত লক্ষ্মী" রচনা করেন (১৮৯১—৯২ সাল)।[১]

১—শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ এই ঘটনা অতুলপ্রসাদের কাছে শুনেছেন।

জ্ঞান রায়ের মারফৎ, জাহাজে জ্যোতিষ দাশ এবং নলিনী গুপ্তের সংগে অতুলপ্রসাদের আলাপ হয়।

চারজনের হাসিগল্পের মধ্যে দিয়ে সুদীর্ঘ যাত্রার একদিন অবসান হল। লণ্ডনে কিংস্ ডকে জাহাজ এসে ভিড়লে তার একটানা যান্ত্রিক কান্না শেষ হল।

অতুলপ্রসাদ এবার সত্যিই তাঁর স্বপ্নের দেশে এসে পেঁছিলেন।

অতুলপ্রসাদের স্বপ্নের দেশে স্বপ্ন-জগতের মতই সর্বদা আলো-আঁধারির খেলা চলে। আকাশের মুখ কুয়াশার চন্দ্রাতপের আড়ালে মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়। যখন-তখন জলতরংগ বাজিয়ে বৃষ্টি নেমে আসে। আর কী শীত! নতুন দেশে নতুন পরিবেশে চোখে ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময় জাগে কিন্তু মন পড়ে থাকে তার পুরনো আবাসে—ভারতবর্ষে। বিষণ্ণ আবহাওয়া বিষণ্ণ মনকে আরো যেন উদাস, উতলা করে তোলে।

ক'দিনের ভেতরই মন শান্ত করে অতুলপ্রসাদ লণ্ডনে মিড্‌ল্ টেম্পল্-এ ব্যারিস্টারি পড়া শুরু করে দিলেন। বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে পড়তে গিয়ে অসংখ্য বইয়ের মাঝে হারিয়ে যান, কী সব অমূল্য সংগ্রহ! বাংলা বইও তো কম নয়!

বিলেতে অতুলপ্রসাদ আবার চিত্তরঞ্জনের সান্নিধ্যে এলেন। আলাপ হল শ্রীঅরবিন্দ, মনমোহন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সরোজিনী নাইডু এবং আরো অনেকের সংগে।

অতুলপ্রসাদ দেখলেন চিত্তরঞ্জন এখানে এসে রাজনীতি নিয়ে মেতে উঠেছেন। "তিনি যে প্রথমবার আই. সি. এস. পাস করতে পারলেন না তার কারণ রাজনীতি।"[২] বিদেশে গিয়ে বৃটিশদের অভদ্র ব্যবহার দেখে তিনি পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করে ব্যথিত হয়েছিলেন। তাই আপনার শক্তি দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর সে প্রচেষ্টায় ভারতীয় ছাত্র বন্ধু সকলের সমর্থন ছিল। অতুলপ্রসাদও ছিলেন তাঁর সমর্থক এবং গুণমুগ্ধ।

বিলেতে থাকতে চিত্তরঞ্জন যে দুটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেন তা হল জেমস্ ম্যাকলীনের উক্তির প্রতিবাদ ও দাদাভাই নৌরজীর নির্বাচনী প্রচার।

জেমস্ ম্যাকলীন নামে বৃটিশ পার্লামেন্টের এক সদস্য ভারতীয় মুসলমানদের 'দাস' ও হিন্দুদের 'চুক্তিবদ্ধ দাস' বলে অভিহিত করেন।

২—'দেশবন্ধু'—মণি বাগচী।

চিত্তরঞ্জন লণ্ডনস্থ ভারতীয় ছাত্রদের এবং তাঁর বন্ধুদের নিয়ে এক প্রতিবাদ সভা করেন। সভায় স্থির হয় যে ম্যাকলীনকে তাঁর অভদ্র উক্তির জন্য ভারতীয়-দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং পার্লামেন্টের সদস্যপদ তাঁকে ত্যাগ করতে হবে।

চিত্তরঞ্জনের চেষ্টায় ম্যাকলীন দুটি কাজ করতেই বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর সে সফলতায় অন্যান্যদের সংগে অতুলপ্রসাদও উৎসাহিত, আনন্দিত হন।

দাদাভাই নৌরজী পার্লামেন্টের সদস্যপদ-প্রার্থী হয়ে স্যালিসবেরীর সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। তাঁকে সমর্থন ও সাহায্য করতে চিত্তরঞ্জন এগিয়ে এলেন। শুরু হল প্রচারকার্য। ভারতীয় ছাত্রবন্ধুরা আবার চিত্তরঞ্জনকে ঘিরে দাঁড়ালেন। সবার সংগে অতুলপ্রসাদও উত্তেজনা উপভোগ করলেন। দাদাভাই নৌরজী পার্লামেন্ট-সদস্য নির্বাচিত হলেন। অতুলপ্রসাদ তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

অতুলপ্রসাদ এবার ভাল ভাবে পড়াশোনায় মন দিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ তখন আই. সি. এস. পরীক্ষায় বসবেন। ক্রমে তাঁর পরীক্ষার দিন নিকটতর হল কিন্তু তিনি নির্বিকার। পরীক্ষার দিন তিনি কিছুতেই পরীক্ষার হলে যাবেন না। এদিকে চিত্তরঞ্জন, মনমোহন ঘোষ, অতুলপ্রসাদ, সরোজিনী নাইডু নাছোড়বান্দা, তিনি 'ভীতু' এ অপবাদ শুনতে তাঁরা রাজী নন, পরীক্ষা তাঁকে দিতেই হবে। চারজনে মিলে শ্রীঅরবিন্দকে ধরে পরীক্ষা হল-এ নিয়ে গেলেন এবং একরকম ঠেলে তাঁকে হল-এর ভেতর পৌঁছে দিলেন।[৩]

বৃটিশ সরকারের প্রচারের দৌলতে সবাই জানেন যে শ্রীঅরবিন্দ ঘোড়ায় চড়তে অপারগ হওয়ায় আই. সি. এস. পরীক্ষায় সফল হতে পারেন নি। আসলে শ্রীঅরবিন্দ পরের গোলামী করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

দেশের জন্য সবারই মন উদাস হয়ে ওঠে, কত দূরে পড়ে আছে সুজলা সুফলা বাংলা-মা. কিন্তু বাংলা-সাহিত্য তো নাগালের মধ্যেই আছে। কেমন হয় মাঝে মাঝে ঘরোয়া বৈঠক করে সাহিত্য-চর্চা করলে! এ বিষয়ে চিত্তরঞ্জন, মনমোহন, শ্রীঅরবিন্দ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সরোজিনী নাইডু সকলেরই সমান উৎসাহ।

যেমন ভাবনা তেমনি কাজ, তৈরী হল স্টাডি সার্কেল। সাহিত্যিক

৩—শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ অতুলপ্রসাদের নিকট এ ঘটনার কথা শুনেছেন।

এডমণ্ড গসের আশীর্বাদ নিয়ে শুরু হল বাংলা-সাহিত্য শিল্প ও সংগীত চর্চা।[৪] সেদিনের বৈঠকে সরোজিনী নাইডু এবং মনমোহন ঘোষ স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনালেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এবং অতুলপ্রসাদ স্বরচিত গান শুনিয়ে বৈঠকের আনন্দ বর্ধন করলেন। চিত্তরঞ্জন এবং শ্রীঅরবিন্দও সাহিত্যরস পরিবেশনে বাদ গেলেন না।

বিলেতে অতুলপ্রসাদের তখনকার দিনের বিখ্যাত গায়িকা ম্যাডাম প্যাটের কণ্ঠ-সংগীত শোনার সুযোগ হয়। তাঁর মধুর কণ্ঠে 'হোম সুইট হোম' গানটি শুনে অতুলপ্রসাদ মুগ্ধ হন। পরবর্তীকালে তাঁর 'প্রবাসী চলরে দেশে চল' গানটি ঐ সুরে রচনা করেন।

চিত্তরঞ্জন ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফিরে যাবেন। তাঁকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাবার জন্য গানের আসরের ব্যবস্থা হল। দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ গান করলেন।

সুদূরের এক আকর্ষণী মোহিনীশক্তি আছে। সে শক্তির টান প্রবল। কিন্তু একবার তা করায়ত্ত হয়ে গেলে তখন নিকটতমর জন্য প্রাণ উতলা হয়।

অতুলপ্রসাদ বিলেতের প্রতি এমনিই আকর্ষণ বোধ করেছিলেন যে একদিন চাকর হয়েও বিলেত যেতে প্রস্তুত ছিলেন। বিলেতে গিয়ে তার আবহাওয়া আর পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল মাটির মায়ের অদৃশ্য আকর্ষণ বুঝতে শুরু করলেন, তার অভাব অনুভব করতে লাগলেন।

ঠিক সেই সময়ে তাঁর বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ কার্যোপলক্ষে সপরিবারে বিলেতে এলেন। বিদেশে বড়মামা, মামীমাকে কাছে পেলেন। কাছে পেলেন মামাতো বোন হেমকুসুমকে—যে তাঁরই মত সংগীতপাগল। সুধাকণ্ঠী হেমকুসুম গান ছাড়াও এস্রাজ, বেহালা ও পিয়ানো বাজাতে জানেন; ছবি আঁকতেও তাঁর সমান আগ্রহ।

বড়মামা, মামীমার সংগে কত কথা হল, মনের রুদ্ধ বাতায়ন যেন উন্মুক্ত হয়ে গেল; খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবার খবর নিলেন। নিজের খবরও দিলেন।

অতুলপ্রসাদ সময় পেলেই মামীমার কাছে চলে আসেন। বাংলায় কথা বলে আনন্দে, তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে। দেশের মাটি ও মাতৃভাষা যে কত প্রিয় সে বোঝা যায় যখন তার ধরাছোঁয়ার বাইরে, দূরে থাকা যায়। 'আ মরি বাংলা

৪—শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ অতুলপ্রসাদের নিকট এ ঘটনার কথা শুনেছেন।

ভাষা' যে কত আহামরি' ভাষা তা অতুলপ্রসাদ তাঁর প্রবাস-জীবনে মনে হয় অত্যন্ত গভীর ভাবে অনুভব করেছিলেন।

অবসর সময়ে মামীমা এবং মামাতো বোনদের নিয়ে বেড়াতে যান, লণ্ডন শহর ঘুরিয়ে দেখান। সন্ধ্যেবেলায় হেমকুসুমের বেহালা বাজানো শোনেন। হেমকুসুম যত্ন করে বেহালা শিখেছেন। বেহালার হাত ওঁর বড় মিষ্টি। সংগীতসভায়, নাচের আসরে বেহালা বাজিয়ে হেমকুসুম ইতিমধ্যে প্রশংসা অর্জন করেছেন।

অতুলপ্রসাদ এলে হেমকুসুম বেহালা রেখে গল্প করতে চান। বলেন, সারাক্ষণ বেহালা বাজিয়ে ক্লান্ত লাগছে। এসো, এবার গল্প করা যাক। বিলেত দেখা তোমার স্বপ্ন ছিল। এখন বিলেত কেমন লাগছে বল।

অতুলপ্রসাদ তাঁর হাতে বেহালা তুলে দেন। বলেন, এখন একটু বেহালা বাজাও শুনি, পরে গল্প হবে।

হেমকুসুমকে আবার বেহালা বাজাতে হয়। তাঁর মুখে মৃদু হাসির রেখা।

অতুলপ্রসাদ মুগ্ধ হয়ে বেহালা শোনেন, হেমকুসুমকে দেখেন।

হেমকুসুমকে দেখতে সত্যিই সুন্দর, একহারা চেহারা, উজ্জ্বল বর্ণ, মুখশ্রীও ভাল। তার ওপর তাঁর সপ্রতিভতা ও দুঃসাহসিকতা তাঁকে ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন করে তুলেছে। একটি মাত্র দোষ, স্বভাবে বড়ই জেদী।

এরপর এলো বিদায়ের পালা। বড়মামার লণ্ডনের কাজ তখনকার মত শেষ। তিনি সপরিবারে দেশে ফিরে গেলেন।

অতুলপ্রসাদ আবার যেন নতুন করে একা হয়ে পড়লেন। বিদেশে একাকীত্ব বড় বেদনাদায়ক, বড়ই অসহনীয়। লণ্ডনের ধূসর আবহাওয়া শূন্য মনকে যেন আরো বিষণ্ণ, রিক্ত করে তোলে।

মনকে সান্ত্বনা দিয়ে অতুলপ্রসাদ পড়াশোনায় ডুব দিলেন। দেশ যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দিনরাত পরিশ্রম করে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি চলল। এবার ফাইন্যাল পরীক্ষা।

অবশেষে পরীক্ষা দিলেন। কৃতকার্য হলেন অতুলপ্রসাদ। পার্টি দেওয়ার পর তাঁর নাম ব্যারিস্টারিতে এনরোলড্ হল। তিনি সফল, তাঁর স্বপ্ন এবার সার্থক, পূর্ণ হল তাঁর সুদীর্ঘ দিনের একান্ত গোপন আশা।

এবার দেশে ফেরার পালা। দেশের স্মৃতি বুঝি তাঁর মনে গুনগুনিয়ে ওঠে,—'প্রবাসী চল রে ফিরে চল'।

॥ পাঁচ ॥

১৮৯৫ সালে অতুলপ্রসাদ স্বদেশে ফিরে এলেন; ফিরে পেলেন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধুর সান্নিধ্য। ছেলেকে কাছে পেয়ে হেমন্তশশীর চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দেয়, তারপর আশীর্বাদ হয়ে অতুলপ্রসাদের মাথার ওপর ঝরে পড়ে।

ফিরে আসা ও ফিরে পাওয়ার প্রবল আনন্দ ক'দিন পরে থিতিয়ে গেল, শান্ত হল। এবার ভবিষ্যতের জন্য তৈরী হবার পালা। তার আগে অতুলপ্রসাদ একবার নিজেদের গ্রামে, পঞ্চপল্লীর অন্তর্গত মগরে ঘুরে এলেন। পদ্মানদীকে দেখে উচ্ছ্বসিত হলেন; গ্রামের বাড়িতে গিয়ে শৈশবের স্মৃতি স্মরণ করে মন অনাবিল আনন্দে ভরে উঠল।

কোলকাতায় সার্কুলার রোডে বাড়িভাড়া নেওয়া হল। সেখানে অতুলপ্রসাদ তাঁর অফিস সাজালেন। দুর্গামোহন তাঁকে সবরকমে সাহায্য করলেন। কোলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ যোগদান করলেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের (পরে লর্ড) জুনিয়র হয়ে অতুলপ্রসাদের কর্মজীবন শুরু হল।[১] পরিচিত হলেন তখনকার ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে; তাঁর সুন্দর চেহারা দেখে সকলে মুগ্ধ হলেন। মাথায় দীর্ঘ, গড়ন সুগঠিত, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রঙ, ক' বছর বিলেত বাসের পর আরো উজ্জ্বল হয়েছে, সবচেয়ে সুন্দর তাঁর গভীর চোখ দুটি। তাঁর ব্যবহারও বড় অমায়িক, বড় চমৎকার।

সকালে নিজের অফিসে সময় কাটে, সারাদিন কোর্ট-কাছারিতে সময় চলে যায়। তার পরের সময় তাঁর একান্ত একার। সেই সময় তিনি পরিচ্ছন্ন হয়ে চলে যান ক্লাবে, সাহিত্য ও সংগীতের আড্ডায়—'খামখেয়ালী'র আসরে।

"বিলাত হইতে আসার পর অতুলের রবিবাবুর সহিত আলাপ হয় এবং তাহা ক্রমে গভীর স্নেহের বন্ধনে পরিণত হইয়াছিল।"[২]

রবীন্দ্রনাথের সহিত প্রথম আলাপ হয় 'খামখেয়ালী'র আসরে। অতুলপ্রসাদের ভাষায়, "তখন আমার বয়ঃক্রম প্রায় একুশ-বাইশ। শ্রীমতী সরলা দেবী

১, ২—৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।

আমাকে লইয়া গিয়া তাঁর (রবীন্দ্রনাথ) সঙ্গে আলাপ করাইয়া দেন। প্রথম দর্শনেই প্রেম।"[৩]

সে আসরে রবীন্দ্রনাথ গান করেছিলেন। অতুলপ্রসাদের সে গান বড় ভাল লেগেছিল। সেখানে অতুলপ্রসাদের এক বন্ধু জানান যে, অতুলপ্রসাদ গান করেন আবার গান রচনাও করেন। তখন কবির অনুরোধে অতুলপ্রসাদ স্বরচিত একটি গান করে শোনান।

এরপর দুই কবি আরো সন্নিকট, আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।

রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ১৮৯৬ সালে "খামখেয়ালী" নামে একটি সাহিত্য এবং সংগীত-সভা স্থাপিত হয়। অতুলপ্রসাদ এই সভার সর্বকনিষ্ঠ সভ্য। অন্যান্য সভ্যরা হলেন অবনীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মহারাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়, লোকেন পালিত, রাধিকামোহন গোস্বামী ইত্যাদি।

এই সভার বাঁধাধরা কোন নিয়ম ছিল না। সাহিত্য, সংগীত, হাস্যরস ইত্যাদির দ্বারা সভ্যদের আনন্দ পরিবেশন করাই এর উদ্দেশ্য ছিল।

"খামখেয়ালী"র আসরকে আমোদে মশগুল করে রাখতেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর অফুরন্ত হাসির গান দিয়ে। তিনি গান গাইতেন আর অন্যান্য সভ্যরা কোরাস ধরতেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কোরাসের নেতা। "সকলের মুখে হাসি, কণ্ঠে গান, হাসির উচ্চরোলে সভাস্থল কম্পান্বিত হইত। দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিতেন, 'হতে পাত্তেম আমি একজন মস্ত বড় বীর' আর রবীন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া কোরাস ধরিতেন, 'তা বটেই ত, তা বটেই ত'। দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিতেন, 'নন্দলাল একদা একটা করিল ভীষণ পণ' রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন, বাহারে নন্দ বাহারে নন্দলাল'।"[৪]

বিখ্যাত গায়ক রাধিকামোহন গোস্বামী তাঁর উচ্চাঙ্গের তানলয়মণ্ডিত সংগীতে সভ্য-সকলের মনোরঞ্জন করতেন। নাটোরের মহারাজা বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গে বাঁয়াতবলা বাজাতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'রাজন' বলে সম্বোধন করতেন। শিল্পের রাজা অবনীন্দ্রনাথ মিষ্টি হাতে এস্রাজ বাজাতেন।

সভা সভ্যদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বসত। যখন যে সভ্যের বাড়ি সভা বসত তিনি অন্যান্যদের সভা-অন্তে ভূরিভোজনে তৃপ্ত করতেন।

অতুলপ্রসাদের বাড়িতেও একবার "খামখেয়ালী" সভাকে আমন্ত্রণ করে

৩, ৪—অতুলপ্রসাদ 'আমার কয়েকটি রবীন্দ্র-স্মৃতি'।

সাহিত্য-সংগীত-রসের আস্বাদনের পর সভ্যদের ভূরিভোজন করানো হল। সেদিন রবীন্দ্রনাথ বাড়ি ফিরলেন রাত বারোটার পরে ; নাটোরের মহারাজা রাত একটার পরে এবং দ্বিজেন্দ্রলালকে অতুলপ্রসাদ নিজে পরের দিন সকালে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলেন।

রবীন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠ হবার পর অতুলপ্রসাদ জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়িতে যাতায়াত করতেন। কবির নির্দেশে তিনি প্রতিদিন বিকেলবেলা যেতেন আর দীর্ঘসময় রবীন্দ্র-কাব্যের রসাস্বাদন করে চা-পান অন্তে সন্ধ্যের সময় নিজের বাড়ি ফিরে আসতেন। তখনো যেন কাব্যের গুঞ্জরণ কানে বাজত, মন আনন্দে তৃপ্তিতে ভরে থাকত।

প্রতিদিনের কল্পনা আনে সার্থকতার স্বপ্ন। অতুলপ্রসাদ ঠিক সময়ের মধ্যে তৈরী হয়ে হাইকোর্টে পৌঁছে যান। কিন্তু বিকেলবেলার বিষণ্ণ আলোর মত বিষণ্ণ মন নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। কোলকাতায় পসার জমিয়ে উঠতে পারছেন না। যেখানে বড় বড় রথী-মহারথীদের হালে পানি পেতে দীর্ঘ সময় লাগে সেখানে নতুন ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদের দ্রুত পসার জমিয়ে তোলা সহজ নয়।

চিন্তিত হন অতুলপ্রসাদ। চিন্তিত হন হেমকুসুমও। কিন্তু পরক্ষণেই উৎসাহ দেন, চেষ্টা করতে করতে তুমি একদিন সফল হবেই হবে।

অতুলপ্রসাদ কিন্তু উৎসাহ বোধ করলেন না। আত্মীয়-বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন কোন ছোট শহরে গিয়ে প্র্যাক্‌টিস্ করতে। রংপুর বেশ ভাল জায়গা।

সত্যি, ভাল মত প্র্যাক্‌টিস হওয়া দরকার। কিন্তু কোলকাতার পরিবেশ ছেড়ে অতুলপ্রসাদের অন্য কোথাও যেতেই ইচ্ছে করে না। "খামখেয়ালীর" আড্ডা ছেড়ে, রবীন্দ্র-বলেন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলালের সংগ ছেড়ে তিনি থাকবেন কি করে ; মনের সব জানলা বন্ধ রেখে তিনি বাঁচবেন কেমন করে !

এই সময়ে, ১৯শে ডিসেম্বর ১৮৯৭ সালে দুর্গামোহন দাশ হঠাৎ মারা গেলেন। তাঁর শরীর খুবই ভেঙে পড়েছিল ; দ্বিতীয়বার বিবাহ করার দরুন হেমন্তশশী দেবীর মত তিনিও আত্মীয়-স্বজন থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় মানসিক অশান্তিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন।[৫]

তাঁর মৃত্যু সংসারের ওপর যেন কালবোশেখী ঝড়ের মত এসে পড়ল।

৫—সেন পরিবারের একজন নিকট আত্মীয়া—সাক্ষাৎ।

অতুলপ্রসাদের দায়িত্ব বৃদ্ধি হল। রংপুর ছোট শহর, কৃতকার্য হতে পারেন। রংপুরে যাওয়াই স্থির করলেন। কিন্তু ওখানে তাঁর মন স্থির হয়ে বসতে চায় না, প্রায়ই কোলকাতা চলে আসতেন।

ইতিমধ্যে একটি অপ্রিয় ঘটনা বিরাট আকার নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুম একে অপরকে বিবাহ করবেন বলে স্থির করলেন।

শুনে মা হেমন্তশশী, বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ, আত্মীয়-স্বজন এবং তাঁর পরিবারের সকলেই প্রতিবাদের ঝড় তুললেন। মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনে বিয়ে—অসম্ভব!

মা ছেলেকে বোঝাতে লাগলেন, এ প্রস্তাব ছাড। কিন্তু অতুলপ্রসাদ কিছুতেই বুঝতে চাইলেন না।

বড়মামা ও মামীমা হেমকুসুমকে শাসন-বারণের দ্বারা নিরস্ত করতে চাইলেন। কিন্তু হেমকুসুম তাঁর সংকল্পে অটল। সোজা রাস্তায় মা-বাবাকে রাজী করাতে অসমর্থ হয়ে তিনি শেষে কৌশলের পথ ধরলেন। একদিন গলায় ফাঁস লাগাবার অভিনয় করলেন। একটি টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে কড়িকাঠ থেকে ঝোলান শাড়ি নিজের গলায় বেঁধে মাকে ডাকিয়ে পাঠালেন। মা এলে বললেন, "হয় অতুলকে বিয়ে করার অনুমতি দাও নয়তো আমি এই ঝুলে পড়লুম"।[৬]

এই জেদী, অবুঝ সন্তানটি মা-বাবার বড় আদরের ছিলেন। সন্তানকে মৃত্যুমুখী দেখে ভীতা মা আশ্বাস দেন, আর বাধা পাবে না, নেবে এসো।

হিন্দু আইনে ভাইবোনের বিবাহ সম্ভব নয়, বৃটিশ আইনেও সে ব্যবস্থা নেই। ধর্মান্তর গ্রহণ করে বিবাহ করতে অতুলপ্রসাদ রাজী নন ; ধর্মমতকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। আবার অতুল হেমকুসুম একে অপরকে বিবাহ করতে স্থিরসংকল্প। অতুলপ্রসাদ খুবই চিন্তায় পড়লেন।

"তখন সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ অতুলপ্রসাদকে বিলেত গিয়ে বিবাহ করার পরামর্শ দিলেন। স্কটল্যাণ্ডে গ্রেট্‌নাগ্রীণ গ্রামে ভাইবোনের (কাজিন) বিবাহের নিয়ম-নীতি আছে"।[৭]

অতুলপ্রসাদ তাঁর পরামর্শ যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। তারপর ১৯০০ সালে

৬—সেন পরিবারের একজন নিকট আত্মীয়া—সাক্ষাৎ।

৭—শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ বলেন তিনি এ কথা অতুলপ্রসাদের মুখেই শুনেছেন।

একদিন হেমকুসুমসহ আবার সীমাহীন নীল সাগরের বুকে নতুন আর এক আশার অঞ্জন চোখে নিয়ে অকূলে পাড়ি দিলেন।

আবার বিলেত।

এখন শীতের শেষ। এরপর আসবে গ্রীষ্ম। বিলেতে 'সামার' হল বসন্তকাল। আর কিছুদিন পরে ফুলের মেলা দেখা যাবে।

অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুমের বিবাহ নির্বিঘ্নে শেষ হল। আনন্দের মাঝেও নিরানন্দ, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে দূর বিদেশে নিঃশব্দে দুজনে বিবাহ করলেন। আলোর চমকানি নেই, কোন আড়ম্বর নেই, আনন্দের কলরব নেই, ধান-দূর্বা-চন্দন-প্রদীপের পূত পরিবেশ নেই। বড় শূন্য মনে হল অতুলপ্রসাদের, হেম-কুসুমের।

দুজনেই বড় অভিমানী। অতুলপ্রসাদ ঠিক করলেন আর দেশে ফিরে যাবেন না। আত্মীয়রা যখন তাঁদের সমর্থন করেননি, আর দেশ ছেড়ে যখন চলে আসতেই হল তখন বিলেতে তাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন। এই সমুদ্র-ঘেরা মেঘে-ঢাকা দেশ—তাঁর স্বপ্নের দেশ এখন থেকে হবে তাঁর কর্মভূমি, কাব্যের লীলাক্ষেত্র।

শুনে হেমকুসুম তাঁকে সমর্থন জানালেন। শুরু হল নতুন জীবন।

অতুলপ্রসাদ মহা উৎসাহে লণ্ডনে প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ করলেন। তাঁর সফলতার জন্য পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। কিন্তু কোলকাতার মত এখানেও তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী উদারহস্ত প্রসারিত করে তাঁকে উৎসাহ ও সান্ত্বনা দিলেন না। উদ্বেগ আর অনটনের মধ্যে দিয়ে গ্রীষ্মের উজ্জ্বল দিনগুলি শেষ হয়ে শীত তার সাদা মাথা নিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে এলো। কুয়াশা বৃষ্টি বরফে লণ্ডন যেন বড় বিষণ্ণ দেখায়।

বিমর্ষ অতুলপ্রসাদও। পরিশ্রমে আনন্দ নেই, মনে শান্তি নেই। এতদিনেও দেশ থেকে একটি চিঠি এলো না; মার কাছ থেকেও একটি চিঠি পাওয়া গেল না।

সেই বিমর্ষ নিরানন্দের দিনে আনন্দ দিতে একটি নয়, একজোড়া শিশু

এলেন হেমকুসুমের কোলে। ১৯০১ সালে হেমকুসুম জননী হলেন। স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে শিশু দুটির নাম রাখলেন দিলীপকুমার ও নিলীপকুমার।

অতুলপ্রসাদ আবার নতুন উৎসাহে প্র্যাক্‌টিস শুরু করলেন। তাঁকে এবার সফল হতেই হবে, স্ত্রী-পুত্রদের সুখে রাখতে হবে। কিন্তু চেষ্টা করেও প্র্যাক্‌টিস তাঁর জমল না। বিলেতের দারুণ শীতে শিশুপুত্র দুটি নিয়ে বড় কষ্টে দিন কাটাতে লাগলেন।

আত্মীয়দের নীরবতা, স্বামীর হতাশা ও সন্তানদের কষ্টে হেমকুসুমও বিচলিত হয়ে উঠলেন। তবু তিনি সংসারের সংগে সংগ্রাম করছিলেন। "এরপর এমন দিন এলো যে হেমকুসুমের সংগে যে সব সোনার গহনা, হীরের আংটি ইত্যাদি ছিল তিনি তা একে একে নিঃশব্দে বিক্রি করে দিলেন"।[১]

ভগবানের পরীক্ষার তখনো বুঝি শেষ হয়নি। নিলীপের যখন সাত মাস মাত্র বয়স, কয়েক দিন জ্বরভোগের পর তিনি মারা গেলেন।

স্বামী-স্ত্রীর আর কোন আশা-আনন্দ রইল না। হেমকুসুম বুঝি পাথর হয়ে যাবেন। অতুলপ্রসাদ হারিয়ে ফেললেন তাঁর সব উদ্যম, উৎসাহ।

মানসিক এবং আর্থিক অবস্থা যখন ছিন্নভিন্ন তখন অতুলপ্রসাদের পাশে এসে দাড়ালেন তাঁর একজন মুসলমান বন্ধু। "সেখানে একজন মুসলমান বন্ধুর সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনিই অতুলকে লক্ষ্মৌ বসিতে উপদেশ দেন"।[২]

বন্ধুর উপদেশ অতুলপ্রসাদ গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখলেন। এভাবে

১—সেন পরিবারের একজন নিকট আত্মীয়ার কাছে শোনা।

২—৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।

৺সুরবালা দেবীও তাঁর প্রবন্ধ 'অতুল'এ লিখেছেন : "সেখানে (বিলেতে) তাঁর একটি মুসলমান বন্ধু লক্ষ্মৌ যাইয়া প্র্যাক্‌টিস করিবার জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করেন এবং বলেন, আমি তোমার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। নিশ্চয়ই তোমার সেখানে ব্যবসায়ে উন্নতি হইবে"।

শ্রীযুক্তা ললিতা দাস জানান যে মমতাজ হোসেনের পুত্র সিরাজ হোসেন তাঁকে একাধিকবার বলেছেন যে 'তাঁর বাবার জন্য সেন সাহেব এদেশে এলেন, প্রতিষ্ঠিত হলেন'।

"The Centenary Report of High Court of U. P-তে দেখা যায় যে ১৯০১ সালে মমতাজ হোসেন বিলেতে ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে অতুলপ্রসাদও বিলেতে ছিলেন। অতুলপ্রসাদ এবং মমতাজ হোসেন একই সময়ে বিলেতে থাকায় এবং সিরাজ হোসেনের বক্তব্যে ইহাই অনুমান করা যায় যে ব্যারিস্টার মমতাজ হোসেন সাহেব-ই অতুলপ্রসাদকে লখনৌ এসে প্র্যাক্‌টিস্ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।—লেখিকা।

অনিশ্চিত ও অভাবের মধ্যে আর পড়ে থাকা যায় না। বাংলা দেশের কথা, কোলকাতার কথা তাঁর মনে উঁকি দিল। আবার আত্মীয়-স্বজনের কথাও মনে পড়ল। "তিনি শেষ পর্যন্ত বন্ধুর উপদেশে লখনৌ যাওয়াই স্থির করলেন"।[৩]

"লখনৌ যাবার আগে বিলেত থেকে অতুলপ্রসাদ স্ত্রী-পুত্রসহ প্রথমে কোলকাতায় এলেন, অবশ্য দিনকয়েকের জন্য। আত্মীয়স্বজন কেউই এসে অতুলপ্রসাদকে স্বাগতম্ জানালেন না, একমাত্র ব্যতিক্রম শিশিরকুমার দত্ত। এজন্য অতুলপ্রসাদ শিশিরকুমারকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন"।[৪]

তারপর অতুলপ্রসাদ সপরিবারে অপরিচিত দেশ সংযুক্ত প্রদেশের রাজধানী লখনৌ শহরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। সে-বছর ছিল ১৯০২।

॥ সাত ॥

লখনৌ নবাবের দেশ, বিবর্তনের দেশ, টপ্পা-ঠুংরির দেশ।

লখনৌয়ের পুরনো নাম 'লক্ষণাবতী'। কিম্বদন্তী যে, রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনারোহণ করার পর লক্ষণ গোমতী নদীর তীরে লক্ষণাবতী নামে নগরী স্থাপন করেন। লক্ষণাবতী পরে লোকমুখে 'লক্ষৌটি' হয়।

পরবর্তীকালে 'লক্ষণ' নামে একজন হিন্দু এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। দুর্গের নাম দেন 'কিলা-লক্ষণ'।

গজনীর মামুদ যখন ভারত আক্রমণ করেন সে-সময় লক্ষৌটি নামের বদলে নগরীর নতুন নামকরণ হয় 'লক্ষ্ণৌ'।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই দিল্লী-বাদশাহের করদ-রাজ্য অযোধ্যার সুবেদার নবাব শা-আদৎ খাঁ লখনৌয়ে নিজের রাজধানী স্থাপন করেন। তখন লখনৌ একটি গ্রাম মাত্র।

৩—৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী: "বিবাহের পর আত্মীয়রা তাহাদের উপরে বিমুখ হইয়া পড়িল। তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য এবং অভাবের তাড়নায় লক্ষ্ণৌ গিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করাই স্থির করিলেন। আত্মীয়দের নিকট কোন সাহায্যের প্রত্যাশা নাই অথচ কাছে থাকিয়া তাহাদের উপহাসের পাত্র হইতে হইবে এ সকল চিন্তা করিয়াই তিনি দূরে গিয়াছিলেন"।

৪—শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দত্ত-র (৺শিশিরকুমার দত্তের পত্নী) কাছে শোনা।

চতুর্থ নবাব আসফ-উ-দ্দৌলার সময় থেকে লখনৌয়ের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে সৌখিন নবাবের হুকুমে লখনৌকে সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, তোরণ, বাগান, সেতু দিয়ে সুশোভিত করা হয়। এঁর সময়েই রেসিডেন্সী বা বেলীগার্ড তৈরী হয়।

আসফ-উ-দ্দৌলা যেমন সৌন্দর্যের পূজারী ছিলেন তেমনি বদান্য নবাব বলে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল এবং তাঁর বদান্যতা নিয়ে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে :—

"জিস্ কো না দেয় মৌলা
উস্‌কো দেয় আসফ-উ-দ্দৌলা।"

অর্থাৎ ভগবান যাকে বঞ্চিত করেন নবাব আসফ-উ-দ্দৌলা তাকে দানে তৃপ্ত করেন।

অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শা। ইনি কলারসিক, নাট্যামোদী, এবং সংগীতজ্ঞ ছিলেন, বিশেষ করে ঠুংরি গান রচনার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কথক নাচও এঁর সময়ে লখনৌয়ে প্রসিদ্ধিলাভ করে।

নবাব-নগরীতে ওয়াজিদ আলি শার যোজনা হল চৌলক্ষি মহল; কেশরবাগে সুদৃঢ় প্রাচীরের বেষ্ঠনীর মধ্যে তৈরী হয় বিলাস ভবন, প্রমোদ-উদ্যান, বার-দুয়ারী অর্থাৎ নবাবের 'জলসাঘর' আর বড় বড় সিংহদ্বার—জিলানখানা, চীনিবাগ, লাকিগেট ইত্যাদি।

১৮৫৬ সালে ওয়াজিদ আলি শাকে ইংরাজরা গদিচ্যুত করে অযোধ্যার দখল নেয়, তখন থেকে শুরু হ'ল নন-রেগুলেটেড্ প্রদেশ।

সিপাহী বিদ্রোহের পর অযোধ্যার সংগে আগ্রাকে যুক্ত করে এই প্রদেশের নাম দেওয়া হয় সংযুক্ত প্রদেশ। লখনৌ হয় এর রাজধানী। একজন লেফ্‌টেন্যান্ট্ গভর্ণর সর্বোচ্চ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হন।

আউধ যদিও পরিধিতে ছোট কিন্তু এখানকার জমিদার বা তালুকদারদের অখণ্ড প্রতাপ। যে-সব তালুকদাররা সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, বিদ্রোহ প্রশমিত হলে তাঁদের জমিদারি কেড়ে নিয়ে যাঁরা ইংরাজদের সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

অযোধ্যায় অবাঙালী তালুকদারদের মধ্যে একজন বাঙালী তালুকদারও ছিলেন—রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ইনি সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেই লখনৌয়ে বসবাস করতে থাকেন। ধর্মে ব্রাহ্ম ছিলেন। স্বনামধন্য রাজনারায়ণ

বসু লখনৌয়ে এঁর অতিথি থাকাকালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করে যান। সিপাহী বিদ্রোহের পর রাজা দক্ষিণারঞ্জন ইংরাজদের সুনজরে পড়েন।

ইংরাজ আমলে বিদ্রোহে বিধ্বস্ত নবাব-নগরী লখনৌ নতুন শহর রূপে গড়ে ওঠে। নবাব-ভবনগুলি, কুঠিবাড়িগুলি ইংরাজদের ক্লাব, অফিস, সারকিট হাউস ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়। নবাব হারেম ছত্তরমঞ্জিল হয় ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাব। ইংরাজদের সে ক্লাবে ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ ছিল। নবাব-মন্ত্রী রোশনুদ্দৌলার ভবনে ডেপুটি কমিশনারের অফিস ও কাছারী হয়। হায়াৎ বক্স কুঠি হয় লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ গভর্ণরের আবাস আর বারদুয়ারী হয় তালুকদারদের পার্লামেন্ট হাউস।

নতুন করে তৈরী হয় নতুন নতুন চওড়া রাস্তা, হজরতগঞ্জে ইংরাজদের বড় বড় দোকান, কোটকাছারি ভবন, অফিস কোয়াটারস্‌। জিলানখানা গেটের নগ্ন ভিতের ওপর পরে তৈরী হয় জিমখানা ক্লাব বিল্ডিং।[১] তার অপর দিকে ম্যারীস মিউজিক কলেজ ভবন। চারবাগে নির্মাণ হয় চারবাগ স্টেশন যা বর্তমান স্টেশন থেকে প্রায় এক ফার্লং দূরে ছিল।

লখেনৌ নগরীকে নবরূপায়ণে গড়ে তোলার পেছনে রাজা দক্ষিণারঞ্জনের শ্রম ও অবদান অসামান্য।

নতুন স্বপ্ন চোখে নিয়ে এই নতুন করে গড়ে ওঠা শহরে এলেন অতুলপ্রসাদ সেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, সবার ওপর মানবতা গুণের দ্বারা তিনি এই ঐতিহাসিক শহরে নতুন ইতিহাস রচনা করলেন যা আজো স্মরণীয়, আজো অম্লান।

॥ আট ॥

১৯০২ সালে অতুলপ্রসাদ সপরিবারে চারবাগ স্টেশনে এসে নামলেন।

স্টেশন থেকে লাটুস্‌ রোড ধরে যেতে পাশে পড়ে বাঁশমণ্ডি; তারপর গণেশগঞ্জ, মকবুলগঞ্জ, আমিনাবাদ। আমিনাবাদ পুরনো বনেদী বাজার, রসিক ব্যক্তিদের অম্বুরী তামাকের সুগন্ধ তখনো হাতছানি দিয়ে তাদের মন উতলা করে তুলত। ম্যারীস মার্কেটের পর কেশরবাগ, ওয়াজিদ আলি শা-র

১—"Historic Lucknow"—By Sidney Hay.

কেশরবাগ; কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে মনের পটে ভেসে ওঠে নবাবী হারেম, বাঈজীদের ঘুঙুরের মিঠে আওয়াজ, ঠুংরি-দাদ্‌রার মধুর স্বর।

এই কেশরবাগ থেকে ছ'টি রাস্তা ছ'দিকে চলে গেছে। তার একটি রাস্তা গেছে চকের দিকে। চক নবাবী আমলের বনেদী মহল্লা, বাঈজীদের বিলাস-নিকেতন; নবাবী আমল শেষ হয়ে গেলেও, বিলাসিনী বাঈজীদের বিলোল কটাক্ষে চক তখনো গর্বিত। তার পরের রাস্তা ম্যারীস মিউজিক কলেজ পেরিয়ে গোমতী নদীর ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে। চকের অপর দিকের রাস্তা বঙ্কিম ভঙ্গিমায় গিয়ে পড়েছে সাহেবপাড়া হজরতগঞ্জে। তারই পাশের রাস্তা সোজা চলে গেছে ক্যাণ্টনমেণ্ট এরিয়ায়।

অতুলপ্রসাদের চোখে বিস্ময়, আশা, আনন্দ। হেমকুসুমের চোখেও তাই।

লখনৌ এসে অতুলপ্রসাদ প্রথম কার অতিথি হন এ নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। কেউ বলেন "যে-মুসলমান বন্ধু তাঁকে লখনৌ এসে প্র্যাক্‌টিস করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, অতুলপ্রসাদ স্ত্রী-পুত্রসহ তাঁরই অতিথি হন এবং তাঁরই সাহায্যে লখনৌয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হন"।[১] আবার কেউ বলেন "৺অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের পরিচয় ছিল এবং লখনৌনিবাসী ৺বিপিনবিহারী বসুকেও জানতেন। অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় অতুলপ্রসাদ সপরিবারে লখনৌ এসে খুব সম্ভব বিপিনবাবুর বাড়িতে উঠেছিলেন। তবে পাঁচ-সাত দিনের বেশি সেখানে ছিলেন না। অতুল-প্রসাদকে লখনৌ-এ সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এ-দেশীয় মুসলমান বন্ধুরা একযোগে সাহায্য করেছিলেন"।[২]

যে মুসলমান বন্ধু তাঁকে আশ্বাস দিয়ে এদেশে আসতে বলেছিলেন তিনি অচিরেই অতুলপ্রসাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। কয়েক দিনের মধ্যেই অতুলপ্রসাদ রাজা শ্রীপাল সিংয়ের বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে চলে যান। তখন ও-বাড়ির ভাড়া ছিল মাত্র পঁচিশ-তিরিশ টাকা।

অনেক মুসলমান বন্ধুর সঙ্গেই অতুলপ্রসাদের আন্তরিক হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু মমতাজ হোসেনকে তিনি ছোট ভায়ের মত স্নেহ করতেন, দুজনেই দুজনের খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

১—শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় অতুলপ্রসাদের মুখে এ কথা শুনেছেন।

২—শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ বলেছেন।

মমতাজ এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সহযোগিতায় ও আন্তরিক সাহায্যে অতুলপ্রসাদ ভাড়া বাড়ি সাজিয়ে বসলেন, লখনৌয়ের গণ্যমান্য ছোটবড় সকলের সংগে পরিচিত হলেন এবং স্বাধীন ভাবে প্র্যাক্‌টিস শুরু করে দিলেন। অবশ্য আইন ব্যবসার ব্যাপারে তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট প্লীডার থমাস সাহেবের (Mr. Thomas) জুনিয়র নগেন্দ্রনাথ ঘোষাল এবং ঝাউলালপুলের বিপিনবিহারী বসু তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। প্রথম দিকে অসুবিধে হলেও অতি শীঘ্রই তিনি ব্যবহারজীবীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। লখনৌয়ে অতুলপ্রসাদ কোন দিনই কারুর জুনিয়র হয়ে কাজ করেন নি।

অতুলপ্রসাদ এদেশে এসেই আইন ব্যবসায়ী বন্ধুদের পরামর্শে উর্দু শিক্ষা করতে থাকেন। তখন এদেশে উর্দু শিক্ষিতজনের ভাষা তো ছিলই, কোর্ট-কাছারির কাজ উর্দু ছাড়া অচল ছিল। বন্ধুবর মমতাজ হোসেনের ব্যবস্থায় উত্তম উর্দু-শিক্ষক পেতে সময় লাগল না। একজন মুন্সীর ব্যবস্থাও তিনি করে দিলেন। "প্রথম মুন্সী ছিলেন, ব্রিজরাজ কিশোর"।[৩]

অতুলপ্রসাদ রোজ কোর্টে যেতে লাগলেন। লখনৌয়ে তখন কোর্টের আনাচে-কানাচে পয়সার ছড়াছড়ি। উনিও ততদিনে অভিজ্ঞ হয়েছেন। তিনটি কোর্টে প্র্যাকটিস্ করে যেমন আইনজ্ঞানে দক্ষ হয়েছেন, তেমনি প্রথম জীবনে অসফলতার জন্য নিজের যা কিছু দুর্বলতা ছিল জয় করে নিয়েছেন।

ইংরাজ আমলে লখনৌয়ে প্রথম জুডিসিয়্যাল কমিশনারস্ কোর্ট স্থাপিত হয়। পরে উহা চীফ কোর্টে রূপান্তরিত হয়। হাইকোর্ট থাকে এলাহাবাদে।

ইংরাজ আমলে তালুকদারদের জন্য একটি বিলিতী আইন প্রচলন করা হয়, যার দ্বারা বংশের প্রথম সন্তান পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হত। বাকি সন্তানদের খোরপোষ এবং কিছু হাতখরচের ব্যবস্থা ছিল। এজন্য তালুকদার-দের মধ্যে শরিকে শরিকে ঝগড়া লেগেই থাকত।

অতুলপ্রসাদের প্রথমে বিরাট আয় না হলেও অর্থাগম হতে লাগল। এখন আর অভাব নেই, নেই নিরাশার বোঝা ঘাড়ে করে দিনের শেষে নিঃশব্দ পায়ে ফিরে আসা।

স্বামীর প্রাথমিক স্বল্প আয়েই হেমকুসুম সন্তুষ্ট, সুখী। তাঁর নানা গুণের মধ্যে সামান্য সামান্য জিনিস দিয়ে সুন্দর করে ঘর সাজাবার ক্ষমতাও একটি বিশেষ গুণ। অতুলপ্রসাদের সেই সামান্য আয়ের দিনে তুচ্ছ তুচ্ছ জিনিস

৩—শ্রীদিলীপকুমার সেন বলেছেন।

দিয়ে তিনি এমন করে ঘর সাজিয়ে রাখতেন যে, লোকে মনে করত মিস্টার সেন বোধহয় মাসে হাজার টাকা উপায় করেন।

সারাদিন হেমকুসুম যে ঘরসংসার নিয়ে পড়ে থাকতেন তা নয়। অবসর সময়ে লেশ বুনতেন, ছবি আঁকতেন, আর গান গাইতেন। তাঁর গলার স্বর বড় মিষ্টি ছিল।

অতুলপ্রসাদ কোর্ট থেকে ফিরে এলে চা-এর টেবিলে চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার অনুপানও চলে—দুজনের মনে কত সাধ, কত ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন। হেমকুসুম বলেন, আমাদের অবস্থা আর একটু সচ্ছল হলে শহরের ভেতর একটি বাড়ি দেখ। এ যেন কোন তেপান্তরে পড়ে আছি মনে হয়।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। অতুলপ্রসাদ সমর্থন করেন, একটি বড় বাড়ি ও তার সঙ্গে বড় কম্পাউণ্ড থাকবে। কম্পাউণ্ডে গোলাপ ফুলের বাগান করা হবে।

গোলাপ ফুল অতুলপ্রসাদের বড় প্রিয়।

শুনে হেমকুসুমের চোখ দুটি খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

॥ নয় ॥

কৃতজ্ঞ অতুলপ্রসাদ এবার লখনৌর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন; কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। প্র্যাক্‌টিসের ফাঁকে যে সময় পান তা উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করতে লাগলেন।

ইংরাজ আমলে রাজা দক্ষিণারঞ্জনের পর লখনৌকে দ্বিতীয়বার সুন্দর করে গড়ে তোলার কাজ আরম্ভ হল। এ কাজে অগ্রণী হলেন বাবু গংগাপ্রসাদ ভার্মা। তিনি প্রথম লখনৌ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের মেম্বার ও পরে ভাইস চেয়ারম্যান হন। লখনৌকে নবরূপে রূপান্তরিত করতে তিনি উৎসাহের সংগে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। এ কাজে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন লালা শ্রীরাম, নবীউল্লা বেগ এবং অতুলপ্রসাদ সেন।

এই সময়ে একাধিক সুন্দর সুন্দর ইমারত, রাস্তাঘাট, পার্ক, পাঠাগার ইত্যাদি তৈরী হয়। পার্কগুলি নানাবিধ ফুলপাতায় সুশোভিত করা হয়।

এভাবে লখনৌকে সুন্দর করে তোলার কাজে অতুলপ্রসাদ ছিলেন বাবু গংগাপ্রসাদের ডান হাত। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই সময়ে অতুলপ্রসাদের পরিশ্রম-

শক্তি, নিষ্ঠা, সততা দেখে মুগ্ধ হলেন; গংগাপ্রসাদের সংগে সংগে অতুলপ্রসাদের প্রসংশায় সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। অতুলপ্রসাদের জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি হল এবং লখনৌ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের ভবিষ্যৎ মেম্বার তথা ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবার পথ সুগম হল।

বাঙালী যেখানেই গেছে সংগে বহন করে নিয়ে গেছে তার সাংস্কৃতিক ধ্বজা—গ্রন্থাগার, সংঘ, নাট্যশালা। লখনৌবাসী যে কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি ১৮৯২ সালে 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার' স্থাপিত করেন তাঁদের নাম ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ, বিভূতিভূষণ ঘোষ, চারুচন্দ্র বসু ও বিপিনবিহারী বসু। এর দু'বছর পরে গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে 'বংগীয় যুবক সমিতি' গড়ে ওঠে।

সমিতির জন্মকালে এর প্রথম সভাপতি ছিলেন ক্যানিং কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রথম সেক্রেটারি ছিলেন ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ।

১৯০২ সাল থেকে সমিতির সুবর্ণ যুগ বা 'অতুলপ্রসাদ যুগ' আরম্ভ হয়। "এই বছর অতুলপ্রসাদ বংগীয় যুবক সমিতির সভাপতি হলেন এবং আমৃত্যু তিনি এ পদ অলংকৃত করে থাকেন"।[১]

অতুলপ্রসাদ বংগীয় যুবক সমিতির সভাপতি হবার পর সমিতির প্রত্যেক বিভাগের উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। "অর্থে ও সামর্থ্যে সমিতির প্রতি তাঁর অবদান অসামান্য"।[২] পরবর্তীকালে বহু ভারত-বিখ্যাত ব্যক্তিদের অতুলপ্রসাদ সমিতিতে আমন্ত্রণ করে এনে তাঁদের সম্বর্ধনা জানান এবং সমিতিকে সুবিখ্যাত করেন।

পরের বছর স্থানীয় 'গুডউইল' ক্লাব থেকে অতুলপ্রসাদের কাছে অনুরোধ এলো। অনুরোধ বহন করে নিয়ে এলেন নলিনীবিহারী হালদার, তাঁর সংগে অঘোরনাথ-পুত্র সত্যকুমার।

নলিনীবিহারী এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধুর যুগ্ম প্রচেষ্টায় গুডউইল ক্লাব ১৯০৩-এ জন্মলাভ করে। এই ক্লাবের উদ্দেশ্য ছিল দুঃস্থ, অসহায় লোকদের ওষুধ ও পথ্য দিয়ে সাহায্য করা, তাদের সেবাশুশ্রূষা করা এবং মৃতের দাহ করা।

ক্লাবের সভ্যদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে অতুলপ্রসাদ নবজাতক গুডউইল ক্লাবের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন এবং যথেষ্ট অর্থসাহায্যও করেন।

১, ২—'আমাদের কথা'—বেঙ্গলী ক্লাব রৌপ্য-জয়ন্তী সংখ্যা।

পরে এই ক্লাবের আদর্শে একাধিক 'সেবাশ্রম সমিতি' গড়ে ওঠে এবং প্রত্যেকটির কর্ণধার রূপে অতুলপ্রসাদ সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

বঙ্গভঙ্গের পর ১৯০৬ সালে অতুলপ্রসাদ বালকদের সংঘবদ্ধ করে মুষ্ঠিভিক্ষা সংগ্রহের প্রথম প্রচলন শুরু করেন, যা পরে 'আউধ সেবা সমিতি' নামে একটি সংঘ রূপে গড়ে ওঠে। এই সংঘের কাজ বাঙালী-অবাঙালী মিলিত ভাবে করত। অতুলপ্রসাদ ছিলেন এর সভাপতি।

পরে এই সমিতির অধীনে স্বেচ্ছাসেবক গঠন করা হয়, যারা বন্যা, দুর্ভিক্ষের সময় বিপদগ্রস্তদের সাহায্যে কাজ করবে।

পরবর্তী জীবনে অতুলপ্রসাদ নিজেই তাঁর বন্ধুবান্ধব-অনুরাগী-গুণগ্রাহীসহ আউধ সেবা সমিতির স্বেচ্ছাসেবক হয়ে কাজ করেছেন।

এই সমিতির জন্য যেমন তিনি শ্রমদান করেছেন তেমনি অর্থদানও করেছেন মুক্তহস্তে।

এই 'আউধ সেবা সমিতি' দীর্ঘস্থায়ী ও জনপ্রিয় হয়।

স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য লখনৌয়ে প্রথম বাঙালী স্কুল "হিন্দু গার্লস্ স্কুল" ১৮৯৫ সালে স্থাপিত হয়েছিল। রমেশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন এই স্কুল স্থাপনে প্রথম উদ্যোক্তা ও হোতা। তাঁর এই অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে হিন্দু গার্লস্ স্কুলের হলঘরে তাঁর প্রতিকৃতি রাখা হয়েছিল।

অতুলপ্রসাদের সময়ে তিনিই ছিলেন সব প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। ১৯০২ সালে তিনি হিন্দু গার্লস্ স্কুলের সভাপতি রূপে নির্বাচিত হন।

অবাঙালীর দেশে বসবাস করে তাদের বাদ দিয়ে শুধু বাঙালীদের নিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান চলবে, বিশেষ করে স্কুল-কলেজ অতুলপ্রসাদের তাতে সমর্থন ছিল না। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সংযোগ রেখে উভয়ের সহযোগিতায় কাজ করা প্রবাসে তিনি সমীচীন বলে মনে করতেন।

তাঁর উদার আহ্বানে বিশেশ্বরনাথ শ্রীবাস্তব, গোকরণনাথ মিশ্র এবং আরো অনেকে স্কুল কমিটির সদস্য হন। উভয় সম্প্রদায়ের যুগ্ম প্রচেষ্টায় স্কুল চলতে থাকে।

অতুলপ্রসাদ এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে স্থানীয় লোকদের বাঙালী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্কুলটি বাঙালীদের হস্তচ্যুত হয়ে যায়। স্কুল

কমিটিতে অবাঙালীদের সংখ্যাধিক্য হলে তাঁরা স্কুলটির নাম পাল্টে 'মহিলা কলেজ' করেন।

এ ঘটনার জন্য অতুলপ্রসাদের অবাঙালী-প্রীতি স্তিমিত হয় নি বা তাঁর মনের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নি।

॥ দশ ॥

শ্রীপাল সিংয়ের বাড়িতে কয়েক মাস থাকার পর অতুলপ্রসাদ কেশরবাগ সার্কাসের কাছে ব্যাংকস রোডে কম্পাউণ্ড-ঘেরা একটি বড় বাংলোয় চলে এলেন। তখনো তাঁর অবস্থা সচ্ছল নয়। "প্রথম প্রথম এখানেও অর্থসংকট কম ছিল না। এখন অতুলের মা-ও অতুলের সংগে আসিয়া থাকিতে লাগিলেন"।[১] হেমন্তশশীর বয়স হয়েছে। হিরণ, কিরণ, প্রভার বিবাহ হয়ে গিয়েছে। একা একা আর কোথায় থাকবেন। পুত্রের কাছে এসে থাকতে চাইলেন। মাতৃভক্ত অতুলপ্রসাদ সানন্দে মাকে নিজের কাছে এনে রাখলেন।

মা আসার পর একটি ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে হতে লাগল, তা হল উপাসনা সভা।

আগেও অতুলপ্রসাদ উপাসনা সভার আয়োজন বাড়িতে করেছেন, তবে সে কোন বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে—যেমন শিশু দিলীপকুমারের জন্মদিনে বা অন্য কোন কারণে। সে-সব উপাসনা সভায় অতুলপ্রসাদ এবং হেমকুসুম কত গান করতেন।

মা আসার পর বাড়িতে প্রতি রবিবার সকালে উপাসনা সভার আয়োজন হতে লাগল। অতুলপ্রসাদ এবং হেমকুসুম গান করতেন সে সভায়। আচার্যের পদ গ্রহণ করতেন অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়; উপস্থিত থাকতেন, অঘোর-পুত্র সত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, নলিনীবিহারী হালদার, ক্যানিং কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক সত্যেন রায়, ব্যারিস্টার দত্ত প্রভৃতি।

হেমন্তশশীর বড় ইচ্ছে যে কীর্তন শোনেন। মার ইচ্ছে কি অপূর্ণ রাখা যায়। অতুলপ্রসাদ সে ইচ্ছের কথা নলিনীবিহারীকে জানিয়ে কীর্তনিয়ার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন।

১ ৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।

নলিনীবিহারীর চেষ্টায় ভাল কীর্তনিয়া 'মূক ও বধির স্কুল'-এর হেডমাস্টার রেবতীকুমার অতুলপ্রসাদের বাংলোয় কীর্তন করতে রাজী হলেন। রেবতীকুমার প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।

এক রবিবার সন্ধ্যেবেলায় কীর্তনের আয়োজন হল। শ্রীরাধার বিরহ বর্ণনা করে রেবতীকুমার কীর্তন করলেন। তাঁর অনুরোধে নলিনীবিহারী কীর্তনের সঙ্গে খোল সংগত করলেন।

যখন কীর্তন শেষ হল অতুলপ্রসাদের দু' চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে। মুখে বার বার বলছেন, আহা মরি মরি!

কীর্তনের আয়োজন অতুলপ্রসাদের বাংলোয় প্রায়ই হত। অতুলপ্রসাদের অনুরোধে নলিনীবিহারী নিজেও হেমন্তশশীকে কীর্তন করে শুনিয়েছেন। অতুলপ্রসাদ সজল নয়নে তাঁর কীর্তন শুনেছেন।

কখন কখন গৌরভূষণ গোস্বামী (ইনি জাতে কায়স্থ ছিলেন তবে নিজেকে গোস্বামী বলতেন) অতুলপ্রসাদকে সংস্কৃত গীতা পড়িয়ে ও তা ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। তিনি গীতার ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

'সেন সাহেব' এই দুটি শব্দে অতুলপ্রসাদ তখন সারা লখনৌ শহরে অত্যন্ত সুপরিচিত আর নিকটতমের ছিলেন 'ভাইদাদা'। তখন তিনি এ শহরে সার্থক এবং সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার। আইনজ্ঞ হিসাবে তাঁর নাম তখন সংযুক্ত প্রদেশে এবং তার আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তিনি হেলায় দু' হাতে অজস্র ধন উপার্জন করতে থাকেন। সে প্রচুর অর্থাগমের পেছনে ছিল তাঁর সহৃদয় ব্যবহার ও সততা।

তখন লখনৌয়ে দশ-আনী, ছ-আনী ভিত্তিতে একাধিক উকিল মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা করতেন। নগদ ফী না নিয়ে পার্টির সঙ্গে উকিলেরা এই ব্যবস্থা করতেন যে, মামলায় জিতিয়ে দিলে পার্টির বিতর্কিত সম্পত্তির ছ' আনা উকিল পাবেন। এইভাবে লখনৌয়ে একাধিক উকিল বাড়ি-জুড়ি-গাড়ির মালিক হয়েছিলেন।

অতুলপ্রসাদ এভাবে কখনো আইন ব্যবসা করেন নি। তা ছাড়া মামলার খবরেই তিনি খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠতেন না। বরং মামলায়েচ্ছু দুই পার্টির কাছে নিজের মধ্যস্থতায় মিটমাটের চেষ্টা করতেন। এভাবে তিনি অনেক মামলার নিষ্পত্তি করে বিবদমান দুই পার্টিকে শান্ত করেছিলেন। যখন মধ্যস্থতায় ফল হত না তখন তিনি কেস হাতে নিতেন। এজন্য বাদী প্রতিবাদী

উভয়ের চোখেই তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁর এই সব সদ্‌গুণের জন্য আউধের প্রায় সব তালুকদারদের কেস তাঁর করায়ত্ত ছিল।

তাঁর দ্বার সবার জন্যই উন্মুক্ত ছিল; তাঁর কাছে বাঙালী-অবাঙালী মুসলমান-খৃস্টান কারুর সম্বন্ধে কোন ভেদাভেদ ছিল না। সকলেই তাঁর যেন আপনজন ছিলেন। গোখলে, মমতাজ হোসেন, বিশ্বেশ্বরনাথ ও চিন্তামণির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের প্রগাঢ়তা অনেকে কল্পনা করে উঠতে পারে না। তিনি লোকজন খুব ভাল বাসতেন, মজলিসী মানুষ ছিলেন। আবার লোকজনকে খাওয়াতেও খুব ভালবাসতেন; যে-কেউ আসতেন, আদর করে কিছু না খাইয়ে ছাড়তেন না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ও রবিবার সর্বক্ষণ লোকজন, গানবাজনা, হাসি-আনন্দ, পানভোজনে বাংলো তাঁর গমগম করত।

হেমকুসুমও লোকজনের সঙ্গে মিশতে, গল্প করতে, খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একই বংশসম্ভূত হওয়ায় দুজনের মধ্যে একই প্রকার গুণের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। উপরোক্ত গুণ ব্যতীত দুজনেই অত্যন্ত শৌখিন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন—সর্বদা ফিটফাট থাকতেন; হেমকুসুমের সাজসজ্জার মধ্যে সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যেত। অতুল-প্রসাদ কখনো এদেশীয় পোশাক—সেরওয়ানী ও চুড়িদার পাজামা পরতেন, কখনো রাজপুতানী পোশাক, আবার কখনো সাহেবী পোশাকে সাজতেন এবং চলায়-বলায় খুব কায়দাদুরস্ত ছিলেন।

ওঁদের সাজানো-গোছানো বাংলোটিকে ছবির মত মনে হত। তার ওপর হেমকুসুমের আঁকা ছবি ও অতুলপ্রসাদের সংগৃহীত পেন্টিংয়ে বাংলোটিকে যেন পিক্‌চার-গ্যালারী মনে হত। বাগান সর্বদা ঝকঝক করত।

দুজনেই কথোপকথনে পারদর্শী ছিলেন। একই সঙ্গে নানা ভাষাভাষী ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের ভাষায় কথা বলতে পারতেন। যখন বঙ্গভাষী, উর্দুভাষী, হিন্দীভাষী, ইংরাজীভাষী ব্যক্তিরা একই সঙ্গে ওঁদের কাছে বেড়াতে আসতেন, হেমকুসুম একই নিশ্বাসে প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁদের মাতৃ-ভাষায় কথা বলে যেতেন।

অতুলপ্রসাদও যখন একজন পশ্চিমবঙ্গবাসীর সঙ্গে খাস কোলকাতার ভাষায় গল্প করছেন, সেখানে একজন উর্দুভাষী আসতে তাঁর সঙ্গে পরিষ্কার উর্দু-ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। আবার যেই তাঁর মা 'অতুল' বলে ডাক্‌লেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'আইতাছি মা'।

সবার ওপর দুজনের স্বভাবই মধুর, মমতাপূর্ণ ও আকর্ষণীয় ছিল। গংগাপ্রসাদ ভার্মা, জগৎনারায়ণ মোল্লা, মমতাজ হোসেন, নবীউল্লা বেগ, লালা শ্রীরাম, বিশ্বেশ্বরনাথ শ্রীবাস্তব, সামীউল্লা বেগ, গোকরণনাথ মিশ্র এবং আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অতুলপ্রসাদের সংগে দেখা করতে প্রায়ই আসতেন।

অতুলপ্রসাদও তাঁর অবসর সময়ে ঐ সব বন্ধুদের বাড়ি গিয়ে তাঁদের খবর নিতেন।

অতুলপ্রসাদ 'সেন সাহেব' হলেও বাঙালী সংগ পছন্দ করতেন। তাঁর উপাসনা সভায় বন্ধু ও অনুরাগীরা তো আসতেনই, তা ছাড়া যে সব বাঙালী বন্ধুরা আসতেন তাঁদের মধ্যে ডাক্তার এস. সি. দাস ও উকিল জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার ওদেদার ও ব্যারিস্টার নগেন ও সুরেন সিংহের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। জীবন কৃষ্ণের অতুলপ্রসাদের বাংলোয় খুবই যাওয়া-আসা ছিল। জন পান্নাচন্দ্র ভট্টাচার্য ও তাঁর পরিবারবর্গের সংগেও তাঁর হৃদ্যতা ছিল।

॥ এগারো ॥

উনিশ শতকের প্রথম দশকে সংযুক্ত প্রদেশের রাজনীতিচর্চাকে 'আর্মচেয়ার পলিটিক্‌স্' আখ্যা দেওয়া হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের কবরের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির ধারক ছিলেন এদেশের তালুকদাররা আর পশ্চিমী শিক্ষার গুণে দেশের প্রগতির অগ্রগতির বাহক ছিলেন আর্মচেয়ার রাজনীতিবিদরা। শিক্ষার গুণে ও রুচির পরিবর্তনের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা রাজনীতিচর্চায় সময় ব্যয় করাকে জীবনের এক অপরিহার্য অংশ বলে ধরে নিয়েছিলেন। সীমাবদ্ধ অধিকার সম্বন্ধে সভাসমিতি করে নম্রভাবে আলোচনা করা, মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সদস্য হয়ে শহর উন্নয়ন করা, স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা—এইভাবে ধাপে ধাপে তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সব কাজ সেদিনের শিক্ষিত ব্যক্তিরা, যাঁরা তখনকার দিনে একমাত্র রাজনৈতিক সংস্থা কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন, আগ্রহের সংগে করতেন—বিশেষ করে এ ধরনের রাজনীতিচর্চা আইনজীবীদের আয়ত্তাধীন ছিল ; তাঁরাই ছিলেন জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রথম আলোকবাহী।

লখনৌয়ে প্রথম ইংরাজী পত্রিকা বাবু গংগাপ্রসাদ ভার্মা পরিচালিত

"অ্যাডভোকেট" দেশ ও দেশবাসী সম্বন্ধে তখনো ততসোচ্চার নয়। তার জন্য আরো কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তখনকার রাজনীতিবিদরা আরো এক ধাপ এগিয়ে "লীডার" পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। তখনকার দিনে "লীডার"কেই সরকার এত ভয় করতেন যে উক্ত পত্রিকা ছাত্রদের পড়া নিষিদ্ধ ছিল। ১৯১৩ সালে মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে মুসলমানদের পৃথক আসনের দাবিকে কেন্দ্র করে এঁরা খানিকটা উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলেন এবং প্রতিবাদ করেছিলেন। অন্যথায় সুরাট কংগ্রেসের মারামারির পর এবং লখনৌ কংগ্রেসের অধিবেশনের আগে পর্যন্ত রাজনীতি ক্ষেত্রে বিরাট কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

গান্ধীজীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এই ছিল এ প্রদেশের পটভূমিকা। যে পটভূমিকা সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে খুব উজ্জ্বল নয় তবু রাজনৈতিক কষ্টিপাথরে তার মূল্যায়ন অস্বীকার করা যায় না।

অতুলপ্রসাদ অস্বীবার করতে পারলেন না তাঁর অনুরাগী বন্ধু রাজনীতিবিদদের অনুরোধ।

১৯০২ সালে লখনৌয়ে অতুলপ্রসাদ একজন অজ্ঞাতনামা অখ্যাত ব্যক্তি। কিন্তু ১৯০৫ সালে তিনি শুধু সুপ্রতিষ্ঠিত, স্বনামধন্য ব্যারিস্টারই নন, সংযুক্ত প্রদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা, লখনৌয়ের মুকুটহীন নবাব, অনুরাগীর বন্ধু, গরীবের মা-বাপ। তাঁকে বাদ দিয়ে কোন কিছু গড়ে তোলা বা সভাসমিতি করার কথা ভাবাই যেত না। সর্বত্র তাই তাঁর উপস্থিতি অনিবার্য, তাঁর পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ অচল, সব কিছুতেই তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা চাই—গানের আসর, সাহিত্যসভা, এমন কি রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁর পরিচালনার অপেক্ষা রাখত।

১৯০৫-এ বেনারসে কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। সেন সাহেবের বাংলোয় পৌঁছে গেলেন মাননীয় রাজনীতিবিদরা—গঙ্গাপ্রসাদ ভার্মা, গোকরণনাথ মিশ্র, বিশ্বেশ্বরনাথ শ্রীবাস্তব, মমতাজ হোসেন এবং আরো অনেকে। লখনৌ থেকে যে কজন কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য নির্বাচিত হলেন অতুলপ্রসাদ তাঁদের মধ্যে একজন। তখন কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য হওয়া সহজ ছিল না এবং যে কেউ চাইলেই হতে পারতেন না।

তাঁকে অনুরোধ জানালেন সবাই; লখনৌস্থিত অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের আপনি হলেন নেতা, বেনারসে তাঁদের পরিচালনার ভার আপনার উপর।

সম্মানের সামনে অতুলপ্রসাদ সলজ্জে নত হয়ে যান। কথা বলতে গিয়ে তাঁর কথা আটকে যায়। তিনি প্রতিবাদ করে বাধা দেন, আমায় কেন, আরো তো যোগ্য লোক রয়েছেন, আপনারাই তো আছেন...

গুণমুগ্ধেরা নাছোড়বান্দা, সামিউল্লা বেগ পরিষ্কার ভাষায় জানান, যা আমরা স্থির করেছি তার আর অদলবদল করবেন না। আমাদের অনুরোধ আপনি দয়া করে এ নেতৃত্ব স্বীকার করে নিন।

যথাসময়ে বেনারসে কংগ্রেস অধিবেশনের শুভারম্ভ হল। সভাপতির আসন অলংকৃত করলেন মহামতি গোখলে। অতুলপ্রসাদ সে সভায় লখনৌবাসী অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের নেতারূপে যোগদান করলেন। তিনি তখন জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত।

বাংলা দেশের ইতিহাসে ঐ বছরটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯০৫ সালে অক্টোবর মাসে প্রথমবার বাংলামায়ের পূত অঙ্গকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়। তার ফলে বাংলার জনজীবন আঘাত ও বেদনায় অস্থির হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের অশান্ততা সুদূর সংযুক্ত প্রদেশে স্বদেশপ্রেমী অতুলপ্রসাদকেও গিয়ে স্পর্শ করে; তিনি ব্যথিত হন। আবার দেশ-বিভাগকে কেন্দ্র করে সারা দেশব্যাপী জনজাগরণ ও গণআন্দোলনে তিনিও উৎসাহিত বোধ করেন। বাংলাদেশে ছুটে যান। সেখানে পদাপর্ণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এক অভাবিত অভিজ্ঞতা হয়, "তখন স্বদেশী আন্দোলন খুব চলছে, আমি কলিকাতায় যাইব বলিয়া রওনা হইয়া হাওড়া স্টেশনে নেমে দেখি অনেক ছেলে মিলে আমার একখানি স্বদেশী গান সমবেত কণ্ঠে গাহিতে গাহিতে চলেছে। আমি অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনিলাম এবং ভাবিলাম আমার গান এত সমাদৃত হয়েছে! তখন কাছে একটি ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করিলাম: 'এ গানটি কার ভাই তোমরা যা গাইছ! ছেলেটি আশ্চর্য হয়ে বলিল, কেন, এ তো অতুলপ্রসাদ সেনের গান, আপনি জানেন না!' আমি আর কি বলিব, একটু হেসে নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলাম"।[১]

অশান্ত বাংলার অভাবনীয় শক্তিরূপ দেখে অতুলপ্রসাদ বিস্মিত, মুগ্ধ হন। তাঁর নিজের ভাষায়, "আমি সে সময় কলিকাতায় গিয়াছিলাম। গঙ্গার ধারে গিয়া দেখিলাম দেশপ্রেমিকেরা গান গাহিতে গাহিতে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন—বঙ্গবিচ্ছেদের অভিশাপ ক্ষালন করিবার জন্য; শোভাযাত্রার সর্ব-

১—স্বামী দেবেসানন্দ মহারাজ—চিঠি। অতুলপ্রসাদ স্বামীজীকে উপরোক্ত ঘটনা বলেছিলেন।

প্রথমে একটি অল্পবয়স্ক বালক একটি স্থূলকায় ভদ্রলোকের স্কন্ধে চড়িয়া হাত তুলিয়া সুললিত কণ্ঠে গাহিতেছে—'বাংলার মাটি বাংলার জল……।' আর সকলে সহস্র কণ্ঠে সে গানের পুনরাবৃত্তি করিতেছে।……সে দৃশ্য এতই হৃদয়-স্পর্শী যে আমার চোখে জল আসিল।' রবীন্দ্রনাথ নতশিরে সে স্নানযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন। যুবকরা তখন স্ফীতবক্ষে গাহিত—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে—'"।[২]

সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল বঙ্গভঙ্গ। সভাপতির ভাষণে গোখলে বাঙালীর দেশপ্রেম ও আন্দোলন-শক্তির উল্লেখ করে বলেন—"…সমগ্র ভারত-বর্ষ এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলা দেশের কাছে ঋণী"।[৩]

গোখলের ভাষণে, ব্যক্তিত্বে, প্রজ্ঞায় অতুলপ্রসাদ মুগ্ধ হলেন। অতুল-প্রসাদের ব্যবহারে প্রীত হয়ে গোখলে লখনৌয়ে এসে 'সেন সাহেবের' আতিথ্য গ্রহণ করলেন।

গোখলে অতুলপ্রসাদের বাংলোয় এলে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর সামনে রবীন্দ্রনাথের গান—"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক" বাংলায় গাওয়া হয়।

গোখলে বাংলা কিছু কিছু বুঝতেন। রবীন্দ্রনাথের গান শুনে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। অতুলপ্রসাদের গান—"উঠ গো ভারতলক্ষ্মী" গাওয়া হয়। গোখলে অতুলপ্রসাদকে খুবই ভালবাসতেন।

এরপর গোখলেকে বঙ্গীয় যুবক সমিতিতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

যখনি কোন সম্মানীয় ব্যক্তি আসতেন বঙ্গীয় যুবক সমিতি-তে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হত এবং তার সব কিছু ব্যয়ভার অতুলপ্রসাদ স্বয়ং বহন করতেন।

প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেই গোখ্‌লে এবং অতুলপ্রসাদ উভয়ে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হন। অতুলপ্রসাদ গোখ্‌লের প্রতি এতই অনুরক্ত হয়ে ওঠেন যে তাঁর শোবার ঘরে খাটের পাশে মাথার দিকে টেবিলের ওপর গোখ্‌লের একটি ফোটো রাখা থাকত। মাথা বালিশ থেকে একটু উঁচু করলেই তিনি তাঁর প্রিয় নেতাকে দেখতে পেতেন।

সি. ওয়াই. চিন্তামণি এই বছরেই অতুলপ্রসাদের সংস্পর্শে আসেন। তিনি

২—অতুলপ্রসাদ সেন—'আমার কয়েকটি রবীন্দ্র-স্মৃতি'

৩—যোগেশচন্দ্র বাগল—"মুক্তির সন্ধানে ভারত"।

অতুলপ্রসাদের কাছ থেকে যেমন স্নেহ তেমনি সাহায্য পেয়েছিলেন। তাঁর সকল আর্থিক অসুবিধে ও প্রয়োজনে অতুলপ্রসাদ মুক্তহস্ত ছিলেন।

সে প্রীতিপূর্ণ সাহায্যের পরিমাণ এতই বিরাট ছিল যে চিন্তামণি তাঁর জীবিতকালে তা সর্বদা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন।[৪]

॥ বারো ॥

অতুলপ্রসাদের পারিবারিক জীবন যে সুখের ছিল না সেকথা তাঁর একাধিক আত্মীয়স্বজনেরা স্বীকার করেছেন।

সত্যপ্রসাদ সেন তাঁর ডায়েরীতে অতুলপ্রসাদের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

জ্যোৎস্না সেন তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন: "অতুলপ্রসাদের পারিবারিক জীবন সুখের হয় নি। এজন্য তাঁর আক্ষেপের সীমা ছিল না।"[১]

ললিতা দাস তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন: "ধনী, মানী, যশস্বী অতুলপ্রসাদ কিন্তু দুঃখী ছিলেন…। পারিবারিক জীবনে তিনি কোনও সুখ পান নাই…।"[২]

সুখ-দুঃখ যে কোন ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার; তা গোপনতার সীমানার ওপারে থাকাই ভাল। কিন্তু কবি অতুলপ্রসাদকে জানতে হলে বিশেষ করে তাঁর কাব্য-সংগীতের অমিয়ধারার উৎস কোথায় জানতে হলে তাঁর পারিবারিক জীবন ও সুখ-দুঃখের কথা জানা একান্তই দরকার। কবির জীবনকে অনুধাবন না করে তাঁর কাব্যের রসাস্বাদন করা বা তাঁর গানের গভীরতার মর্মোদ্ঘাটন করতে যাওয়া অন্ধকারে পথ খোঁজার মতই এক অসম্ভব, অভাবনীয় ব্যাপার।

৪—শ্রীযুক্তা বেলা সেনের মুখে শুনেছি যে তাঁর বিয়ের পর সি. ওয়াই. চিন্তামণির কাছ থেকে তাঁর নামে কিছু টাকা আসে। উনি ভাবলেন, শ্বশুরের বন্ধু, বিয়ে উপলক্ষে এই টাকা আশীর্বাদ স্বরূপ পাঠিয়েছেন। পরে আবার ঠিক তত টাকাই এলো। ভাবলুম ভুল করে পাঠিয়েছেন। চিঠি লিখলুম। উত্তরে সি. ওয়াই. জানালেন, তোমার শ্বশুর মহাশয় আমার জন্যে যে কত টাকা ব্যয় করেছেন তার ঠিকঠিকানা নেই। তিনি আজ নেই। দিলীপ বিয়ে করেছে। তুমি খরচ করবে বলে এই টাকা পাঠাচ্ছি।

এমনি ভাবে আরো কয়েকবার সি. ওয়াই. টাকা পাঠিয়েছিলেন।

১—শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্না সেন—"খুল্লতাত স্মরণে": "আমাদের কথা"

২—শ্রীযুক্তা ললিতা দাস—"অতুলপ্রসাদ স্মরণে": "আমাদের কথা"

বাইরের জগতে অতুলপ্রসাদ যখন অর্থ, প্রতিপত্তি, জনপ্রিয়তায় সার্থক; সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরের দিকে দৃঢ়পদে এগিয়ে চলেছেন, তখনি অশান্তি তাঁর ঘরের বাতাসকে দূষিত, উত্তপ্ত করে তুলেছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ক্রমেই নিরানন্দ, তিক্ত, অসহ হয়ে উঠতে লাগল।

অথচ অতুলপ্রসাদ এবং হেমকুসুম দুজনেই অশেষ সদ্‌গুণের অধিকারী ও অধিকারিণী ছিলেন। দুজনের মধ্যেই শিক্ষাদীক্ষা, ভদ্রতা, অমায়িকতা, মায়ামমতা, পরোপকারিতা, দানশীলতা কিছুরই অভাব ছিল না। দুজনেই সুরুচিসম্মত এবং পূতচরিত্রের মানুষ ছিলেন। কাব্যে, সংগীতে, শিল্পে দুজনেরই অধিকার ছিল। তবু তাঁরা পারিবারিক জীবনে সুখী হতে পারলেন না।

সত্যপ্রসাদ সেন তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন: "মা অতুলের কাছে থাকতে এলে, এই সময়ে অতুলের জীবনে মস্ত পরীক্ষা আরম্ভ হইল"।...

সত্যিই অতুলপ্রসাদের জীবনে সে এক বিরাট পরীক্ষা, তখন থেকেই অশান্তি দেখা দিল। সত্যপ্রসাদ এর কারণ সম্বন্ধে বলেছেন যে, অতুলপ্রসাদের স্বমতে মামাতো ভগ্নীকে বিবাহ করা এবং হেমকুসুমের স্বভাব ও ব্যবহার এজন্য দায়ী।

অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমকে বিবাহ করার জন্য আত্মীয়স্বজন দ্বারা পরিত্যক্ত হন এবং জীবনে অভাবের সংগে লড়াই করে তাঁকে যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করতে হয়।

কিন্তু আবার সুদিন এলে এবং আত্মীয়স্বজন তাঁর কাছে এসে থাকতে চাইলে তিনি অন্তরের সংগে তাঁদের আহ্বান জানান। আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে তিনি ভালবাসতেন।

"কিন্তু আত্মীয়দের সংগে অতুলের যোগ থাকে ইহা তাহার পত্নীর ইচ্ছা না ....."।[৩]

অতুলপ্রসাদ লখনৌ এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর অতীতের দুঃখ, বেদনা, অভিমান সব ভুলে গিয়েছিলেন। হেমন্তশশী বলামাত্র তাঁকে নিজের কাছে এনেছেন। মার প্রতি অতুলপ্রসাদের এতদিনের অভিমান তখন সীমাহীন মমতায় পরিবর্তিত হয়েছে। মার প্রতি তখন অতুলপ্রসাদের যেমন আনুগত্য দেখা যায় তেমনি সন্তানের ওপর মার অসীম প্রভাব গড়ে ওঠে। অতুলপ্রসাদের পরবর্তী জীবনে মার প্রভাব এবং তাঁর দ্বন্দ্বহীন আনুগত্য জেনে স্তম্ভিত হতে হয়। পরে, অতুলপ্রসাদ তাঁর ভগ্নীদের ও তাঁদের সন্তানসন্ততিদের কাছে এনে

৩—সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।

রেখেছেন। আবাল্যের বন্ধু ও প্রাণের ভাই, দাদা সত্যপ্রসাদও একাধিকবার এসে অতুলপ্রসাদের কাছে থেকেছেন।

কিন্তু অতুলপ্রসাদের আত্মীয়-পরিজনরা মামাতো বোন হেমকুসুমকে বিবাহ করার কথা ভুলতে পারেন নি। আমাদের দেশে চিরাচরিত প্রথামত এক্ষেত্রে যেমন মেয়েদেরই দোষী করা হয় তাঁরাও তেমনি হেমকুসুমকে এজন্য দায়ী করেছেন এবং বার বার অসন্তোষে ঝলসে উঠেছেন।[৪]

অপর দিকে হেমকুসুম তাঁর বিবাহিত জীবনে ইতিমধ্যেই অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। বিদেশে নিঃস্ব অবস্থায় স্বামী-সন্তানদের নিয়ে সেই দুঃখের দিনগুলি তিনি ভুলতে পারেন নি ; ভুলতে পারেন নি অভাবের মধ্যে অসহায় অবস্থায় সন্তানের মৃত্যু ও তাঁর নিদারুণ শোক। ভুলতে পারেন নি সেই দুর্দিনে পরমাত্মীয়দের উদাসীন, ক্ষমাহীন ব্যবহার। তাই অতুলপ্রসাদের মত উদার হৃদয়ে সব কিছু ভুলে ক্ষমা করতে পারেন নি।

দ্বিতীয়তঃ হেমন্তশশী চারটি সন্তানসহ দ্বিতীয়বার বিবাহ করায় নিজের আত্মীয়দের সংগে তাঁর সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাঁর সংগে একত্রে বসবাস করতে হেমকুসুমের সমর্থন ছিল না।[৫]

তাছাড়া অতুলপ্রসাদ স্বনামখ্যাত এ. পি. সেন হবার পর যেমন বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু ও অনুরাগী ভক্ত পেয়েছিলেন, তেমনি তার স্বচ্ছলতার ও উদারতার সুযোগ নিয়ে কিছু সুবিধাবাদী লোক বন্ধু বা ভক্তরূপে তাঁর অন্দরমহল পর্যন্ত আনাগোনার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল।

অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুমের অন্যান্য গুণের মধ্যে সরলতাও ছিল আর এক গুণ। ফলে ঐ সব সুবিধাবাদীর দল, আত্মীয়স্বজনকে কেন্দ্র করে সর্বদা স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ জিইয়ে রেখে অশান্তির সৃষ্টি করত ; একের সম্বন্ধে অন্যকে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তুলত।

আত্মীয়স্বজনকে কেন্দ্র করে অশান্তির প্রবাহ এত প্রবল ও এত তিক্ত হয়ে উঠত যে মাঝে মাঝে অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুমের মধ্যে বিচ্ছেদ দেখা দিত।

হেমকুসুম অত্যন্ত জেদী ও রাগী ছিলেন। রাগলে তাঁর আর বাহ্যজ্ঞান থাকত না। আবার অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তেজস্বিনী রমণী ছিলেন, অন্যায় বুঝলে যাকে যা বলতে চাইতেন স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতেন, যাঁকে বলতেন তাঁর বয়স বা পদমর্যাদার খেয়াল করতেন না।

৪, ৫—সেন পরিবারের একজন নিকট আত্মীয়া—সাক্ষাৎ

তাঁর এই অন্যায়বোধ যেমন অন্যের সম্বন্ধে তেমনি নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। তাই কোন অন্যায় তিনি সহ্য করতে, মানিয়ে নিতে পারতেন না। তা ছাড়া তিনি কোনদিনই ভুলতে পারেন নি যে, তিনি স্যার কে. জি. গুপ্তের কন্যা। তাঁর হাব-ভাব, চলন-বলন সবই যেন রাজ্ঞীর মত ছিল। ফলে আনুগত্য স্বীকার করে নিজের অধিকার বজায় রাখা, ধরে রাখা অপেক্ষা দূরে সরে যাওয়াকে শ্রেয় মনে করতেন।

এই নিয়ে তাঁদের এক আত্মীয়তুল্য বিজ্ঞ বন্ধু তাঁকে উপদেশ দিতে এলে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে বলে ওঠেন, 'আমার শারীরিক কোন কষ্ট নেই ঠিক কিন্তু মানসিক কষ্ট কি কষ্ট নয়?'

ক্রোধে, অভিমানে, উত্তেজনায় তিনি বার বার দিশেহারা হয়ে পড়তেন। অতুলপ্রসাদকে ঘিরে তাঁর যত রাগ; তাঁর সব প্রত্যাশা তো স্বামীর কাছেই। বার বার উত্তেজিত হওয়ার দরুন তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শেষে তিনি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন।

আর অতুলপ্রসাদ, সব পূর্ণতা ও আনন্দের মাঝখানে থেকেও তাঁকে বেদনা-ঘন এক অপূর্ণতা ও শূন্যতার শিকার হতে হয়। তিনি আশা করলেন, কল্পনা করলেন, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাবলেন, যেমন সব স্বামী ভেবে থাকেন যে হেমকুসুম একদিন নত হয়ে জয়ী হবেন। কিন্তু তা হল না। তিনি ক্ষুব্ধ হলেন, নিরাশ হলেন, দুঃখের ব্যথায় তাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু সেই দুঃখকে আসন করে তিনি সাধকের মত সৃষ্টির সাধনায় লিপ্ত হলেন, অমৃত পরিবেশনের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন; সে অমৃত হল তাঁর হৃদয়-বেদনার রসসিক্ত মধুর কাব্য-সংগীত।

॥ তেরো ॥

স্যার কে. জি. গুপ্ত লখনৌয়ে এলেন। ১৯০৭ সালে দি কাউন্সিল অফ্ দি সেক্রেটারি অফ্ দি স্টেট অফ্ ইণ্ডিয়ার মেম্বার হয়ে উনি সপরিবারে বিলেত চলে যান।

যাবার আগে প্রিয় দৌহিত্র দিলীপকুমার ও স্নেহের হেমকুসুমকে দেখতে এলেন।

হেমকুসুমের মনে প্রচণ্ড অভিমান। মনে পড়ে যায় বিলেতের সেই ভয়াবহ দিনগুলির চিত্র ; কত দুঃখ কষ্ট হতাশার চিত্র সেগুলি···হেমকুসুম যেন কঠিন হয়ে ওঠেন। কিন্তু তার পাশাপাশি আর একটি চিত্রও দেখা দেয়। অতুলপ্রসাদ হেমকুসুম বিলেত যাবেন। এদেশে তাঁরা বিবাহে সম্মতি তো পেলেনই না, পরন্তু আত্মীয়স্বজন সব তাঁদের ওপর অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের পরিত্যাগ করেছিলেন।

কিন্তু সেই দুর্দিনে স্যার কে. জি. তাঁদের দিকে তাঁর সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ; তবে গোপনে, প্রকাশ্যে নয়। তাঁর মত গণ্যমান্য ব্যক্তির পক্ষেও তখনকার সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে কিছু করা সহজ বা সম্ভব ছিল না। তাঁর গোপন সাহায্যের ফলে হেমকুসুম ও অতুলপ্রসাদের দীর্ঘ দুর্গম যাত্রাপথ সুগম সরল হয়েছিল।

চিন্তার সংগে সংগে হেমকুসুমের মন নরম হল।

হেমকুসুমকে দেখে স্যার কে. জি-র আনন্দের সীমা রইল না। তাঁর সব সন্তানদের মধ্যে এই অভিমানী, ছেলেমানুষী স্বভাবের মেয়েটিকে তিনি সবচেয়ে ভালবাসতেন, সবচেয়ে তাঁর প্রিয় ছিল। আবার তাঁরই একমাত্র সন্তান দিলীপকুমার! তাঁকে কাছে পেয়ে স্যার কে. জি-র মনে হল যেন একরাশ সম্পদ নাগালের মধ্যে পেয়ে গেছেন।

অতুলপ্রসাদ সসম্মানে স্যার কে. জি-কে নিজের বাংলোয় নিয়ে এলেন। তাঁর সেবাযত্নের ত্রুটি রইল না।

বংগীয় যুবক সমিতির সভ্যরাও স্যার কে. জি-কে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে নিয়ে গেলেন।

প্রবাসে, বাংলাদেশের যুবকদের উৎসাহ ও প্রতিষ্ঠান দেখে স্যার কে. জি. মুগ্ধ হয়ে যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। যাবার আগে বংগীয় যুবক সমিতিকে ভালরকম অর্থসাহায্য দিয়ে গেলেন।[১]

স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ বিদায় নিলেন।

হেমন্তশশী কয়েক বছর লখনৌয়ে অতিবাহিত করে আগেই কোলকাতায় চলে গিয়েছেন। তিনি চলে গেলেও তাঁকে কেন্দ্র করে যে উপাসনা সভা গড়ে উঠেছিল সেটি তেমনিই রয়ে গেল। প্রতি রবিবার সকালে নিয়মিত ভাবে উপাসনা সভার আয়োজন হতে থাকল।

১—সত্যকুমার মুখোপাধ্যায়—ডায়েরী

ধর্মমত সম্বন্ধে অতুলপ্রসাদ অত্যন্ত উদার ছিলেন।

তাঁর শৈশবকাল ধর্ম-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। প্রথম জীবনে তাঁর মনের ওপর নববিধান সমাজের প্রভাব পড়েছিল। পিতৃবিয়োগের পর মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের অভিভাবকত্বে প্রতিপালিত হন। মাতামহ কালীনারায়ণের ধর্মমত অত্যন্ত উদার ছিল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজী হয়েও তিনি জামাতা রামপ্রসাদ সেনের বাড়িতে নববিধান সমাজের উপাসনা সভায় যোগ দিতেন। আবার বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে খোল-করতাল বাজিয়ে নগর-সংকীর্তনে বেরিয়ে পড়তেন। মুসলমানদের সংগে তাঁর অবাধ মেলামেশা ছিল এবং তাঁদের ধর্মোৎসবে যোগ দিতে দ্বিধা করতেন না। দান, সেবা, সৎকাজ করে আনন্দ পেতেন। এইরূপ আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে অতুলপ্রসাদও ধর্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত উদার মতাবলম্বী ছিলেন এবং মাতামহের মত দান, সেবা ও সৎকাজকে তিনি তাঁর জীবনের আদর্শ বলে অনুসরণ করতেন।

অতুলপ্রসাদ লখনৌয়ে এসে সফলতা লাভ করার পর সামাজিক নানা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হন এবং নানা সৎকাজে অবসর সময় ব্যয়িত করেন। তাঁর এই পরহিতকর কাজের মধ্যে ভারবোধ ছিল না, বরং আন্তরিকতা এবং আনন্দ ছিল। তাই অনেক স্থলে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েও কাজ করেছেন।

এখানে আসার পর তিনি স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সংগে যুক্ত হন। রামপ্রসাদ সেন নববিধান সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অতুলপ্রসাদ তাঁর জন্মসূত্রে নববিধানী। কিন্তু তিনি ক্রমে ক্রমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তার প্রধান কারণ দুটি।

একটি হল, অতুলপ্রসাদ যখন লখনৌয়ে আসেন তখন স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে নববিধান সভ্যদের সংখ্যাধিক্য ছিল। জনশ্রুতি যে অতুলপ্রসাদ তাঁর মাতুলকন্যা হেমকুসুমকে বিবাহ করায় নববিধানীদের নিকট হতে সহযোগিতা লাভ করতে পারেন নি। ফলে তিনি বিব্রত বোধ করে সরে দাঁড়ান; মাঘোৎসবের সময়, মাত্র একবার সমাজে যেতেন।

দ্বিতীয় কারণ হল, তাঁর মার প্রভাব। হেমন্তশশী রামপ্রসাদ সেনের পত্নীরূপে নববিধান মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু দুর্গামোহন দাশকে বিবাহ করার পর তিনি আবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ফিরে যান এবং উক্ত সমাজের আদর্শই তাঁর আদর্শ হয়ে ওঠে।

হেমন্তশশী লখনৌয়ে আসার পর অতুলপ্রসাদ ক্রমশঃ মায়ের ধর্মমতের ও

আদর্শের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েন। হেমন্তশশী দয়াবতী, পরোপকারিণী, দানশীলা, ব্যক্তিত্বসম্পন্না ও জেদী-প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। অতুলপ্রসাদের ওপর তাঁর অসাধারণ প্রভাব ছিল।

আবার অতুলপ্রসাদ অত্যন্ত কোমল মনের স্পর্শকাতর মানুষ ছিলেন। মার প্রথম জীবন দুঃখের ছিল, তার ওপর তিনি অল্পবয়সে বিধবা হন। অতুলপ্রসাদ তাই তাঁর আজ্ঞাপালন করতে, তাঁকে শান্তি দিতে সর্বদা সচেষ্ট, সতর্ক থাকতেন।

মার প্রভাবে অতুলপ্রসাদ তাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুরক্ত হয়ে ওঠেন; তাঁর সেবাধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি মানবসেবাকেই ঈশ্বরের সেবা-প্রীতি বলে গ্রহণ করেন। নিরপেক্ষতা, সেবা ও মানুষের মাঝেই ঈশ্বর এই বিশ্বাসই ছিল তাঁর ধর্মমত। সে মতবাদকে তিনি ব্যক্তিগত জীবনে নিষ্ঠার সংগে অনুসরণ করেছেন। মানুষের সেবায়, দরিদ্রনারায়ণের সেবায় তাঁর উৎসাহের সীমা ছিল না। নিজের আবাস যেন পান্থশালা ছিল। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করতেন। বাড়িতে যেমন উপাসনা সভা হত, তেমনি সময়-সুযোগ হলে বৈষ্ণব কীর্তনের আসরও বেশ জমিয়ে বসত। কীর্তন শুনে দু' চোখ তাঁর জলে ভরে উঠত। আবার নিজেও কখনো কখনো হারমোনিয়াম বাজিয়ে স্বরচিত কীর্তন করতেন। নলিনীবিহারী, জগা মোহান্ত তাঁর দুপাশে বসে খোলকরতাল বাজাতেন। বেহালা বাজাতেন সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ আর বাঁশী বাজাতেন মনু মুখোপাধ্যায়। তাঁর স্বরচিত কীর্তনগুলির মধ্যে তিনি বার বার গাইতেন :

"কত কাল রবে নিজ যশ-বিভব-অন্বেষণে ?
দুদিনের ধনের লাগি ভুলিলে পরম ধনে !
ঘরেতে ধন করো পুঁজি, সংগে নেবে ভাবো বুঝি ?
দীনের দুঃখ করো হে মোচন, দীনের অভাব নাই এ দেশে।
দীনের ধনেই ধনী তোমরা—দীনবন্ধু হবেন সুখী।
দীনের দুঃখ করহে মোচন, পুণ্য হবে ধন-অরজনে।

দুটি ঘরে জ্ঞানের আলো, কোটি ঘরে আঁধার কালো ;
এ আঁধার ঘুচাতে হবে—নইলে এ দেশ এমনি রবে।
দানেই এ জ্ঞান দ্বিগুণ হবে—এরাও তোমার মায়ের ছেলে।
এ আঁধার ঘুচাতে হবে যতনে, অতি যতনে।

পুরানো সে ত্যাগের কথা হৃদয়ে কি দেয় না ব্যথা ?
সেই দেশের মানুষ তোমরা—
যেথা রাজার ছেলে হত ফকির, যেথা পরের তরে ঝরত আঁখি ;
যেথা ধন হতে প্রেম ছিল বড়ো, যেথা ধনী ছিল দীনের অধীন।
সেই দেশের মানুষ তোমরা—সে কথা কি আছে মনে ?

কেন এলে তবে মানবের ভবে রবে যদি নিজ কাজে ?
সবাকার মান হোক তব মান, অপমান পর-লাজে।—
সে দিন কবে বা হবে ?
জাতিকুল—অভিমান, দ্বেষ-নিন্দা-ভেদজ্ঞান,
ভারতে আনিল মরণ—ভাই হে।
কবে হবে এ সুমতি, সবার উন্নতি হইবে সবারই সাধন—
হেন সাধন আর নাই হে।

এ-হেন সাধনে জীবনে মরণে পূজিব হে প্রেমসিন্ধু।
মোরা পূজিব তোমায়
সেবার কুসুম কুড়াইয়া, নিজের পূজা ঘুচাইয়া,
পরের দুঃখ ঘুচাইয়া, ভারতের আশা পুরাইয়া।
তব পদে ঠাঁই যেন সবে পাই—দয়া করো দীনবন্ধু।
ওহে দীনবন্ধু, তুমি দীনজনের লও প্রণতি, নমো দীনবন্ধু।"

॥ চৌদ্দ ॥

১৯১১, সেপ্টেম্বর মাসে, অতুলপ্রসাদ তৃতীয়বার বিলেতযাত্রা করলেন। এবার তিনি রেওয়া স্টেটের কেস নিয়ে প্রিভি কাউন্সিলে চলেছেন। সংগে তাঁর হেমকুসুম ও দিলীপকুমার। সেবার বিলেতে গিয়ে অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুম কষ্ট পেয়েছিলেন, কষ্ট করেছিলেন। এখন অতুলপ্রসাদ চলেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার রূপে।

স্যার কে. জি. তখন সপরিবারে লণ্ডনে রয়েছেন। দিলীপকুমার তাঁর মার সংগে মাতামহের কাছে গিয়ে রইলেন। অবসর সময়ে অতুলপ্রসাদও কে. জি. গুপ্তের স্নেহের পরিবেশে কাটিয়ে আসেন। তাঁর ঋণ, মামারবাড়ির ঋণ অতুলপ্রসাদ কোন দিন শোধ করতে পারবেন না।

দেখতে দেখতে ফেরার সময় হয়ে এলো। অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুম ইংলণ্ডের কাছাকাছি অন্যান্য দেশগুলি ঘুরে বেড়িয়ে নিলেন।

তিন মাস পরে অতুলপ্রসাদ কৃতকার্য হয়ে লখনৌ-এ ফিরে এলেন। সেন সাহেব ও হেমকুসুমকে সাদর আহ্বান জানাতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সংগে বন্ধুবর জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় চারবাগ স্টেশনে এলেন। তিনি সস্ত্রীক অতুলপ্রসাদকে স্টেশন থেকে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন। একত্রে সকলে নৈশ-ভোজন শেষ করলেন। বিলেতের অনেক গল্প হল।

ধন্যবাদ জানিয়ে সেন-দম্পতি দিলীপকুমারসহ বিদায় নিলেন।

১৯১২ সালের ১২ই জানুয়ারী অতুলপ্রসাদ বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন। মাত্র কয়েকদিন পরেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠলো। ২৪শে জানুয়ারী তার সীমা ছাড়িয়ে গেল। তাঁদের অশান্তি দূর করতে সস্ত্রীক জীবনকৃষ্ণ এবং ব্যারিস্টার জন্ পান্নাচন্দ্র ভট্টাচার্য ও তাঁর পত্নী, অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুমের সংগে দেখা করেন। কিন্তু অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুম দুজনেই স্ব স্ব মতে অটল থাকায় তাঁদের সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারে নি।

বিলেত থেকে ফিরে আসার পর উপাসনা সভার আয়োজন যথারীতি হতে লাগল। আচার্যের কাজ পূর্বের মত অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় পরিচালনা করতে লাগলেন। সভায় যোগ দিতে পুরনো দলের সংগে নতুন নতুন কয়েকটি

মুখ দেখা দিল। এলেন অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুশরণ চৌধুরী, শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র দে, চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ বল, বিদ্যাপতি ভট্টাচার্য, সুধীরকুমার সেন, রাজনারায়ণ শুক্লা, মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি।

সৌম্যদর্শন মহেশচন্দ্র ইংলিশে এম. এ., ফার্স্ট ক্লাস, চমৎকার ইংরাজীতে কথা বলতে পারেন। স্বভাবে নম্র, ভদ্র, সেবাপরায়ণ, মেধাবী ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন। অতুলপ্রসাদ তাঁকে পাঁচশো টাকা মাইনেতে পুত্র দিলীপকুমারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন।

গৃহশিক্ষক থেকে গৃহের একজন আত্মীয়তুল্য হতে মহেশ চট্টোপাধ্যায়ের দেরি হয় নি। হেমকুসুমকে উনি বৌঠান বলে ডাকতেন এবং মায়ের মত তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। বৌঠানের আজ্ঞা তাঁর কাছে শিরোধার্য, বৌঠানের হুকুম তাঁর কাছে আনন্দ।

হেমকুসুমও তাঁকে ছোট ভায়ের মত স্নেহযত্ন করতেন। মহেশের ওপর তাঁর যত শাসন তত স্নেহও বর্ষিত হত। আবার কখনো কখনো হেমকুসুম তাঁর সঙ্গে এমন ভাবে নিজের সুখ-দুঃখের কথা বলতেন যেন নিজের ভায়ের সঙ্গে কথা বলছেন।

হেমকুসুম অসুস্থ হয়ে একেবারে শয্যাগত হলে মহেশ তাঁকে প্রাণ দিয়ে সেবা-যত্ন করে সুস্থ করে তুলেছেন ; সঙ্গ দিয়ে গল্প করে তাঁর আহত ক্ষতবিক্ষত মনে সান্ত্বনার প্রলেপ ঢেলে দিয়েছেন।

হেমকুসুম সুস্থ হয়ে উঠলে ডাক্তাররা তাঁকে প্রাতঃভ্রমণে নিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন।

অতুলপ্রসাদ বিব্রত, তাঁর সময় কম, প্রাতঃভ্রমণের কি করা যায়! তার পরই তাঁর মনে পড়ে গেল, মহেশ তো আছে। ডাক পড়ল মহেশের। তিনিও মহেশের ওপর অনেক নির্ভর করতেন।

উপেন্দ্রনাথ বল ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক ; বিজনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শম্ভুশরণ চৌধুরী ভাল সমালোচক : এবং শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তম ভাষণ লিখতে পারতেন। মহেশ চট্টোপাধ্যায়ের কথা আগেই বলেছি। অতুলপ্রসাদকে ঘিরে এই ইন্‌টেলেকচুয়াল দলটি গড়ে ওঠে। তিনি এঁদের অত্যন্ত ভালবাসতেন।

রবিবার সন্ধ্যায় সাহিত্য সভাতেও এঁরা উপস্থিত থাকতেন। সাহিত্য নিয়ে

আলোচনা হত ; বঙ্কিম-সাহিত্য নিয়ে বেশি আলোচনা হত। অতুলপ্রসাদের রচিত গান নিয়েও আলোচনা হত, অতুলপ্রসাদ তাঁদের মতামত চাইতেন, মতামতের মূল্যও তিনি দিতেন।

অনুরাগীরা একবার অনুযোগ করলেন—আপনি গান লেখেন কিন্তু যত্ন করে তা সংগ্রহ করে রাখা হয় না, টুকরো কাগজে লেখার জন্য অনেক গান হারিয়েও যায়। আমরা আপনার গানগুলি একটি খাতায় লিখে ফেলি। তারপর তা গানের বই রূপে প্রকাশ করবেন।

স্থির হল বিজনবিহারী, শম্ভুশরণ, শ্যামাচরণ ও নির্মল দে চারজনে চারটি খাতায় লিখবেন। হাতের লেখা সবচেয়ে যার ভাল দেখা যাবে তার খাতার গান বই রূপে প্রকাশ করা হবে। চারজনেই লিখলেন, কিন্তু বই রূপে আর প্রকাশ পায় নি।[১]

অতুলপ্রসাদ তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে বড় উদাসীন ছিলেন। গান লিখতেন, অন্যের মুখে নিজের গান শুনতে ভালবাসতেন। নিজেই অনুরোধ করতেন, আমার গান কিছু জান? কোন্‌টা জান? আচ্ছা একটা গেয়ে শোনাও। এইভাবে অনুরোধ করে অনুরাগীদের কাছ থেকে গান শুনতেন।

১—তিনটি খাতার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। নির্মলচন্দ্র দের মৃত্যুর পর তার লেখা খাতাটি তাঁর স্ত্রী মৃত্যুকালে অতুল-সঙ্গীত-ভক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্ন্যালকে দিয়ে যান। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন যে, এই খাতার একটি গান বাদে সব গানই প্রকাশ পেয়েছে। সেই অপ্রকাশিত গানটি হল :—

"সাধে কি মা তোরে ডাকি !
সাধের সাথী সব গিয়েছে, বিজন পথে একা রাখি।
মা তোরে আমি চাইনি বলে সবাই ফেলে গেছে চলে,
বাঁধব বলে বসে আছি হাত ভরা মোর রৈল রাখী।
আনতে সাধের হরিণ ধরে, হারিয়েছি মা যা ছিল ঘরে,
আজ সুখের মায়া সোনার কায়া
খুব আমারে দেছে ফাঁকি।
নয়নে আজ এসেছে জল, খুঁজে পাইনে এখন আঁচল,
চিরদিনের বলে যে আঁচলে, নিঃশেষিয়ে মুছব আঁখি।
তুই বুঝি মা দয়া করে, আমার সকল পুঁজি নিলি হরে,
যদি একে একে মন নিলি মা,
আমায় কেন রাখলি বাকি।"

—লেখিকা

অতুলপ্রসাদের সাহিত্য আলোচনার আসরে বাইরের অবাঙালী সাহিত্যিকরাও আসতেন। তখনকার দিনের বিখ্যাত উর্দু কবি ব্রিজনারায়ণ চাক্‌বস্ত, লেখক বিষণনারায়ণ দত্, ব্রহ্মানন্দ সিন্‌হা, হামিদআলি খাঁ এবং আরো অনেকে উপস্থিত থাকতেন। সি. ওয়াই. চিন্তামণি অতুলপ্রসাদের কাছে থাকলে তিনিও এসে বসতেন। কবি হামিদআলি খাঁর সংগে অতুলপ্রসাদের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। একদিন তিনি অতুলপ্রসাদকে 'মুসায়েরা' (উর্দু কবি সম্মেলনে স্বরচিত কবিতা পাঠ) শোনাতে নিয়ে গেলেন। পদ্ধতি ও উর্দু কবিতা দুই-ই অতুল-প্রসাদের ভাল লাগল, তাঁকে মুগ্ধ করল। তিনি এরপর মুসায়েরার খবর পেলেই সময় করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেন[২]।

॥ পনেরো ॥

সেন সাহেব এখন ভয়ানক ব্যস্ত মানুষ; উষাকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তাঁর অবসর নেই। ধনলক্ষ্মীর অযাচিত আশীর্বাদ প্রতিদিন তাঁর ভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলছে।

সোনা-ঝরা সকালে তিনি ওঠার আগেই 'সচল লক্ষ্মী' মক্কেলরা আসতে শুরু করেন। তাদের সামাল দিতে মুন্সী ব্রিজরাজ কিশোর হাঁপিয়ে ওঠেন, 'সেন সাহাব অভী আতে হ্যাঁয়, আইয়ে তশ্‌রীফ্ রাখিয়ে'।

অতুলপ্রসাদ তখন গায়ে ড্রেসিং গাউন চড়িয়ে গোলাপ-কাটা কাঁচি হাতে নিয়ে তাঁর প্রিয় গোলাপবাগানে পৌঁছে যান; এই তো একটু নিরিবিলি নিজস্ব সময়, শান্ত অবসর।

কাঁচি দিয়ে গোলাপের বাড়তি ডাল ছাঁটেন আর অমনি গুনগুন করে নতুন রচিত কোন গানের কলির সুর ভাঁজতে থাকেন। স্নানের ঘরে গিয়েও সুর ভাঁজা চলে। এমনি ভাবেই তিনি সুর রচনা, গান রচনা করেছেন। তাঁর মত ব্যস্ত ও মজলিসী মানুষের পক্ষে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে মনপ্রাণ ঢেলে গান রচনা করা বা তাতে সুরযোজনা করা সম্ভব ছিল না। কোর্টে যাবেন, বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে তিনি গলা ছেড়ে গান ধরতেন; দূর থেকে তা শোনা যেত।

২—অতুলপ্রসাদের মুসায়েরা-প্রীতির নিদর্শন 'উত্তরায়' প্রকাশিত তাঁর মুসায়েরার ওপর প্রবন্ধ।

স্নান করতে করতে সেখানেই গান বাঁধতেন, সুর দিতেন এবং গাইতেন। বেরিয়ে এসে একটা কাগজে খস খস করে তা লিখে ফেলতেন। পরে সময়মত তাকে ঘষেমেজে ঠিক করতেন।

আবার কোর্টে গিয়ে সওয়াল করার ফাঁকে যে বিরতিটুকু মাঝে মাঝে পেয়ে যেতেন তখন চলত তাঁর কাব্যচর্চা; ছেঁড়া টুকরো কাগজে লিখতেন গান। এমনি করেই তো তাঁর কত গীতিকবিতা রচিত হয়েছে, আবার টুকরো কাগজে লেখার জন্য তাঁর কত গান হারিয়ে গেছে। কোর্টে কাব্যচর্চা করার দরুন তার প্রভাব তাঁর সওয়ালে পাওয়া যেত—তা হত ইংগিতময়, ভাষা হত কবিত্বময়।

একবার রাসবিহারী ঘোষ একটি মোকদ্দমা উপলক্ষে লখনৌয়ে আসেন। অতুলপ্রসাদ সে মোকদ্দমায় রাসবিহারীর সহকারী।

সওয়াল করতে করতে রাসবিহারী যখন আইন বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন, জজসাহেব অতুলপ্রসাদকে প্রশ্ন করেন, 'Mr. Sen, have you anything to say on this point?'

অতুলপ্রসাদ কবিত্বময় ভাষায় জবাব দেন, 'I am here today a fairy creeper, My Lord, behind this large shady tree.'

শ্রবণমাত্র রাসবিহারী অতুলপ্রসাদের পিঠ চাপড়ে বলে ওঠেন, 'This like Atul my boy—the Poet, Lawyer of whom the Court should be proud of.'[১]

তাঁর জন্য শুধু কোর্ট নয়, সারা লখনৌ শহর গর্বিত। কিন্তু অতুলপ্রসাদ নিজের গুরুত্ব, সম্মান, প্রতিপত্তির জন্য একটুও ব্যস্ত নন। তাঁর ব্যস্ততা নিজের গান অন্যকে শোনানো, অন্যের মুখ থেকে নিজের গান শোনা।

সন্ধ্যেবেলার আসরে তিনি তাঁর রচিত গীতিকবিতা পড়ে শোনান, সুর দিয়ে অন্যকে শিখিয়ে দেন, তা নিয়ে চর্চা করেন। আবার কেউ লখনৌ এলে ও গান শুনতে চাইলে তাঁর সম্মানে গানের আসরের আয়োজন করেন।

রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ ঘোষালের বন্ধু সংগীতপ্রেমী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লখনৌয়ে এলেন। বন্ধুর বাড়ি অতিথি তিনি। রায় বাহাদুরকে বললেন, গানের দেশ লখনৌয়ে এলুম, গান শোনাবে না? এক-আধজন নাম করা ওস্তাদের গান শোনাও ভাই।

রায় বাহাদুর অতুলপ্রসাদের শরণ নিলেন। গান-পাগল অতুলপ্রসাদের

১—সত্যকুমার মুখোপাধ্যায়—ডায়েরী।

বাড়িতে গানবাজনা লেগেই আছে আর সেই উপলক্ষে ওস্তাদজীর পায়ের ধুলো মাঝে মাঝে পড়ে।

কেউ গান শুনতে চান, গানের সমঝদার এ খবরে অতুলপ্রসাদ আনন্দে যেন উজিয়ে ওঠেন। ব্যবস্থাও করালেন।

সন্ধ্যেবেলায় রায় বাহাদুর বন্ধুসহ এলেন। গানের আসর তৈরী। ওস্তাদ মুন্নে খাঁ লখনৌইয়া আতরের গন্ধ ছড়িয়ে তানপুরার তারে আঙুলের মৃদু আঘাতে যেন কলগুঞ্জন তুললেন।

গান হল রাত বারোটা পর্যন্ত। রায় বাহাদুর-বন্ধু মুগ্ধ, সন্তুষ্ট।

কয়েক বছর পর সরলা দেবী চৌধুরানী লখনৌয়ে এলেন। অতুলপ্রসাদ তাঁকে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে নিয়ে এলেন। তাঁর সম্মানে টি-পার্টি'র ব্যবস্থা করলেন।

পার্টি'র পর সরলা দেবীকে 'বন্দেমাতরম্' গানটি গাইবার জন্য অনুরোধ করা হল। তাঁর আগমনে অতুলপ্রসাদের গৃহপ্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য, সবাই সরলা দেবীর মুখে ঐ গানটি শুনতে চান।

সরলা দেবী তাঁর অনুপম কণ্ঠে জাতীয় মন্ত্রসংগীত বন্দেমাতরম্ গান করলেন। মুগ্ধ শ্রোতারা সেই সংগীত-তরঙ্গে অবগাহন করলেন। সংগীতপ্রেমী অতুলপ্রসাদ সরলা দেবীর কণ্ঠে জাতীয় সংগীত শুনে আনন্দিত।

গান শেষ হলে অতুলপ্রসাদ তাঁর সুললিত ভাষায় গায়িকার অজস্র প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করলেন।[২]

সে-বছর বোধ হয় ১৯১৫ সাল; লর্ড সিংহ (তখন স্যার) লখনৌ এসে অতুলপ্রসাদের অতিথি হলেন। পরে অতিথি তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, নবাবের দেশে এসে নবাবী ইমারত দেখা হল, গোলাপী আতরের খুসবুর গন্ধে প্রাণ মাতোয়ারা হল। এরপর ঠুংরী দাদ্‌রা শোনা হবে না?

অতুলপ্রসাদের কাছে এসে এ ইচ্ছা কখনো অপূর্ণ থাকে! সেইদিনই দ্রুত ব্যবস্থা হয়ে গেল।

সন্ধ্যেবেলায় একে একে গুণীরা সব আসতে লাগলেন—বিখ্যাত হার-মোনিয়মবাদক ঠাকুর নবাব আলী, হেমকুসুমের সেতারশিক্ষক বরকৎ আলি, বিখ্যাত গায়ক মুন্নে খাঁ, ওস্তাদ আহম্মদ খলীফ খাঁ, সংগীতজ্ঞ দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং আরো অনেকে।

২—সত্যকুমার মুখোপাধ্যায়—ডায়েরী।

লম্বা প্রোগ্রাম, অপূর্ব গুণী সমাগম, উচ্চকোটির গানবাজনা শুনে অতিথি পরিতুষ্ট। গান শোনাবার এমন এক সুযোগ পেয়ে যজ্ঞকর্তাও তৃপ্তচিত্ত, শ্রোতারা খুশিতে উচ্ছল।

গানের পর ভুরিভোজনের আয়োজন থাকত। প্রয়োজনে ড্রিংকেরও ব্যবস্থা থাকত, কিন্তু অতুলপ্রসাদের নিজের পান করার অভ্যাস ছিল না। ডিনার-পার্টি'তে গেলে কায়দা অনুযায়ী ড্রিংক করতে বাধ্য হতেন। কিন্তু হাজার হাজার টাকা উপায় করলেও ইয়ারবক্সী নিয়ে ঢালাও ড্রিংক তিনি কখনো করেন নি। সিগারেটও তিনি খেতেন না, অতিথি এলে সিগারেট ধরিয়ে তাঁকে সংগ দিতে দু' একবার মুখে ছুঁয়ে ফেলে দিতেন।

অতুলপ্রসাদ স্বভাবে মজলিসী ছিলেন, মানুষের সংগ, আড্ডা তাঁর খুব ভাল লাগত।

কিন্তু তবু তিনি নিঃসংগ ছিলেন। যখন চুপচাপ বসে থাকতেন মনে হত তিনি যেন এ জগতের মানুষ নন। আবার প্রকৃতির সংগও তাঁর খুব প্রিয় ছিল। চাঁদনি রাতে অবসর পেলেই নিজের ভিক্টোরিয়া ফিটনে চড়ে গোমতী নদীর ধারে চলে যেতেন।

জ্যোৎস্নালোকে নদীর কিনারায় বসে চন্দ্রচূর্ণ গায়ে মেখে গোমতীর বংকিম ভংগিতে সুদূরের উদ্দেশে ছুটে যাওয়া দেখতেন; দেখতেন মাথায় আলোর পাগড়ি বেঁধে গাছেরা কেমন হেলেদুলে তাকে সমর্থন জানাচ্ছে, আর আলোর পাল তুলে মেঘেরা এগিয়ে গিয়ে তাকে যেন পথের নির্দেশ দিচ্ছে।

কবি-কন্ঠে তখন সুরের খেলা, গানের কথা ভিড় করে গুঞ্জন তুলত।

॥ ষোলো ॥

উদারতার প্রতিমূর্তি অতুলপ্রসাদ দুহাতে দান করতেন। যার যেমন প্রয়োজন তাকে সেই ভাবে সাহায্য করতেন। সাধ্যের অতীত করতেন। কেউ তাঁর কাছে এলে তিনি তাকে নিরাশ করতে পারতেন না এটি ছিল তাঁর চরিত্রের মহানুভবতা। তাঁর বাংলোয় গিয়ে কেউ শূন্য হাতে বা হতাশ মনে ফিরে এসেছে এ অভিযোগ কেউ করতে পারবে না। তাঁর কাছে যেমন প্রার্থীর শেষ ছিল না তেমনি লখনৌয়ে এমন কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না যা তাঁর দানে পুষ্ট,

উপকৃত হয় নি। প্রয়োজনে তিনি অযাচিত, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েও দান করেছেন।

একবার শুনলেন নয়া-গাঁও অঞ্চলে তাঁর পরিচিত একজন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কিন্তু পয়সার অভাবে তাঁর চিকিৎসা হচ্ছে না।

অতুলপ্রসাদ তাঁকে দেখতে গেলেন; রোগীর বিছানায় বসে তাঁর খোঁজখবর নিলেন এবং সবার অলক্ষ্যে রোগীর বালিশের নিচেয় এক গোছা নোট গুঁজে দিয়ে চলে এলেন।

তাঁর বিরাট সংখ্যক কৃপাপ্রার্থী'দের মধ্যে অনেক অনাথ বিধবা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল সরোজিনী। তাঁর মুখে দুঃখিনী বিধবাদের দুঃখের কাহিনী শুনে তিনি খুবই বিচলিত হন এবং কাশীতে একটি বিধবা-আশ্রম তৈরী করে দেন। এই আশ্রমে তাঁর দয়ায় বহু নিরাশ্রয় বিধবারা আশ্রয় পায়।

অবস্থা সচ্ছল হবার পর অতুলপ্রসাদ গ্রীষ্মাবকাশে পাহাড়ে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় গিয়ে কিছু দিন কাটিয়ে আসতেন, দীর্ঘদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর পশ্চিমের দাবদাহের দৌলতে ঐ কদিন কোর্ট-কাছারির আঙিনা থেকে ছুটি পেতেন। প্রকৃতির পূজারী কবি কিছুদিন প্রকৃতির সঙ্গলাভ করে সরস হয়ে উঠতেন, নতুন নতুন রসদও সংগ্রহ হয়ে যেত অথবা প্রকৃতির রঙিন স্পর্শে কবি-মন আনন্দে গুনগুনিয়ে উঠত :—

"সন্ধ্যাতারা জ্বলিছে গগনে—
আয় আয় চাঁদিয়া!
আন গো সজনী, মধুর রজনী
সোনার তরণী বাহিয়া"...।

নয়তো—

"প্রভাতকালে তুলিব ফুল,
খুঁজিব ফুল্ল তরুর মূল।
তুলিব বেলী, যূথী, চামেলি—
সৌরভে হবে মন আকুল"...।

প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে অতুলপ্রসাদ তো কত গানই রচনা করেছেন। কিন্তু দুঃখীর বন্ধু অতুলপ্রসাদ সব সময়ে কাব্য রসাস্বাদনে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে পারতেন না। মানুষের দুঃখ তাঁকে ব্যথিত করত। গরীব ও মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারদের প্রায়ই তাঁর শৈলাবাসে নিমন্ত্রণ করে স্বহস্তে পরিবেশন করে

খাওয়াতেন এবং তাঁদের সংগীতে তুষ্ট করতেন। সমশ্রেণী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁর টান ছিল গরীব ভাইবোনদের ওপর। তিনি বলতেন: "এঁদের আনন্দ পাবার সুযোগ এত কম, কাজেই এঁদের মুখে হাসি দেখতে এত ভাল লাগে"।[১]

কত দুঃস্থ ছাত্র যে অতুলপ্রসাদের সাহায্যে পড়াশোনা করেছে এবং জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সংখ্যা বলা সমস্যা। একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির মতে অন্তত পঞ্চাশজন দরিদ্র ছাত্রকে অতুলপ্রসাদ নিজের অর্থে লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। পড়ার ব্যাপারে তাদের সবরকম খরচ হাসি মুখে বহন করেছেন।

আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের জন্য তাঁর হৃদয় সদা উন্মুখ ছিল। এত ব্যস্ততার মধ্যেও সেন সাহেব তাঁর ভৃত্যপরিজনদের অভাব অভিযোগের খবর রাখতেন এবং তাঁদের সন্তানসম দেখতেন।

সবাই যে অর্থের জন্যই আসতেন তা নয়, পারিবারিক সমস্যা নিয়েও অনেকে তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হতেন। 'সেন সাহেব,' 'ভাই সাহেব' ব্যতীত তাঁদের সমস্যার সমাধান কে আর করবে। "লখনৌয়ে দুস্থ নবাব বংশ, অভিজাত বংশ বহু। তাঁদের কেহ পদব্রজে, কেহ মোটরে সকাল-সন্ধ্যায় যাতায়াত করেন—মামলা-মোকদ্দমার জন্য নয়, তাঁদের ভ্রাতৃবিরোধ, গৃহবিবাদ প্রভৃতি মিটিয়ে দেবার জন্যে। তাঁর কথায় সব মিটে যেত"।[২] অতুলপ্রসাদের বিচারবুদ্ধি, নিরপেক্ষতার ওপর সকলের এমনিই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল।

অতুলপ্রসাদের মমতাপূর্ণ আন্তরিক ব্যবহারের বুঝি তুলনা নেই। অরুণপ্রকাশের বাবা বেনারসে মারা গেলেন। দাহকার্য শেষ করে ভায়েদের নিয়ে অরুণপ্রকাশ দুপুরে লখনৌ এলেন। তাঁদের বাড়িতে তখন বন্ধুবান্ধব পরিচিত ব্যক্তি সবাই উপস্থিত রয়েছেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। সে জনারণ্যে নেই শুধু অতুলপ্রসাদ। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ফিসফাস করে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে: 'সেন সাহেব আসেন নি!' 'ভাইদাদা কেন এলেন না!' সবাই আশ্চর্য। অরুণপ্রকাশ তাঁর খুব প্রিয়পাত্র। অরুণপ্রকাশের মনে হল যেন এ এক অসম্ভব ব্যাপার।

সন্ধ্যের আগে সবাই বিদায় নিলেন। তারপর সন্ধ্যেরাত গাঢ় হল। অরুণপ্রকাশ জানলার ধারে বসে আকাশপাতাল ভাবছেন।

১—সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—"অতুলপ্রসাদ সেন"।

২—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—তস্মৈং বঙ্গ দীয়তে—'উত্তরা'

হঠাৎ কানে এলো ফিটনগাড়ির আওয়াজ। তিনি বুঝলেন, ছুটে বেরিয়ে এলেন। দালানের সামনে রোয়াকে যেতেই দেখলেন গায়ে অন্ধকার মেখে দাঁড়িয়ে আছেন অতুলপ্রসাদ ; ও মানুষকে যে একবার দেখেছে তার আর ভুল হয় না। সঙ্গে হেমকুসুম।

অরুণপ্রকাশকে ধরে রোয়াকের ওপর বসিয়ে তাঁর পাশে মাটিতে বসে পড়লেন অতুলপ্রসাদ। তাঁর পিঠে সান্ত্বনার হাত রাখলেন।

অরুণপ্রকাশের অভিমান হয়েছিল। কিন্তু স্নেহের উষ্ণ স্পর্শে তাঁর চোখে ধারা নামল। তাঁর সঙ্গে অঝোরে কাঁদলেন অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুম। অতুলপ্রসাদ বললেন, অরুণ, আমিও অল্পবয়সে আমার বাবাকে হারিয়েছি। তোমার দুঃখ আমি বুঝি‥ ···। যাক, তুমি কিছু ভেবো না, আমি তো আছি। তোমার যা দরকার হয় আমাকে বলবে। তোমার কোন ভয় নেই, তুমি একা নও জেনো।

অরুণপ্রকাশ এখন বুঝলেন যে তাঁর জন্য অতুলপ্রসাদের দুঃখ-ভাবনা কত গভীর, অকৃত্রিম, তাই সবার শেষে রাতের আঁধারে নিরালায় তাঁকে সান্ত্বনা দিতে এসেছেন।

এমনি তাঁর সহৃদয় ব্যবহারের, দানের, উপকারের কত কাহিনী আছে। মানুষের প্রতি প্রেমপ্রীতি ছিল তাঁর সীমাহীন ও দানের কোন হিসেব ছিল না।

লাহোরে একটি কেসের জন্য গিয়ে প্রতিদিন তিনি এক হাজার টাকা করে উপায় করতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা পাঁচশো টাকার জামাকাপড়, চাদর, কম্বল ইত্যাদি কিনে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করতেন।

একদিন হেমন্তকুমার এ নিয়ে বিনীত মন্তব্য করলে জবাব দিয়েছিলেন, যে-দেশ থেকে আমি দু'হাতে অর্থ উপার্জন করছি সে-দেশের লোকেদের জন্য কিছু ব্যয় না করলে কি হয়। যে কদিন লাহোরে ছিলেন এইভাবে বিতরণ-পর্ব চলেছিল।

নলিনী হালদারকে প্রায়ই কথায় কথায় বলতেন, নলিনীবাবু, ভগবান করুন আমি যেন এইভাবে দিতে দিতেই যাই।

অতুলপ্রসাদের মত হেমকুসুমও অতি সহৃদয়া ছিলেন। তাঁরও যথেষ্ট দানধ্যান ছিল। সেই দিনে লখনৌয়ে এমন কোন মহিলা-সংস্থা ছিল না যা তাঁর দানে উপকৃত হয়নি। দীন-দুঃখীদের তিনি খাবার-কাপড়-পয়সা দিয়ে সর্বদা সাহায্য করতেন। তাঁর সংসারে ভৃত্যদের খবরাখবর তিনি তো করতেনই,

তাদের পরিবারবর্গের জন্যও তাঁর উদারতা ও উদ্বেগের সীমা ছিল না। খানসামা বা বাবুর্চির বৌয়ের বাচ্চা হবে হেমকুসুম উৎকণ্ঠায় অস্থির। সময়মত গর্ভবতীকে নিজের গাড়ি করে হাঁসপাতালে পাঠানো, তাদের খবরাখবর নেওয়া, তাদের দেখতে যাওয়া, নবজাতকের কাপড়জামার ব্যবস্থা সব কিছু তিনি আগ্রহের সঙ্গে করতেন। তাই তাঁর দুঃখে ওদের মধ্যে দুঃখ ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না।

অতুলপ্রসাদের কাছে প্রার্থী এলে তিনি দ্বিরুক্তি না করে, বিরক্ত না হয়ে সাহায্য করতেন। পকেটে যা থাকত উজাড় করে দিতেন, নয়তো মুন্সীর ওপর হুকুম হত প্রার্থনামত অর্থ দেবার।

কিন্তু অতুলপ্রসাদ দান করে নিশ্চিন্ত হতে বা কর্তব্য শেষ হল ভাবতে পারতেন না। তিনি বরং চেষ্টা করতেন কিভাবে প্রার্থীদের স্বাবলম্বী করা যায়।

এই উদ্দেশ্য থেকে গড়ে ওঠে 'গোখলে স্টুডেণ্ট সোসাইটি'। অতুলপ্রসাদের পরামর্শে ও উৎসাহে এবং প্রোফেসার উপেন্দ্রনাথ বলের চেষ্টায় ক্যানিং কলেজের বোর্ডারদের নিয়ে ঐ সংস্থাটি গড়ে ওঠে। সংস্থাটির জন্মকাল ১৯১৩-১৪ সালে।

অতুলপ্রসাদ এই সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সভ্যরা ছিলেন পণ্ডিত রাজনারায়ণ শুক্লা[৩], পণ্ডিত শ্রীনারায়ণ মিশ্র, সুরেন্দ্রবিক্রম সিং, কৃপাশংকর নিগম, এস. এন. রায়, হরগোবিন্দ দয়াল শ্রীবাস্তব, বসন্তকুমার ঘোষাল ইত্যাদি।

এই সংস্থার প্রধান কাজ ছিল নিরক্ষরদের অক্ষরজ্ঞান দেওয়া ও গরীব দুস্থ ছাত্রদের সাহায্য দিয়ে পড়ানো। অতুলপ্রসাদের প্রেরণায় এই সব ছাত্রদের তখন এতই উৎসাহ যে বোর্ডিংয়ের চাকর, ঠাকুর, মালি সবাইকে বই দিয়ে ধরে ধরে

৩—রাজনারায়ণ শুক্লা এই সংস্থা উপলক্ষে অতুলপ্রসাদের সংস্পর্শে আসেন। অতুলপ্রসাদের উপাসনা সভায় নিয়মিত যেতেন। ইনি পরিষ্কার বাংলা বলতে পারেন। অতুলপ্রসাদ এঁকে "কয়েকটি গান"-এর একটি বই উপহার দিয়েছিলেন। বললেন, "অতুলপ্রসাদকে ঘিরে তখন সব কিছু গড়ে উঠত। তাঁকে বাদ দিয়ে কোন কাজ, সভা, জলসা ভাবাই যেত না। অতুলপ্রসাদ অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং সকলের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন।"

হরগোবিন্দদয়াল শ্রীবাস্তব বলেন, "Any social activity without A. P. Sen was not possible."

পড়াতেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যের পর কুইন্স্ স্কুলে (এখন কলেজ) গিয়ে নিরক্ষরদেরও পড়াতে হত।

একটি আলোচনা-চক্র এই সংস্থার অধীনে গঠিত হয়েছিল। সেখানে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা তর্কবিতর্ক হত, তার মধ্যে তৎকালীন পরিস্থিতি ও উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার বিষয় থাকত।

১৯১৫ সালে লখনৌয়ে ভয়াবহ বন্যা হয়, পুরনো বাড়ি, কুঁড়েঘর ইত্যাদি বন্যায় ভেসে যায়। কোমলপ্রাণ অতুলপ্রসাদ সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁর নির্দেশনায় ছাত্ররা সাহায্যের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যাদের বাড়িঘর পড়ে গেছে তাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনার কাজে ছাত্ররা দিনরাত ব্যাপৃত থাকেন। ঘরে ঘরে গিয়ে কাপড়-জামা খাবার সংগ্রহ করেন এবং সে-সব গৃহহারাদের হাতে পোঁছে দেন। এ-সময়ে অতুলপ্রসাদের দিনেরাতে বিশ্রাম ছিল না।

সংঘ, সোসাইটি, ক্লাব স্থাপন করতে পয়সা লাগে। অতুলপ্রসাদ নিজে তো টাকা দিতেনই, প্রয়োজন হলে টাকা তুলেও দিতেন। ছাত্রদের ওপর ঢালাও হুকুম ছিল যে টাকাপয়সার দরকার হলেই তারা যেন তাঁর কাছে চলে আসে।

অতুলপ্রসাদ স্বভাবে অত্যন্ত শান্ত, সংযত, মার্জিত ও রুচিসম্পন্ন ছিলেন। কারুর সংগে তাঁর শত্রুভাব ছিল না।

কিন্তু এমন শান্ত, সংযত, মার্জিত ব্যক্তিও একদিন প্রবল রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ; কিন্তু সে শুধু একবারই।

অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুমের মাঝে কলহের দরুন পরিস্থিতি ঘনঘোর হয়ে ওঠে, একে অপরকে এজন্য দোষারোপ করতে থাকেন, অনুরাগী এবং বন্ধুবান্ধবদের সামনেই এমন ঘটনা ঘটে যায়। দুজনের প্রকৃতি সরল, উদার হওয়ায় তাঁরা তাঁদের স্বভাবকে অন্যের সামনে চিনির আস্তরণ দিয়ে ঢেকে রাখতে পারতেন না। ফলে তাঁদের পারিবারিক জটিলতার কথা অন্তরংগ বন্ধুবান্ধবরা জানতেন।

এঁদের মধ্যে একজন বন্ধু লখনৌয়ের গণ্যমান্য বাঙালীদের ঘরে ঘরে গিয়ে বলতে লাগলেন যে, অতুলপ্রসাদের ওপর চাপ দেওয়া হোক তিনি যেন তাঁর পারিবারিক ঝগড়া মিটিয়ে ফেলেন।

যা একান্ত ব্যক্তিগত এবং যা শুধু অন্তরংগদের জানাজানির মধ্যে সীমাবদ্ধ, তা একেবারে সাধারণের আলোচ্য ও বিচারের ব্যাপার হোক এ সহ্য করা, মেনে

নেওয়া অতুলপ্রসাদের মত লখনৌয়ের মুকুটহীন রাজার পক্ষে একেবারেই অকল্পনীয়।

বন্ধুর প্রচারকার্য তাঁর কানে পৌঁছুতে দেরি হল না। তিনি সে কারণে রাগে, অপমানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন। ফলে একদিন নিজের আবাসে বন্ধুটিকে দর্শনমাত্র তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এবং বন্ধুটি তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে নিগৃহীত হলেন।[৪]

॥ সতেরো ॥

অতুলপ্রসাদ লখনৌয়ে তখন নবাব, তালুকদার থেকে শুরু করে সাধারণ ব্যক্তি, দুস্থ মানুষেরও পরিচিত, যেন বড় কাছের মানুষ। সকলের জন্য তাঁর কল্যাণ-চিন্তা, প্রতিটি সংস্থার জন্য তাঁর উদার ভাবনা; আবার লখনৌ শহরের উন্নতির ব্যাপারে তিনি একজন নীরব কর্মী। বাবু গংগাপ্রসাদের সংগে মিলিত হয়ে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। এই বিশ্বস্ত কর্মীকে শহরবাসী এবার তাই সম্মানে ভূষিত করতে উৎসুক হলেন।

লখনৌ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের নির্বাচন। তখনো পর্যন্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে শুধু রাজপুরুষরাই নির্বাচিত হতেন। ভারতীয়রা শুধু ভাইস-চেয়ারম্যান হতে পারতেন। একজন চেয়ারম্যানের অধীনে তখন পাঁচজন ভাইস-চেয়ারম্যান থাকতেন। সে সময়ে বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান হওয়া খুব সহজ ব্যাপার ছিল না এবং দক্ষ ব্যক্তিরাই শুধু হতে পারতেন।

[illegible] সাল[১], লখনৌ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের পাঁচজন ভাইস-চেয়ারম্যানের একজন হলেন সকলের প্রিয় সেন সাহেব। অন্যান্যরা ছিলেন তাঁরই সহকর্মী—গংগাপ্রসাদ ভার্মা, বিশেশ্বরনাথ শ্রীবাস্তব, গোকরণনাথ মিশ্র ও অপর একজন।

৪—কোন প্রত্যক্ষদর্শী আমাকে এই ঘটনা ব্যক্তিগতভাবে বলেছেন। তিনি তাঁর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, তাই তা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না।—লেখিকা।

১—ঠিক কোন বছরে [illegible] অতুলপ্রসাদ লখনৌ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। জানা যায়নি। লখনৌ মহাপালিকার পুরনো রেকর্ড কিছুই নেই—লেখিকা।

নলিনীবাবুর মারফৎ হেমকুসুম আগেই সুখবর পেয়ে গিয়েছেন। 'হ্যাঁ, আজ সবাইকে মিষ্টিমুখ করানো হবে।' হাসিমুখে জানালেন হেমকুসুম।

নির্বাচনে জয়ী হবার পর অতুলপ্রসাদের অনুরাগীরা তাঁকে প্রচুর পুষ্প-মাল্যে ভূষিত করে জয়ধ্বনি করতে করতে বোর্ডের অফিস থেকে মিছিল করে তাঁর বাংলোয় নিয়ে এলেন। এবার মিষ্টি খাওয়ার পালা। সেন সাহেবের বাড়িতে তো রোজই মিষ্টি খাওয়া যায়। আজ আনন্দের দিনে যে কেউ এলেন সবাইকে লখনৌর লাড্ডু বিতরণ করা হল।

আনন্দ-উৎসব শেষ হল। এবার কাজের পালা। কাজের মানুষ অতুল-প্রসাদ এবার কাজের জন্য তৈরী হলেন; প্রিয় শহর লখনৌকে সুন্দর করে তোলার কাজ এখনো অনেক বাকি।

অন্যান্য ভাইস-চেয়ারম্যানরা নিষ্ঠাবান কর্মী সেন সাহেবকে এগিয়ে দিয়ে নিজেরা তাঁর সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

অতুলপ্রসাদ আমিনাবাদকে নবরূপে রূপায়িত করলেন, সেই হল আজকের আমিনাবাদ। প্ল্যান করে ভিক্টোরিয়া পার্ক ও অন্যান্য পার্ক তৈরী হল। নবাবের আমলে লখনৌকে বলা হত "উদ্যান নগরী"। এখন তার ইংরাজীকরণ করে বলা হল "সিটি অফ্ পার্ক্স্"। সেগুলি পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত হল। নতুন নতুন সব রাস্তাঘাট তৈরী করা হল। সেন সাহেবের জয়জয়কার পড়ে গেল।

অতুলপ্রসাদ লখনৌবাসীর দ্বারা সম্মানীত হলেন। আবার দেশবরেণ্য ব্যক্তিরা একে একে লখনৌয়ে এসে অতুলপ্রসাদের অতিথি হয়ে তাঁকে সম্মানীত করলেন।

রাজনীতিতে তিনি নরমপন্থী হলেও মতবাদে উদার ছিলেন; স্বাধীনচেতাও ছিলেন, যা ভাল বুঝতেন স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করতে দ্বিধা করতেন না, তবে সর্বদা নিরপেক্ষনীতি অনুসরণ করে চলতেন। ফলে একদিকে সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, তেজবাহাদুর সপ্রু, সি. ওয়াই. চিন্তামণি যেমন তাঁর বন্ধু ছিলেন তেমনি লালা লাজপৎ রায়, মহম্মদ আলী, সৌকৎ আলী, মদনমোহন মালব্য, সরোজিনী নাইডু, বিপিনচন্দ্র পালের সংগেও তাঁর সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

মহাত্মা গান্ধীকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। লোকমান্য তিলক বন্দী হলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন এবং সেই উপলক্ষে একটি গান রচনা করেন—

"কঠিন শাসনে করো মা, শাসিত।
আমরা দয়ার তব নহি অধিকারী।"...

শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল এসে অতুলপ্রসাদের অতিথি হয়েছেন। বিপিনচন্দ্র পাল বৈষ্ণব ধর্মের ওপর দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন। অতুলপ্রসাদের ব্যবস্থায় বারদুয়ারীতে শিক্ষিত সমাজের তা শোনার সুযোগ হয়েছিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস লখনৌ এসে তাঁর অতিথি হন। একে একে এসেছেন মহাত্মা গান্ধী, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, সরোজিনী নাইডু, লর্ড সিংহ প্রভৃতি বহু দেশবরেণ্য নেতা।

মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে এসে এবং তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে অতুলপ্রসাদ খুবই মুগ্ধ হন। তাঁর কাছে গান্ধীজী একজন আদর্শ চরিত্রের পুরুষ ছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী তাঁর অহিংস ও সত্যাগ্রহ মন্ত্রে তখন বিজয়ী। স্বদেশেও তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে গান্ধীজী ভারতে আসেন। ঐ যুদ্ধে ইংরাজদের সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি সারা ভারতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। সেই উপলক্ষে লখনৌয়ে তিনি এলে অতুলপ্রসাদ সম্মানের সঙ্গে তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন।

অতুল-ভবনে থাকাকালে গান্ধীজী অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেবাপরায়ণা হেম-কুসুম গান্ধীজীর সেবার ভার নিজের হাতে তুলে নেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গান্ধীজীর সেবা করে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন।

হেমকুসুমের সেবা-যত্নে ও ব্যবহারে গান্ধীজী অভিভূত হন এবং মন্তব্য করেন, যাঁর ঘরে এমন গুণবতী স্ত্রী তাঁর দুঃখ বলে কিছু থাকতে পারে না।

॥ আঠারো ॥

১৯১৩ সাল, রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজের সম্মানে ভূষিত হলেন। বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর এই অভাবনীয় বিশ্ববিজয়ে ভারতবাসী বিস্মিত, গর্বিত। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে যেন এবার থেকে নতুন ভাবে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রভক্ত অতুলপ্রসাদের নিকট তাঁর নবমূল্যায়নের প্রয়োজন ছিল না। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বকবি' সম্মানলাভের অনেক আগে অতুলপ্রসাদ তাঁর কৈশোর জীবনেই কবির বিরাটত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ভক্তরূপে, শিষ্যরূপে আকুল আগ্রহে বার বার তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজয়ে অতুলপ্রসাদ জয়ের আনন্দে গর্বিত, উৎফুল্ল কিন্তু বিস্মিত নন।

বিশ্বকবির বিশ্ববরণীয় দিনটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে তিনি গান লিখতে বসলেন। রচিত হল বাংলা ভাষায় অবিস্মরণীয় অপূর্ব একটি গান, অতুলপ্রসাদের শ্রেষ্ঠতম গানও বলা যায়—

"মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালোবাসা"।······
"বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আনল মালা জগৎ জিনে!—
গরব কোথায় রাখি গো?—
তোমার চরণ-তীর্থে আজি
জগৎ করে যাওয়া-আসা"।······

এমন প্রাণ-জাগানো মন-মাতানো গান বোধ হয় আর রচিত হয়নি। কী সুন্দর সরল ভাষায় মিষ্টি সুরের গান, যা প্রকাশ হবার পরেই হাটে-মাঠে, শহরে, সভায় শিশু, কিশোর, যুবার মুখে মুখে ফিরেছে; তাদের উৎসাহিত, উত্তেজিত এবং আত্মসচেতন করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের নিকট থেকে অতুলপ্রসাদের কাছে নিমন্ত্রণ-বার্তা এলো রামগড় পাহাড়ে বেড়াতে যাবার।

"রবিবাবু অতুলের সংগলাভ করিতে সর্বদাই উৎসুক থাকিতেন। কবি একবার গ্রীষ্মের সময় অতুলকে লিখিয়াছিলেন, তাহার ভাবার্থ আমার স্মরণ আছে যে 'গ্রীষ্মের আতিশয্যে সকলেই মেঘের জন্য লালায়িত। আমিও ভাবিতেছি অতুল কবে আসিয়া আমাদিগকে স্নিগ্ধ করিবেন'।"[১]

১—৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী

রবীন্দ্রনাথ এবং অতুলপ্রসাদের পরিচয় দীর্ঘদিনের—সেই ১৮৯৫-৯৬ সালের। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কনিষ্ঠ সহধর্মীটিকে বড় ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন।

বাংলার রবির প্রতিভার দীপ্ত কিরণছটায় বাংলাসাহিত্য তখন আলোকিত, উদ্ভাসিত। অতুলপ্রসাদ তখনই গীতকার রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত, সুপরিচিত; আপনার প্রতিভায় ব্যক্তিত্বে স্বতন্ত্র, সমুজ্জ্বল। কিন্তু তিনিই আবার নম্র, নিরহংকার, বিনয়ের প্রতিমূর্তি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। তাই তাঁর কাছ থেকে যখন নিমন্ত্রণলিপি পেলেন, অতুলপ্রসাদের আনন্দের সীমা রইল না।

রবীন্দ্রনাথ রামগড় পাহাড়ে প্রায় তিনশো বিঘা জমির ওপর একটি বাড়ি কিনেছিলেন। বাড়ির নাম দিয়েছিলেন "হৈমন্তী"।

১৯১৪ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে রওনা হয়ে তীর্থপরিক্রমা ও হিমালয় ভ্রমণ সেরে রামগড়ে এলেন।

সেই সময় অতুলপ্রসাদ কবি-সংগ-সুখের স্বপ্নে বিভোর হয়ে শৈলবাস রামগড়ে পাড়ি দিলেন।

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ রামগড়ের সে দশদিনের স্মৃতির একটি পূর্ণাংগ ছবির বর্ণনা দিয়ে বলেছেন :—

"বদরিকাশ্রম তীর্থদর্শন করে যখন রামগড়ে এলুম দেখি "হৈমন্তী" বাড়ী ভর্তি। বাবার সংগে অনেক লোকজন। আমাদের পরিবারের সকলে তো আছেনই, তা ছাড়া লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছেন কবি অতুলপ্রসাদ সেন ও পরে এলেন সি. এফ. এনড্রুজ। বাড়ী জমজমাট, দিনেন্দ্রের আগমনে আরো জমে উঠ্‌লো। গল্পগুজব, হাসিগানের বিরাম রইলো না।······সব চেয়ে জমিয়ে দিল গান। গায়কের ত্র্যহস্পর্শ—একই জায়গায় বাবা, অতুলপ্রসাদ ও দিনেন্দ্রনাথ। "হৈমন্তীতে" গানের ফোয়ারা ছুটলো। বাবা অন্য কাজ ছেড়ে প্রতিদিন নতুন গান রচনা করে তাতে সুর দিতে লাগলেন। দিনেন্দ্র কাছে রয়েছেন—বাবা নির্ভয়।······

"······নতুন কী গান বাঁধা হয়েছে শোনবার জন্য সকলে উৎসুক হয়ে বসে থাকি। অতুলবাবুর আগ্রহ সবচেয়ে বেশী। তিনি বাবাকে অনুরোধ করলে বাবা দিনেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলেন, "তোকে কাল যেটা শেখালুম, তুই-ই গেয়ে দে না! আমার কি ছাই মনে আছে"? দিনেন্দ্র গান ধরেন, একটা শেষ হলে আরেকটা, অতুলপ্রসাদের তবু তৃষ্ণা মেটে না। নতুন গান শেষ হলে পুরানো

গান থেকে গাইতে বলেন, তাঁর যেগুলি বিশেষ ভাল লাগে। বাবা তখন অতুলপ্রসাদকে বলেন, তোমার আশ তো মিটল, এখন আমাদের আশ মেটাও, আমরা এবার তোমার গান শুনি। অতুলপ্রসাদ তখন তাঁর মিষ্টি গলায় গানের পর গান গেয়ে যান। বনমালী যতক্ষণ না 'খেতে যে হবে' বলে সভা ভেঙে দেয় ততক্ষণ গান আর বন্ধ হয় না।

মনে পড়ে অতুলপ্রসাদ একদিন বাবাকে অনুরোধ করলেন—"আপনি কাল যে সুরটী গুনগুন করছিলেন আপনার ঘরে, আমার বড় ভালো লাগছিল শুনতে, গান বাঁধা নিশ্চয়ই হয়ে গেছে, ঐ গানটি আমায় শুনিয়ে দিন"। বাবা বল্লেন —"সেটা যে দিনুকে এখনো শেখান হয় নি, তাহলে আমাকেই গাইতে হয়" বলে বাবা গাইলেন—"এই লভিনু সংগ তব সুন্দর হে সুন্দর।"

সকালবেলা ঘাসের ওপর তখনো শিশির লেগে আছে। পূর্বদিকের পাহাড়ের উপর থেকে সূর্যের আলো এসে পড়ে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলছে পাতায় পাতায়। প্রকৃতির সেই প্রফুল্লতা, গানের কথা, গানের সুর সব মিলে একটি অপরূপ রসসৃষ্টি করল। শুনতে শুনতে অতুলপ্রসাদ অভিভূত হয়ে পড়লেন, বাবাকে গানটি বার বার গাইতে বল্লেন। যতবার গাওয়া হয়, তাঁর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, আর একবার শোনার জন্য আকুল হয়ে পড়েন।

বাবা প্রতিদিন নতুন গান রচনা করতে লাগলেন আর আমরা বাগানের এক প্রান্তে গুহার সামনে আখরোট গাছতলায় বসে সেই গান শুনতে লাগলুম। বাবার তখনো গান গাইবার গলা ছিল। ঘরের বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে বসে গাইতেন, তাঁর গানে গাছপালা পাহাড় যেন কেঁপে উঠতো। অতুলপ্রসাদের গলা যেমন মিষ্টি, গাইবার ধরনও ভারি সুন্দর। সবচেয়ে ভাল লাগতো তিনি যে আন্তরিকতার সংগে ভাবে বিভোর হয়ে গান করতেন। বাবা ও অতুলপ্রসাদ দুজনেই যখন শ্রান্ত হয়ে পড়তেন, তখন দিনেন্দ্রনাথের পালা সুরু হোত। দিনের পর দিন এই রকম গানের উৎসব চলতো সারা সকালবেলা।

······রামগড়ের আসর ভাঙার সময় এল। প্রথম চলে গেলেন অতুলপ্রসাদ। যাবার সময় বাবাকে লক্ষ্ণৌতে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। তাঁর কাছে দু'চারদিন থাকতে হবে কেবল নয়, লক্ষ্ণৌতে একটি বক্তৃতাও দিতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথ হিমালয়ের সৌন্দর্যে অবগাহন করে এবার ফিরে চলেছেন। সপরিবারে রামগড় পাহাড় ত্যাগ করে ফেরার পথে তিনি এনড্রুজ সাহেবসহ লখনৌয়ে এলেন। অতুলপ্রসাদের সংগ রামগড় পাহাড়ে দশদিন উপভোগ

করেছেন। তবু বুঝি মন অতৃপ্ত তাই লখনৌয়ে আবার দুই গীতকারের মিলন হল। দুজনের আকর্ষণীয় সান্নিধ্য পেয়ে দুজনেই তৃপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের অতিথি। পরমপ্রিয় কবিকে স্বাগত জানাবার আগে তাঁর বাংলোটি পত্রপুষ্পে সুশোভিত করলেন। কবি এলে তাঁকে ঘিরে অতুল ভবনেই গানের আসর বসল। কত গান কবি অতুলপ্রসাদের কাছে শুনলেন, কত গান শোনালেন।

বাঙালীরা কবিকে দর্শন করতে অতুলের গৃহ-প্রাঙ্গনে এসে জড়ো হলেন অবাঙালীরাও এলেন এবং রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধুলো নিলেন। এলেন গোকরণ-নাথ মিশ্র, গঙ্গাপ্রসাদ ভার্মা, বিশ্বেশ্বর প্রসাদ ইত্যাদি।

সন্ধ্যেবেলা কবিকে বারদুয়ারীতে সম্বর্দ্ধনা জানান হল। উত্তরে কবি তাঁর মধুর কণ্ঠে ভাষণ দিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যের পর কবির নামে কোলকাতা থেকে টেলিগ্রাম এলো। কবির আর লখনৌয়ে থাকা হলোনা, পরের দিন সকালেই তিনি কোলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

॥ উনিশ ॥

১৯১৫ সাল, জাতীয় জীবনে একটি অশনিপাত ঘটে গেল ; মহামতি গোখলের এ বছর দেহান্ত হল।

বারদুয়ারীতে গোখলের শোকসভার আয়োজন করা হল। সে সভায় সভাপতিত্ব করলেন তৎকালীন সংযুক্ত-প্রদেশের লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ গভর্ণর মেস্টন সাহেব।

অতুলপ্রসাদ সে সভায় তাঁর ভাষণ দিতে গিয়ে শুধু 'গোখলে' নামটুকু উচ্চারণ করতে পারলেন। অশ্রুজলে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি বসে পড়লেন।

পুনাতে, গোখলের প্রতিষ্ঠিত 'সার্ভেণ্ট অফ্‌ ইণ্ডিয়া'-র তিনি সভ্য ছিলেন। তাঁর অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য প্রতি বছর তিনি পুনায় যেতেন। এই সংস্থায় তিনি প্রচুর টাকা দান করে তাকে সুদৃঢ় করেছেন।

সার্ভেণ্ট অফ্‌ ইণ্ডিয়ার সদস্যরা প্রায়ই লখনৌ আসতেন এবং অতুলপ্রসাদের অতিথি হতেন।

॥ কুড়ি ॥

বন্ধুবর উপেন্দ্রনাথ বলের বিবাহ উপলক্ষে অমল হোম লখনৌ এলেন ১৯১৪ সালে।

লখনৌয়ে নতুন মানুষ কেউ এসে সেন সাহেবের ব্যাংকস রোডের ভবনে যাবেন না এ হতে পারে না বিশেষ করে অতুলপ্রসাদের সংগে যখন উপেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা রয়েছে। উপেন্দ্রনাথ বন্ধু অমল হোমকে সেন সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন।

অতুলপ্রসাদ তখন সবে কোর্ট থেকে ফিরেছেন। উপেন্দ্রনাথ বন্ধুসহ এলে অতুলপ্রসাদ তাঁদের নিয়ে সোজা খাবার ঘরে গেলেন। মির্জা সামীউল্লা বেগ ও অধ্যাপক আবদার রহিমও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রহিম সাহেব বাঙালী কিন্তু আলিগড়ে মানুষ হওয়ার জন্য ভাংগা ভাংগা বাংলা বলতে পারতেন। বাংলা গান তিনি বড় ভালবাসতেন। অতুলপ্রসাদের কাছে প্রায়ই আসতেন ও রবীন্দ্র সংগীত শিখতেন। "রহিম ছাড়া সবাই যখন চলে গেল তখন গান জমে উঠল, রহিম সাহেব অতুলের সংগে গাইছেন 'বিশ্বসাথে যোগ যেথা বেহারো'…। অতুলের দীক্ষায় রহিম রবীন্দ্র সংগীত শিখেছেন"।[১]

অতুলপ্রসাদের একটি ভিক্টোরীয়া ফিটন ও একটি সাদা রঙের বনেদী 'ওয়েলার' ঘোড়া ছিল। অমল হোম প্রায়ই আসতেন। একদিন ফিটনে করে অতুলপ্রসাদ তাঁকে গোমতীর ধারে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। "সেদিন সন্ধ্যায় অতুলের সংগীত দরদী কবি মনের সংগে সংগে তাঁর বেদনা ক্ষুব্ধ প্রাণের সকরুণ ছবি—যা তার অচল অটল গাম্ভীর্যে ঢাকা পড়ে থাকত—তার পরিচয় পেলুম …তার সে গান—

'মন-দুখ চাপি মনে
হেসে সে সবার সনে,
যখন ব্যথার ব্যথীর পাবি দেখা—
জানাস প্রাণের বেদন'।…

কখন ভুলব না"।[২]

কোলকাতায় ফিরে অমল হোম কবি সত্যেন্দ্রনাথের কাছে অতুলপ্রসাদের

১, ২—অমল হোম—"স্মৃতিকথা" : 'উত্তরা'

গল্প করেন। শুনে সত্যেন্দ্রনাথের কবিমন দূরস্থিত আর এক কবির কবিতার স্বাদ নিতে উৎসুক হয়ে উঠল। অমল হোমকে তাগাদা দিতে তিনি অতুলপ্রসাদকে সব খুলে লিখলেন—আপনার নতুন গান যা লিখেছেন আমাকে পাঠিয়ে দিন।

তাঁর গান সত্যেন্দ্রনাথের ভাল লেগেছে জেনে অতুলপ্রসাদ আনন্দ প্রকাশ করলেন। কিন্তু কোন গান পাঠালেন না। লিখলেন—"সুরছাড়া আমার গানগুলি বড়ই ছন্দহীন, ছন্দের রাজার কাছে তাহা কি করিয়া পাঠাইব। এবার যখন কোলকাতায় আসিব তখন একদিন সত্যেন্দ্রবাবুকে ও আপনার বন্ধুদের গান গাহিয়া শুনাইব, আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

অতুলপ্রসাদ তাঁর কথা রেখেছিলেন। কিছুদিন পর তিনি কোলকাতায় যান। কোলকাতায় গেলে তিনি ভগ্নীপতি ডাক্তার দ্বিজেন মৈত্র বা মেসোমশাই প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের বাড়িতে উঠতেন। এখানে সমবয়সী সুবালা মাসীর সংগ ও স্নেহ দুই-ই বড় ভাল লাগে, কৈশোরের উচ্ছল জীবনের কথা মনে পড়ে যায়। অবসর সময়ে বসে পুরনো দিনের স্মৃতি বেশ রোমন্থন করা যায়। তবে তেমন অবসর তিনি কম পেতেন। 'ভাইদাদা' এসেছেন খবর পেলেই তাঁকে ঘিরে গান শোনা বা শেখার ধুম পড়ে যেত। সেবার প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের কাছেই রইলেন তিনি। তাঁর আসার খবর শুনে ভাগ্নী, ভাইঝি এবং অন্যান্যরা এসে হাজির হলেন—কনক, সাহানা, ঊষা, মীরা, রেনুকা ও আরো কতজন। তারা তাঁর গান শুনতে তাঁর কাছে গান শিখতে চায়। তিনিও আগ্রহের সংগে প্রাণ ঢেলে গান শেখান।

সাহিত্য বৈঠকও হত। দ্বিজেন মৈত্রের উদ্যোগে মেয়ো হাসপাতালের ছাদে অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের মিলন ঘটত। চাঁদনি রাতে পাশাপাশি দুটি কৌচে দুই কবি বসতেন ; ফারাসের উপর শ্রোতারা। তারপর গল্পে, গানে, সাহিত্যচর্চায় সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যেত কেউ টের পেতেন না। দুই গীতকার তাঁদের নব নব গানের সম্ভার যেন উজাড় করে দিতেন।

এবার এসে অতুলপ্রসাদ 'ভারতী' অফিসে দর্শন দিতে ভুললেন না। সত্যেন্দ্রনাথের সংগে পরিচিত হয়ে খুবই খুশি হলেন। তাঁকে ও তাঁর বন্ধুবান্ধবদের একাধিক স্বরচিত গান শোনালেন। শুনে ছন্দরাজ খুবই মুগ্ধ, তৃপ্ত হলেন।

কোলকাতায় অতুলপ্রসাদের সাহিত্যিক বন্ধুর অভাব নেই। বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে যদিও তিনি অসপত্ন তবু আধুনিক সাহিত্য গোষ্ঠীর আড্ডাখানা 'ভারতী'তে

গেলে গল্প করে গান শুনিয়ে সময় কেটে যেত ; সময় যেন পাখি, হুস করে শেষ হয়ে যেত

॥ একুশ ॥

নবাব ও তালুকদারদের মধ্যে তখন বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া লেগেই থাকত। এমনি একটি বিবাদ কোর্ট পর্যন্ত গড়াল। বিবদমান পার্টির এক দিকে রয়েছেন অতুলপ্রসাদ। তাঁর দক্ষতায় মামলা যে ভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে বিরুদ্ধপক্ষ বুঝলেন যে, তাদের পক্ষে এ মামলায় জয়ী হওয়া অসম্ভব।

তারা তখন অন্য পথ ধরলেন। গোপনে প্রচুর অর্থ দেবার প্রলোভন দেখিয়ে অতুলপ্রসাদকে এ মামলা থেকে সরে দাঁড়াবার প্রস্তাব পাঠালেন। দৃঢ়চরিত্র অতুলপ্রসাদ এক কথায় সে প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন।

মামলায় অতুলপ্রসাদের পক্ষ জয়ী হলেন। পরাজিত বিরুদ্ধ পার্টি রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হলেন। অতুলপ্রসাদকে অপমানিত, অপদস্থ করার সলাপরামর্শ শুরু করে দিলেন। স্থির করলেন যে, মিসেস সেনকে তিন চার দিনের জন্য কোথাও লুকিয়ে রাখা। তাতে সমাজে অতুলপ্রসাদের সম্মান, প্রতিপত্তি ক্ষুন্ন হবে এবং নিজেদের প্রতিশোধ লিপ্সাও চরিতার্থ হবে।

কিন্তু এই দুরভিসন্ধির কথা[১] অতুলপ্রসাদের কোন শুভানুধ্যায়ী হেমকুসুমকে আগেই জানিয়ে সাবধান করে দেন। শুনে হেমকুসুম স্তম্ভিত হয়ে যান।

যখন সম্বিৎ ফিরে পেলেন তখন তিনি রাগে দিশেহারা হয়ে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল অতুলপ্রসাদের ওপর। রাগের বশে অতুলপ্রসাদের সমস্ত পোষাক পরিচ্ছদ একত্র করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিলেন।

অতুলপ্রসাদ তখন তাঁর এক বন্ধুর জন্মদিনে টি-পার্টিতে গিয়েছিলেন। খবর পেয়ে যখন তিনি ফিরে এলেন তখন তাঁর একটিও পোষাক অবশিষ্ট নেই। ষড়যন্ত্রের কথাও শুনলেন এবং শুনে বিস্মিত হলেন।

কিন্তু হেমকুসুমের ব্যবহারে তিনি বড়ই আঘাত পেলেন ও অসন্তুষ্ট হলেন।

১—এ ঘটনা একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট থেকে শোনা এবং একাধিক প্রবীন ব্যক্তির দ্বারা উহা সমর্থিত হয়েছে—লেখিকা

রাগের বশে হেমকুসুম মাঝে মাঝে এমন সব কাজ করে বসেন যে অতুলপ্রসাদকে লজ্জিত ও অপদস্থ হতে হয়। আজকের ঘটনাও গোপন থাকবে না, সারা শহরে এই নিয়ে আলোচনা ও হাসাহাসি হবে।

সারারাত অতুলপ্রসাদের চোখে ঘুম নেই। তিনি ভাবনায় তলিয়ে গেলেন, ভেতরের উত্তেজনায় তিনি বাইরে অস্থির হয়ে উঠলেন। পরে শান্ত মনে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে আগামী কালই তিনি কোলকাতায় চলে যাবেন এবং সেখানেই আবার প্র্যাক্‌টিস শুরু করবেন। বসে বসে প্রভাত হবার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

পরের দিনই তিনি কোলকাতা যাবার জন্য তৈরী হলেন। হেমকুসুমের প্রতি তাঁর মন তখন এতই বিরূপ ছিল যে তাঁকে এ সম্বন্ধে কিছুই বললেন না। মুন্সী ব্রিজরাজ কিশোরকে মামলা মোকদ্দমার কাগজপত্তর এবং কোন জুনিয়রের ওপর কি ভার দিয়ে যাচ্ছেন বুঝিয়ে দিলেন। মহেশকে ডেকে তাঁর ওপর স্ত্রী-পুত্রের দেখাশোনার ভার দিয়ে নিজেকে দায়িত্ব-মুক্ত করলেন।

১৯১৫-র নভেম্বর মাসের শেষ দিকে তিনি কোলকাতার পথে যাত্রা করলেন।

॥ বাইশ ॥

অতুলপ্রসাদ লখনৌয়ে তাঁর বিরাট প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে কোলকাতা হাইকোর্টে যোগ দিলেন। এখানে এসে মার সংগে আবার দেখা হল। একমাত্র পুত্র অতুল-প্রসাদকে অনেকদিন পর কাছে পেয়ে আনন্দে তাঁর বুক ভরে উঠল, চোখে জল দেখা দিল। অতুলপ্রসাদও খুশি।

অবশ্য এর আগেও মার সংগে তাঁর দেখা হয়েছে। কোলকাতায় তিনি স্বল্প-কালের জন্য একাধিকবার এসেছেন এবং যখনি এসেছেন মার সংগে সাক্ষাৎ করতে ভোলেন নি।

কোলকাতায় এখন থেকে তো থাকবেন। তাই ওয়েলেস্‌লী ম্যান্‌সনে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আবার শুরু হল তাঁর নতুন জীবন, নিঃসংগ জীবন।

বাংলাদেশ, আধুনিক সাহিত্যের কেন্দ্রভূমি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান।

এখানে আকাশে বাতাসে জলে স্থলে ছড়িয়ে থাকে সাহিত্যের উপাদান, মধুর-নেশায়-চুর মধুপের মত এদেশের মানুষের মন কাব্যের নেশায় ভরপুর।

সেইদেশে এলেন কবি অতুলপ্রসাদ,"আ মরি বাংলা ভাষা"র গীতকার অতুল-প্রসাদ, মজলিসী অতুলপ্রসাদ। কোলকাতার সাহিত্যিক মহলে যেন সাড়া পড়ে গেল।

অতুলপ্রসাদের ফ্ল্যাটে জোড়া-তক্তপোষ পাতা হল। তার ওপর গালচে, চাদর বিছিয়ে মজলিসের উপযুক্ত আসর তৈরী করা হল। তারপর সাহিত্যিক বন্ধুদের সংগে সাহিত্য আলোচনা, গান, বাজনা, আড্ডা, ভুরিভোজন ; বৃদ্ধ প্রভুবৎসল বাবুর্চি নবাব আলীর হাত পায়ের বিশ্রাম নেই।

"তাঁর ফ্ল্যাটে আত্মীয়স্বজন ও পুরনো বন্ধুদের যাওয়া আসা ছিল ; লর্ড সিংহ, সি. ওয়াই. চিন্তামনি, হারীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ভগ্নী মৃণালিনী দেবীও আসতেন। হারীন্দ্রকুমারকে অতুলপ্রসাদ বলেছিলেন, 'তুমি কবি-খ্যাতিতে তোমার দিদিকে (সরোজিনী নাইডু) ছাড়িয়ে যাবে'।"[১]

আর আসতেন মন্-ডে ক্লাবের সাহিত্যিক বন্ধুরা।

অতুলপ্রসাদের মাসতুত ভাই শিশিরকুমার দত্ত ছিলেন মন্ডে ক্লাবের সেক্রেটারি। একদিন এসে অতুলপ্রসাদকে ধরলেন, ভাইদাদা, আমাদের মণ্ডা-ক্লাবের সভ্য হতে হবে তোমায়।

মণ্ডাক্লাব! নামটা যেন কেমন, ভাবেন অতুলপ্রসাদ। জিজ্ঞাসাও করেন।

শিশিরকুমার এবার প্রাঞ্জল হলেন, খুলে বললেন ক্লাবের ইতিহাস। এই ক্লাবের স্থাপয়িতা আবোল তাবোল-এর লেখক সুকুমার রায় প্রথমে এটির নাম দিয়েছিলেন 'নন্সেন্স' ক্লাব। পরে ক্লাবের অধিবেশন সোমবার সোমবার হওয়ায় এর নতুন নামকরণ করা হয় 'মন্-ডে' ক্লাব। "আমাদের শান্তিনিকেতন" এই গানটি শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকরা গেয়ে থাকেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সেই গান অনুকরণ করে লিখলেন :—

"আমাদের শান্তিনিকেতন
—আরে না—তা না, আমাদের
monday সম্মিলন!
আমাদের হল্লারই কুপন!

১—অমল হোম—'স্মৃতিকথা' : ৫

তার উড়ো চিঠির তাড়া
মোদের ঘোরায় পাড়া পাড়া,
কভু পশুশালে হাঁসপাতালে আজব আমন্ত্রণ" !...

ক্লাবের অধিবেশন সভ্যদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে হত। যাঁর বাড়িতে হত তিনি চা, খাবার, মণ্ডা মিঠাইয়ের ব্যবস্থা করতেন। তাই মনডে ক্লাবের চলতি নামডাক হল 'মণ্ডা' ক্লাব। সভ্যরা ছিলেন—

অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুকুমার রায়, গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, কালিদাস নাগ, শ্রীশচন্দ্র সেন, অমল হোম, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুবিমল রায়, সুবিনয় রায়, প্রভাতচন্দ্র গংগোপাধ্যায়, জীবনময় রায়, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্ন্যাল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কিরণশংকর রায়, শিশিরকুমার দত্ত এবং আরো কয়েকজন। এই সব সভ্যদের নামের সংগে অতুলপ্রসাদের নামও যোগ হল।

মনডে ক্লাবের অধিবেশনে সাহিত্য-চর্চা, সংগীত-চর্চা ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। "একবার অতুলপ্রসাদ অস্কার ওয়াইল্ডের ট্রায়ালের গল্প শোনালেন। চিত্তরঞ্জন এবং উনি তখন বিলেতে। ওল্ড বেলীতে অস্কারের যেদিন ট্রায়াল হয় ওঁরা শুনতে গিয়েছিলেন। Sir Edward Carson-এর জেরার জবাবে অস্কারের মুখে কি রকম বাক্যের তুবড়ি ছুটেছিল তার বর্ণনা দিলেন। অস্কারের "Ballard of the Reading" থেকে কিছু পড়েও শোনালেন"।[২]

"অতুলবাবু আমাদের তাঁর স্বরচিত গান গেয়েও শোনান। তিনি বেশি কথা বলতেন না, স্বল্পভাষী ছিলেন। যা বলতেন খুব মৃদুস্বরে বলতেন। আমরা তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতুম"।[৩]

ক্লাবের অধিবেশনে বাইরের লোকও নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যেদিন এসেছিলেন তাঁর স্বরচিত গল্প, 'পয়লা নম্বর' পড়ে শুনিয়েছিলেন।

"হাসির রাজা সুকুমার রায় ক্লাবে স্বরচিত হাসির গান করতেন। একবার গাইলেন :—

২—অমল হোম—"স্মৃতিকথা" : 'উত্তরা'।

৩—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন।

কাঁদ রে মন কাঁদ রে
তোর মন-বাগানের গোপন তরুর
ফল খেয়েছে বাঁদরে।"[৪]

অতুলপ্রসাদ তাঁর গান খুব উপভোগ করতেন।

একবার সেক্রেটারিকে পাওয়া যাচ্ছিল না। ক্লাব বন্ধ। সভ্যরা সব মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

হঠাৎ নিমন্ত্রণপত্র এলো। দক্ষশিল্পী সুকুমার রায় তাঁর স্বহস্তে অংকিত সুদৃশ্য কার্ডে এই স্বরচিত কবিতাটি লিখে সভ্যদের নিকট পাঠালেন—

"সম্পাদক বেয়াকুব
কোথা যে দিয়েছে ডুব্।
এ দিকেতে হায় হায়
ক্লাবটিত যায় যায়!

তাই বলি, সোমবারে
মদগৃহে গড়পারে
দিলে সবে পদধূলি
ক্লাব্‌টিরে ঠেলে তুলি।

রকমারি পুঁথি যত
নিজ নিজ রুচিমত
আনিবেন সাথে সবে
কিছু কিছু পাঠ হবে।

করযোড়ে বার বার
নিবেদিছে সুকুমার"।[৫]

কবি সুকুমার রায়ের বাড়িতে সরবতের নিমন্ত্রণে অপর একটি কবিতা—

"শনিবার ১৭ই
সাড়ে-পাঁচ বেলা,
গড়পারে হৈ হৈ
সরবতী মেলা।

৪—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন।
৫—সত্যজিৎ রায়ের সৌজন্যে।

অতএব ঘড়ি ধরে—
সাবকাশ হ'য়ে
আসবেন দয়া ক'রে
হাসিমুখ লয়ে।

সরবৎ, সদালাপ,
সংগীত-ভীতি—
ফাঁকি দিলে নাহি মাপ
জেনে রাখ—ইতি"।[৬]

মনডে ক্লাবের অধিবেশন যখন যেখানে হয়েছে অতুলপ্রসাদ আগ্রহের সংগে সেখানে ছুটে গেছেন, আনন্দ পেয়েছেন, আনন্দ দিয়েছেন।

অতুলপ্রসাদের ফ্ল্যাটেও একাধিকবার ক্লাবের অধিবেশন হয়েছে। প্রথম অধিবেশন হয় ৫ই মে, ১৯১৬ সালে। সে অধিবেশনে "Mr. Sen read from various books e. g. Tennyson, Shakespeare and Bankimchandra. All enjoyed the reading very much."[৭]

এরপর ঐ মাসের ২৩ তারিখে আরো একটি অধিবেশন এখানে হয়। অধিবেশনে, "There were song and songs by Mr. Harin Chatterjee which was enjoyed by the audience universally."[৮]

ঐ বছরই ২৬শে জুন অতুলপ্রসাদের ফ্ল্যাটে তৃতীয়বার অধিবেশন হয যাতে, "There was no fixed subject ; mainly there were songs etc. by Mr. Sen and Mr. Nag."[৯]

বলাবাহুল্য, অধিবেশনের শেষে ডান হাতের বিরাট ব্যবস্থাও থাকত।

•

বিজয়বাবু চিড়িয়াখানার সুপারিন্টেনডেন্ট ছিলেন। যে দিন তাঁর কোয়ার্টারে ক্লাবের অধিবেশন হয় সেদিন ক্লাবের সব সভ্যরা উপস্থিত ছিলেন। তাই সে দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে সভ্যদের একটি গ্রুপ ফোটো তোলা হয়। চিড়িয়াখানার প্রাকৃতিক পরিবেশে সভ্যরা সাহিত্য-চর্চা, সংগীত-চর্চা করে যেন নতুন আনন্দের স্বাদ পেলেন।

মনডে ক্লাবের সভ্যরা মাঝে মাঝে আনন্দ-ভ্রমণে যাত্রা করতেন। একবার

৬—সত্যজিৎ রায়ের সৌজন্যে।
৭,৮,৯—শিশিরকুমার দত্ত—'ডায়েরী'।

সব সভ্যরা মিলিত হয়ে স্টীমারে করে গঙ্গাবক্ষে কোলকাতা থেকে কোলাঘাট পর্যন্ত বেড়িয়ে এলেন। স্রোতস্বিনী গঙ্গার কুলুকুলু গুঞ্জন ও তার দুই পারের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য সভ্যদের কবি-মনকে যেন আনন্দে উল্লাসিত, উচ্ছ্বসিত করে তুলল। গৈরিক বসনা গঙ্গার ওপর চলল কাব্যপাঠ, সঙ্গীতচর্চা, আনন্দের স্রোত। অতুলপ্রসাদ তাঁর মধুর কণ্ঠে কত যে স্বরচিত সুন্দর সুন্দর গান গেয়ে শোনলেন তার ঠিক নেই।

সঙ্গীতসুধা পানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তম পান-ভোজনও হল। তারপর চাঁদনি রাতে প্রকৃতির মধুর ছবি মনে এঁকে আনন্দে-তৃপ্ত সভ্যরা কোলকাতয় ফিরে এলেন।

॥ তেইশ ॥

কোলকাতায় মনোরম সাহিত্যিক পরিবেশে অতুলপ্রসাদ যেন একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তার চেয়েও আকর্ষণীয় কিছু কোলকাতার কাছেই রয়েছে—শান্তিনিকেতন, সাহিত্যের নিকেতনও; যেখানে সাহিত্য গুরু রবীন্দ্রনাথের অবস্থান সেখানে তো সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গম।

রামগড়ে কবির সঙ্গে সেই কটি অমূল্য দিন অতুলপ্রসাদের স্মৃতিকে এখনো মধুর রসে সিক্ত করে রেখেছে। কতদিন কবির মধুর কণ্ঠে তাঁর কাব্য-সঙ্গীত শোনা হয়নি, শোনানও হয়নি। কবিকে গান শুনিয়ে কি তৃপ্তির শেষ আছে। এ ত শুধু গান শোনান নয়, কথা ও সুরের মাধ্যমে এক সুরেলা কবি-মনের সঙ্গে আর এক সুরেলা কবি-মনের সংযোগ সাধন; হৃদয়ের দ্বারা হৃদয়ের ভাব বিনিময়, আত্মার দ্বারা আত্মাকে স্পর্শ করা।

কবিও তাঁর প্রিয়পাত্র এই গান-পাগল মানুষটিকে প্রায়ই স্মরণ করতেন। তাঁর সহকর্মী এবং অনুরাগীদের নিকট তিনি "তাঁদের পুরাতন সাহিত্য-চক্রের বিষয় নানা গল্প বলতেন। অতুলপ্রসাদের সলজ্জ, শান্তভাবের কথা তিনি বার বার উল্লেখ করতেন। এত লাজুক ছিলেন যে নিজের রচনা চট্ করে কারুর সামনে তুলে ধরতে পারতেন না"।[১]

১—অসিতকুমার হালদার—'অতুলদা': "উত্তরা"।

অতুলপ্রসাদ শান্তিনিকেতনের উদ্দেশে রওনা হলেন। 'শান্তিনিকেতন' এই ছ'টি অক্ষর উচ্চারণের সংগে সংগে শরীর রোমাঞ্চিত, দর্শনে মন মুগ্ধ। প্রকৃতির কোলে কবি যেন তাঁর কবিতাকে রূপবদ্ধ করে একটি স্বপ্নের দেশ গড়ে তুলেছেন —ছাতিম গাছের ছায়ায় পাতায়-ঢাকা গোলাকৃতি স্নিগ্ধ মাটির ঘর যেন মার স্নিগ্ধ কোল। আর কি মিষ্টি নাম তাদের—শ্যামলী, পূরবী, পুনশ্চ······।

কবির কাছে পেঁছে অতুলপ্রসাদের মন যেন আনন্দে, খুশিতে ঝলমল করে ওঠে, শান্তিতে বুক ভরে যায়।

উৎসুক, উন্মুখ কবি তাঁকে স্নেহের সাদর আহ্বান জানালেন। তারপর দুই গীতকার একে অপরকে গান শোনাতে বসলেন। অতুলপ্রসাদ যে সময়টুকু রইলেন তাঁর গানে গানে শান্তিনিকেতন মুখরিত হয়ে উঠল।

তিনি আবার যখন চলে গেলেন তখন তাঁর গাওয়া গানগুলি বিশেষ করে 'ওগো আমার নবীন শাখী' গানটি আশ্রমের ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে ধ্বনিত হতে লাগল। অতুলদা যেন আশ্রমের শাল-বীথিকায় গানের একটি পাখী ছেড়ে দিয়ে গেলেন।"[২]

॥ চব্বিশ ॥

কোলকাতায় ফিরে আসার কিছুদিন পরে সত্যদাদার সংগে দেখা হল। অতুলপ্রসাদ কোলকাতায় আছেন শুনে দাদা ছুটে এলেন।

অতুলপ্রসাদের কাছে দাদা শুনলেন তাঁর কোলকাতায় চলে আসার কারণ এবং মানসিক উৎকণ্ঠা।

সব শুনে দাদা প্রস্তাব করলেন, চল, আমার সংগে দার্জিলিং ঘুরে আসবে তাতে বেড়ান হবে আর মনের পরিবর্তনও হবে।

দাদার ইচ্ছাই অতুলপ্রসাদের ইচ্ছা। দুই ভাই দার্জিলিং বেড়াতে গেলেন।

কাশ্মীরকে বলা হয় ভূস্বর্গ আর দার্জিলিং হল সৌন্দর্যের রানী—কী অপূর্ব পাহাড়ী শহর! দুই ভাই পাশাপাশি হাঁটতে থাকেন, শহর দেখে বেড়িয়ে

২—অসিতকুমার হালদার—'অতুলদা' : "উত্তরা"।

বেড়ান। ম্যালে দাঁড়িয়ে মেঘের ওড়না ঢাকা পাহাড়শ্রেণী, আলিঙ্গনবদ্ধ ঘন বনবীথিকা, সর্পিল মোটর রোড, পাহাড়ের গায়ে চলন্ত ট্রেন, কী চমৎকার সব দৃশ্য! তারপর টাইগার হিলে দাঁড়িয়ে আকাশের পটভূমিকায় জ্যোতির্ময় সবিতার আলোর জয়যাত্রা দেখলে জীবনের সব অপূর্ণতা, তুচ্ছতা মিথ্যে হয়ে যায়।

রাত্রিবেলা দুই ভাই পাশাপাশি শুয়ে সুখদুঃখের কথা বলেন। অতুলপ্রসাদ তাঁর পারিবারিক অশান্তির কথা বলেন। দাদা মন দিয়ে শোনেন, ভায়ের দুঃখে দুঃখিত হন, সান্ত্বনা দেন।

"অতুল আমার বুকে মাথা রাখিয়া পড়িয়া থাকিত। নীরবতার মধ্যেই তাহার প্রাণের বেদনা জানিতে ও বুঝিতে পারিতাম। সেও আমার সহানুভূতির স্পর্শ বুঝিতে পারিত। এরূপ সমবেদনায় আমরা কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়াছি। সেবারেই অতুল তার সেই গানটি রচনা করে—

"যাব না, যাব না, যাব না ঘরে,
বাহির করেছে পাগল মোরে।
বনের বিজনে মৃদুল বায়,
দুলে দুলে ফুল বলে আমায়,
'ঘরের বাহিরে ফুটিবি আয়
পুলক-ভরে"।[১]...

প্রকৃতির বিস্ময়কর রূপে মুগ্ধ হয়ে অতুলপ্রসাদ যখন তখন গান করতেন। সকাল-সন্ধ্যে-দুপুর যখনি বেড়াতে বেরিয়েছেন পথের পাশে বসে দাদাকে একটির পর একটি করে কত গান শুনিয়েছেন।

অতুলপ্রসাদ দার্জিলিংয়ে থাকাকালে হেমকুসুম দিলীপকুমারকে নিয়ে শিশির কুমারের সংগে সৌন্দর্যের রানীর দেশে এলেন।

অতুলপ্রসাদ কোলকাতায় চলে আসার পর ব্যাঙ্কস্ রোডের বাংলো যেন হেমকুসুমের কাছে দৈত্যপুরী হয়ে উঠেছিল। খানসামা, চৌকিদার, ড্রাইভার দাসদাসী সবই ছিল। সবার ওপর ছিলেন মহেশ চট্টোপাধ্যায়। কোথাও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল না। তবুও হেমকুসুমের মনে হয়েছিল বাংলোটা যেন বড় ফাঁকা ফাঁকা; নিরবচ্ছিন্ন সময় যেন জমাট বেঁধে এক জায়গায় চুপচাপ

১—সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।

দাঁড়িয়ে গেছে ; জীবন যেন তরঙ্গহীন পুষ্করিণী। তিনি কি এমনিই জীবন চেয়েছিলেন !

তাঁর জন্য টাকা-পয়সার ভাল রকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিনি কি কেবল টাকাই চেয়েছিলেন। টাকা দিয়ে কি জীবনের সব কিছু কিনতে পাওয়া যায়— সেই জীবনের জন্যই কি তিনি তাঁর বধূজীবন থেকে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে এসেছেন। অভিমানে হেমকুসুমের দু চোখ জলে ভরে উঠল। পরে শান্ত হয়ে ভাবলেন তিনি বড় জেদী, তাঁর জেদের জন্য অন্যকে কষ্ট দিয়েছেন, অশান্তির সৃষ্টি করেছেন। হঠাৎ হেমকুসুমের মন অনুতাপে ছেয়ে গেল। মনকে শান্ত করতে তিনি স্মৃতি-রোমন্থন ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন, গল্পসল্প করে, সেতার বাজিয়ে সহজ হতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেতারের টুং টাং শব্দ মনের তারেও প্রতিধ্বনিত হয়ে তাঁকে বিচলিত করে তুললো।

তখনি তিনি পুত্র দিলীপকে নিয়ে মহেশের সঙ্গে কোলকাতায় চলে এলেন। তারপর সেখান থেকে দার্জিলিং।

শৈলাবাসে এসে হেমকুসুম দিলীপকুমারকে নিয়ে একটি হোটেলে উঠলেন। শিশিরকুমার আপত্তি জানিয়ে অনুরোধ করলেন অতুলপ্রসাদের সঙ্গে একই স্থানে থাকতে।

তার উত্তরে অভিমানিনী হেমকুসুম বললেন, তোমার দাদা লখনৌ ছাড়ার পর আমাদের একটিও চিঠি লিখে খোঁজ নেননি। আমরা যেচে কেন তাঁর কাছে যাব।

শিশিরকুমার হেমকুসুম ও অতুলপ্রসাদের কাছে ভাগাভাগি করে থাকতে লাগলেন। অতুলপ্রসাদ শিশিরকুমারকে অনুরোধ করলেন পুত্র দিলীপকুমারকে একবার তাঁর কাছে নিয়ে আসতে। নিজে যাবেন না, অভিমান।

হেমকুসুম অতুলপ্রসাদের প্রস্তাব শুনে ঘোর আপত্তি জানালেন। অগত্যা শিশিরকুমার লুকিয়ে দিলীপকুমারকে অতুলপ্রসাদের কাছে নিয়ে গেলেন।

হেমকুসুম পরে এটা জানতে পারেন এবং খুবই অসন্তুষ্ট হন।

শিশিরকুমার দিলীপকুমারকে হেমকুসুমের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসার পর থেকেই অতুলপ্রসাদ বড় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েন।

তাঁর গান-গল্পে আর উৎসাহ নেই, ঘর অন্ধকার করে চোখের ওপর হাত রেখে অতুলপ্রসাদ শুয়ে পড়লেন।

ঠিক ওঁর পাশের ঘরে রয়েছেন শিশিরকুমার। তিনিও শুয়ে আছেন।

ঘুম আসছে না। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন পাশের ঘর থেকে মৃদু সুরে গান করছেন অতুলপ্রসাদ। বড় করুণ সুর। ধীর পায়ে তিনি অতুলপ্রসাদের ঘরে এসে দেখলেন যে চোখের ওপর হাত রেখে শুয়ে শুয়ে অতুলপ্রসাদ গান করছেন। কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরের আলো তাঁর মুখের ওপর এসে পড়েছে। সেই মৃদু আলোর আভায় শিশিরকুমার দেখলেন গানের সঙ্গে সঙ্গে অতুলপ্রসাদের মুদ্রিত চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। তিনি গাইছেন—

"আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে,
বিশ্ব-ঘরে পেতাম না ঠাঁই।
দুজন যদি হত আপন,
হত না মোর আপন সবাই"।...[২]

নিজেকে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছেন এই আনন্দ দিয়ে তিনি নিজের বঞ্চিত মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

এরপর কোলকাতায় ফিরে এলেন অতুলপ্রসাদ, বন্য প্রকৃতির স্নিগ্ধ কোল থেকে কোলাহলমুখর বিরাট শহরে পেঁছিলেন। তিনিও কর্মের মাঝে, সাহিত্য, সংগীতচর্চার মাঝে ডুব দিলেন।

এবারেই অতুলপ্রসাদ সত্যদাদার অনুরোধে তাঁর কর্মস্থানে লাক্‌সামে যান। ঢাকাতেও যান, ইচ্ছে ছিল নিজেদের গ্রাম মগরাতেও যাবেন। কিন্তু গ্রামে আর যাওয়া হয়ে উঠল না। তিনি ঢাকা থেকে কোলকাতায় ফিরে এলেন, ঢাকা পুনর্দর্শনে অতীত স্মৃতিতে যেমন তাঁর মন পীড়িত হল তেমনি বিগত আনন্দের দিনগুলি স্মরণ করে মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

॥ পঁচিশ ॥

কোলকাতায় এসে হেমকুসুম ল্যান্সডাউন রোডে বাড়ি ভাড়া নিলেন। দিলীপ-কুমার রইলেন তাঁর সঙ্গে। মহেশ চট্টোপাধ্যায় অন্য বাড়িতে রইলেন। তবে প্রতিদিন তিনি হেমকুসুমের নিকট আসতেন, তাঁর প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করে

২—শিশিরকুমার দত্ত—'ডায়েরী'।

দিতেন ; ছাত্র দিলীপকুমারকে নিয়মিত পড়াতেন। এখানে এসে দিলীপকুমার হেমকুসুমের ইচ্ছায় এবং মহেশের চেষ্টায় স্কুলে ভর্তি হলেন।

অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় কোলকাতায় এসে একদিন হেমকুসুমের সংগে দেখা করতে এলেন। কুশল প্রশ্নাদির পর তিনি হেমকুসুমকে গান শোনাতে অনুরোধ করলেন।

তখন আকাশের মুখখানি ধূসরতায় ঢেকে গেছে। ঘরের ভেতর আবছা অন্ধকার। রাস্তার মৃদু আলো হেমকুসুমের চিন্তাক্ষীণ মুদিত চোখে ও মুখে এসে পড়েছে। তিনি অর্গ্যান বাজিয়ে অতুলপ্রসাদের গান গেয়ে শোনালেন। যখনি গাইতেন, তিনি অতুলপ্রসাদের গানই গাইতেন। গাইলেন :—

কাঙাল বলিয়া করিয়ো না হেলা,
আমি পথের ভিখারি নহি গো।
শুধু তোমারি দুয়ারে অন্ধের মতো
অন্তর পাতি রহি গো।

শুধু তব ধন করি আশ
আমি পরিয়াছি দীন-বাস ;
শুধু তোমারি লাগিয়া গাহিয়া গান
মর্মের কথা কহি গো।

মম সঞ্চিত পাপ পুণ্য,
দেখো, সকলি করেছি শূন্য ;
তুমি নিজ হাতে ভরি দিবে তাই
রিক্ত হৃদয় বহি গো।

তারপর—

ওগো সাথি, মম সাথি, আমি সেই পথে যাব সাথে,
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ-তিলক-মাথে।

যে পথে কাননে আসে ফুলদল,
যে পথে কমলে পশে পরিমল,

যে পথে মলয় আনে সৌরভ শিশিরসিক্ত প্রাতে।—
আমি সেই পথে যাব সাথে।

যে পথে বধূরা যমুনার কূলে
যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে,
যে পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে।—
আমি সেই পথে যাব সাথে।

যে পথে পাখিরা যায় গো কুলায়,
যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়,
সে পথে মোদের হবে অভিসার শেষ তিমির-রাতে।

অরুণপ্রকাশ নিঃশব্দে বসে বৌঠানের মধুর কণ্ঠে অতুলদাদার অপূর্ব গান দুটি শুনলেন আর দেখলেন গানের সুরধারার সঙ্গে সঙ্গে বৌঠানের দু চোখ বেয়ে অবিরাম অশ্রুধারা ঝরে পড়ছে। উনি যে ওখানেই বসে আছেন সে বোধ যেন বৌঠানের নেই।

এক সময়ে অরুণপ্রকাশ নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দুটি পরম-প্রিয় ব্যর্থ জীবনের কথা ভেবে তাঁর মন বেদনায় ভরে গেল।

॥ ছাব্বিশ ॥

১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে লখনৌ শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু লখনৌয়ের মুকুটমণি সেন সাহেব অনুপস্থিত। তাঁকে বাদ দিয়ে এ গুরুদায়িত্ব সুসম্পন্ন করা সম্ভব নয়। কর্মকর্তারা চিন্তিত হলেন। এমন সময়ে তাঁর মত সুযোগ্য পরামর্শদাতা, গুরু পরিশ্রমী, দানে মুক্তহস্ত, দায়িত্বশীল ব্যক্তির উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।

তখন নভেম্বর মাস। কোলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন সেন সাহেবের বিশেষ বন্ধুরা—মির্জা সামীউল্লা বেগ, গোকরননাথ মিশ্র, বিশ্বেশ্বর নাথ শ্রীবাস্তব।

পুরনো বন্ধুদের দেখে সেন সাহেব বিস্মিত আবার আনন্দিত। আদর করে তাঁদের বসিয়ে কুশল প্রশ্ন করলেন; আসার কারণ জানতে চাইলেন।

কারণ আর কি, আমাদের ছেড়ে-ছুড়ে অনেকদিন তো কোলকাতায় রইলেন। এবার চলুন আমাদের সংগে লখনৌয়ে, বললেন মির্জা সাহেব।

লখনৌর স্মৃতিতে অতুলপ্রসাদের মন ছেয়ে আছে। তিনিও তো যেতে চান, কিন্তু—

আপনাকে আমরা নিতে এসেছি। লখনৌয়ে এই ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন হবে, এ সময়ে আপনার অনুপস্থিতি ভাবাই যায় না। আপনাকে এবার লখনৌ যেতেই হবে। ছোট ভাইয়ের মত তাঁরা আব্দার করেন।

এমন স্নেহের আহ্বান উপেক্ষা করা যায় না। অতুলপ্রসাদের মন সিক্ত হল। একটু ভেবে লখনৌ যাওয়াই স্থির করলেন। বন্ধুদের আশ্বস্ত করলে তাঁরা হাসিমুখে বিদায় নিলেন।

এবার অতুলপ্রসাদ নিজের দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হলেন ; ঐ অধিবেশনের জন্য একটি গান রচনা করে ফেললেন।

একদিন অমল হোম এলেন। "নক করতে দরজা খুলে দিলেন লর্ড সিংহ (তখন স্যার)।......সেখানে লখনৌ কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য রচিত গান 'বল বল বল সবে শত বীণা বেণু রবে' শুনলুম ও মুগ্ধ হলুম"।[১]

অতুলপ্রসাদের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েও তাঁর সহকর্মী প্রিয় বন্ধুরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। তাই কংগ্রেস অধিবেশন আরম্ভ হবার তিন হপ্তা আগে তাঁরা এসে অতুলপ্রসাদকে সংগে করে নিয়ে গেলেন।

॥ সাতাশ ॥

আবার লখনৌ।

বন্ধুবান্ধব, গুণমুগ্ধ ভক্তরা, স্নেহভাজনেরা সব ছুটে এলেন সামীউল্লা বেগের বাড়িতে। অতুলপ্রসাদ তখন তাঁর অতিথি। তাঁর আগমনে সারা লখনৌ শহরে যেন সাড়া পড়ে গেল। উত্তর প্রদেশের নেতারা তাঁদের জনচিত্তজয়ী

১—অমল হোম—'স্মৃতিকথা' :

নেতা সেন সাহেবকে ঘিরে দাঁড়ালেন। নেই শুধু গঙ্গাপ্রসাদ ভার্মা ; তিনি ইতিমধ্যে স্বর্গারোহণ করেছেন।

লখনৌয়ে কংগ্রেস অধিবেশনের আর তো কিছুদিনই বাকি। সেন সাহেব এসে গেছেন, এখন তিনিই বলুন, পরামর্শ দিন কি ভাবে কি করতে হবে।

সেন সাহেবও তৎপর। মিটিং ডাকা হল। সে মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জগৎনারায়ণ মোল্লা হলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। চারজন সেক্রেটারীর মধ্যে অতুলপ্রসাদ হলেন একজন। উপরন্তু তিনি ভলেণ্টিয়ারদের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হলেন।[১] এ নির্বাচনে তিনি খুশি। তরুণদের সঙ্গ পেতে, তরুণদের মাঝে থাকতে বড় ভাল বাসতেন। এখন তাঁর অধীনে চারশো তরুণ ভলেণ্টিয়ার !

অমিতকর্মী অতুলপ্রসাদ যেমন নিজে হাস্যমুখে কাজ করতে জানেন

১—(অতুলপ্রসাদের ডায়েরীতে লখনৌ কংগ্রেসে তাঁর ক্যাপ্টেনশিপের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ডায়েরীর প্রথম পাতায় লেখা আছে)

Congress 1916. Lucknow. December.

Captain—A. P. Sen.

Vice-Captain—Dr. Naziruddin and Pdt. Harkaran Nath Misra.

Lieutenant-40. Volunteers—360.

Distribution of Volunteers—Railway station.

Attendence in Camp on delegates :—

—Do—in house :—

Pandel on Congress days :—

President's house :—

Private houses where delegates are located :—

(তাঁর পরের পাতায়)

I. All volunteers will me t on :—(এর পরের অংশ খালি। মনে হয়, তারিখ লিখবেন ভেবেছিলেন—লেখিকা) to get instruction,

II. Dicipline :—(a) Volunteers must implicitly obey their Lieutenants Vice Captains and Captain (b) All volunteers must salute all Lieutenants, Vice Captains and Captain. (c) Duties may be transfered by Vice Captains and Captain.

তেমনি আদর করে অন্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতেও জানেন। তাই সবাই কাজ করার জন্য উন্মুখ, তৎপর।"

লখনৌয়ে কংগ্রেস অধিবেশনকে কেন্দ্র করে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। লখনৌ স্টেশনের সামনে, এখন যেখানে গান্ধীজীর মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে সেখানে অধিবেশনের জন্য প্যাণ্ডাল তৈরী করা হল। প্যাণ্ডালের এক দিকের ক্যাম্পে ডেলীগেটস্ ও অপর দিকে নেতাদের থাকবার জন্য সুচারু ব্যবস্থা হল। ব্যবস্থাপনায় রয়েছেন স্বয়ং সেন সাহেব।

এবার একে একে নেতাদের শুভাগমন হতে লাগল—কংগ্রেস সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদার, মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য তিলক, সরোজনী নাইডু, পোলাক ইত্যাদি।

লখনৌ কংগ্রেসের অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুরাটের অধিবেশনের পর নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থা শান্ত হয় নি।

১৯০৮ সালে নরমপন্থীরা এলাহাবাদে একটি সভা আহ্বান করেন এবং দুই পক্ষের মধ্যে মিটমাটের আশায় তাঁরা একটি সংবিধান রচনা করেন। কিন্তু চরমপন্থীরা তা গ্রহণ করতে পারেন নি। ফলে, উত্তেজনা ও মতান্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

লখনৌয়ে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হল অতুলপ্রসাদ অত্যন্ত আশান্বিত হয়ে উঠলেন, ভেবেছিলেন এবার হয়তো সব দ্বন্দ্বের শেষ হয়ে একটা বোঝাপড়া হবে।

এই সময়ে কংগ্রেসে জাতীয়তাবাদীরা যোগদান করেন এবং লখনৌয়ে কংগ্রেস অধিবেশনের সময় উহা প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদীদের করতলগত হয়।

এই কংগ্রেস অধিবেশনে অমল হোম যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় "কংগ্রেস বসার তিন দিন আগে লখনৌ গেলুম। অতুল কংগ্রেস কম্পাউণ্ডে তাঁবুতে বাস করছে। যোধপুরী পায়জামার ওপর খাকী রঙের ইউনিফর্ম কোট, মাথায় রাজপুত পাগড়ী। বুকে কর্ড দিয়ে বাঁধা হুইসিল, হাতে ছড়ি। ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন।..

"সেবার লখনৌ কংগ্রেসে গিয়ে বুঝলুম অতুল লখনৌবাসীর কত প্রিয়। সত্যি, তিনি লখনৌর মুকুটহীন রাজা ছিলেন। ধনী, দরিদ্র, এক্স্ট্রিমিস্ট, মডারেট, রাজা, নবাব, উকিল, অধ্যাপক, হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণী, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর অদ্ভুত প্রভাব। দেখলুম সামান্য টাঙ্গাওয়ালা অব্দি 'সেন

সাহেব'-কে জানে। কংগ্রেসের ভলেণ্টিয়াররা তাঁর অংগুলী হেলনে নিঃশব্দে আদেশ পালন করছে"।[২] কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারি গোকরণনাথ মিশ্র, বিশ্বেশ্বর নাথ শ্রীবাস্তব, মোসলেম লীগের সৈয়দ ওয়াজীর হোসেন সাহেব প্রত্যেকে এবং সকলেই 'ভাইসাহেব'-এর সংগে পরামর্শ না করে কোন কাজ করেন না। তিনি তাঁদের বন্ধু, মন্ত্রণাদাতা ও নেতা অথচ তাঁর ভূমিকা কেবলমাত্র ভলেণ্টিয়ার বাহিনীর অধিনায়ক।

"লখনৌ কংগ্রেস থেকে অতুলের চরিত্রের আর একটা দিক—তাঁর কর্মশক্তি, স্বদেশ প্রেম, লোকহিতৈষণা, বন্ধুবাৎসল্য দেখে মুগ্ধ হলুম।"[৩]

লখনৌয়ের কংগ্রেস অধিবেশন অতুলপ্রসাদকে নিরাশ করল। এর পরের বছর তিনি কংগ্রেসের সভ্যপদে ইস্তফা দেন।

পরে লিবার্য়াল ফেডারেশনে যোগদান করলেও অতুলপ্রসাদ দলাদলি, ক্ষমতালিপ্সা ও শত্রুতার অনেক উর্ধ্বে ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতামুক্ত ছিলেন।

যেদিন লখনৌয়ে প্রথম হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট্ হল সেদিন অতুলের কী আনন্দ। যখন শুনলেন তিলক বলেছেন—'I don't care how many seats in the legislative Mahamedans get,' তখন অতুল বার বার বলতে লাগলেন—'That exactly my view too.'

অমল হোম লিখেছেন, "First All India Social Service Conference কোলকাতায় করি। তাতে গান্ধীজীকে সভাপতি করার প্রস্তাব অতুলই আমাদের কাছে করেন। রাজনৈতিক মতান্তর সত্ত্বেও মহাত্মাজীর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা অতুল সহ্য করতে পারতেন না।"[৪]

॥ আঠাশ ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যেমন 'ভি ফর্ ভিক্‌ট্রি'-র প্রচলন হয় তেমনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 'আওয়ার ডে' ফাণ্ডের প্রচলন হয়েছিল।

২, ৩—অমল হোম—'স্মৃতিকথা' : "উত্তরা"।

৪—অমল হোম—'স্মৃতিকথা' : "উত্তরা"।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত বাঙালীরাও বালকবালিকাদের দিয়ে গানের আসর করে ও নাটক মঞ্চস্থ করে 'আওয়ার ডে' ফাণ্ডে-র জন্য টাকা তুলে দিয়েছিলেন।

সীতাপুরে 'আওয়ার-ডে' ফাঙশন্ করার আমন্ত্রণ এলো। অতুলপ্রসাদের বাংলোয় সবাই একত্র হলেন। পরামর্শ করে স্থির করা হল যে বঙ্গীয় যুবক সমিতির কন্সার্ট-পার্টির ঐকতানবাদন এবং বালকদের দ্বারা অতুলপ্রসাদের রচিত গান ওখানে গাওয়া হবে। গান নির্বাচন এবং তা শেখানোর ভার অতুল-প্রসাদ নিজেই নিলেন। সেই সব বালকদের মধ্যে আজকের বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল এবং আরো অনেকে ছিলেন। সে বৈঠকে অতুলপ্রসাদ তাঁর রচিত যে গানটি পড়ে ও গেয়ে শোনালেন সেটি হল :—

"হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,
হও উন্নত শির—নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান—হবে জয়"।…

বললেন, এবার কোলকাতায় থাকার সময় তিনি এই গানটি রচনা করেছেন।

এই উপলক্ষে আর একটি গানও অতুলপ্রসাদ শিখিয়েছিলেন, সেটি হল :—

"নমো বাণী বীণাপাণি, জগত-চিত্ত-সম্মোহিনী,
নমো বাদ-সংগীত-মাতঃ, ভারতী ভবতারিণী।"…

॥ উনত্রিশ ॥

লখনৌয়ে কংগ্রেস অধিবেশনের যজ্ঞপর্ব শেষ হল। কিছু দিন পরে সামীউল্লা বেগ হাইকোর্টের জজ হয়ে হায়দ্রাবাদে চলে গেলেন। অতুলপ্রসাদও কোলকাতায় ফিরে গেলেন। বাংলাদেশের সাহিত্যকুঞ্জে কিছুদিন ধরে গুঞ্জরণ শুনে ও শুনিয়ে তাঁর হৃদয়মন তখনো সেই ভাবে বিভোর হয়ে রয়েছে।

তবে লখনৌয়ে কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য এসে ও পুরনো সুহৃদবর্গের সংস্পর্শে এসে মন বিচলিত ; ওস্তাদী কণ্ঠে ঠুংরি-দাদরার সুর সম্প্রতি যা শুনে এলেন তার মুগ্ধকর হাতছানি উপেক্ষা করার নয়। তাছাড়া ফিরে আসার জন্য

সকলের সম্মিলীত অনুরোধ অবসর সময়ে মনকে উতলা করে বৈকি! সবার ওপর, একই জায়গায় স্বামী-স্ত্রী দুজনে রয়েছেন অথচ মুখ দেখাদেখি নেই বাংলাদেশের আবহাওয়ায় বড়ই দৃষ্টিকটু।

অতুলপ্রসাদ লখনৌয়ে ফিরে যাওয়াই সমীচীন বোধ করলেন। বন্ধুমহলে এ বার্তা জানাজানি হয়ে গেল। মনু-ডে ক্লাবের বন্ধুরা সকলে তাঁর ফ্ল্যাটে এসে জমা হলেন। তাঁদের মনভাব 'যেতে নাহি দিব'।

কিন্তু তবু যেতে দিতে হয়, সময়ের ঘূর্ণাবর্তে মানুষকে ঘটনাচক্রের সংগে পা ফেলে চলতেই হয়।

মন-ডে ক্লাবের বন্ধুরা একদিন তাঁকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানালেন; ভুরিভোজ হল। এবার বিদায়ের পালা, 'আবার দেখা হবে' এই আশ্বাস দিলেন। ভগ্নীপতি সুকুমার রায় এবং ডাঃ দ্বিজেন মৈত্র ভ্রাতা শিশিরকুমার ও অন্যান্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লখনৌয়ের উদ্দেশে রওনা হলেন।

সেটা ১৯১৭ সাল।

কিছুদিন পরে কোলকাতা থেকে পুত্র দিলীপকুমার এলেন। অতুলপ্রসাদকে বললেন, মার খুব শরীর খারাপ, অসুস্থ হয়ে শরীর এখন দিন দিন ভেঙে পড়ছে। মাকে এখানে নিয়ে এসো বাবা।

শুনে অতুলপ্রসাদ চিন্তিত হলেন। হেমকুসুমের বর্তমান স্বাস্থ্যের বিস্তারিত খোঁজ খবর নিলেন। বললেন, টাকা দিচ্ছি, মহেশকাকাকে বল তাঁকে নিয়ে এখানে চলে আসুন।

দিলীপকুমারের ইচ্ছা যে অতুলপ্রসাদ স্বয়ং চলুন; সে কথা জানালেন কিন্তু অতুলপ্রসাদের নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজে খুবই ব্যস্ত থাকায় দিলীপকুমারকে পরামর্শ দিলেন হেমকুসুমকে নিয়ে সত্বর এখানে চলে আসতে।

এই বছরই অতুলপ্রসাদ ব্যারিষ্টার হেমন্তকুমার ঘোষকে তাঁর জুনিয়র করে নেন। তারপর ১৯১৭ সাল থেকে—১৯৩৪, এই দীর্ঘ সতেরো বছর হেমন্তকুমার ছায়ার মত 'সেন সাহেবে'র সংগে কাজ করেছেন, তাঁর সংগে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং তাঁর বিপদে-আপদে সর্বদা ছোট ভায়ের মত পাশে পাশে থেকেছেন।

অতুলপ্রসাদ তাঁর কর্মজীবনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একাধিক আইনজীবীকে

তাঁর জুনিয়র হবার সুযোগ দিয়েছেন। অনেক অভিভাবক তাঁদের পুত্রদের জুনিয়র করে নিতে তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছেন। নিজের জুনিয়র করে নেওয়া ব্যতীত উদারহৃদয় অতুলপ্রসাদ কত লোককে যে তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি করিয়ে দিয়েছেন তার হিসাব নেই।

অতুলপ্রসাদের স্নেহধন্য জুনিয়রদের অনেকে পরবর্তী জীবনে কৃতকার্য ও ধনবান হয়েছেন; কেউ কেউ আইন বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, আবার কোন কোনজন হাইকোর্টের জজ পর্যন্ত হয়েছেন।

•

দিলীপকুমার কোলকাতা গিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে হেমকুসুমকে নিয়ে লখনৌ ফিরে এলেন।

আসতে আসতে ক্লান্ত, শীর্ণ হেমকুসুম রাস্তার দুধার দেখেন আর ভাবেন, লখনৌ তেমনিই আছে। কেশরবাগে আসতেই যেন কী পাওয়ার আনন্দে তাঁর দুচোখ চিকচিক করে ওঠে। তারপর······সেই বাড়ি, সেই ঘর, সেই যেন বিভিন্ন রঙের আল্পনা দেওয়া অতুলপ্রসাদের গোলাপ বাগান, গন্ধ কত পরিচিত। তিনি কি কোনদিন কল্পনা করেছিলেন এই পরিবেশ ছেড়ে দূরে চলে যাবেন। দীর্ঘশ্বাসে তাঁর বুক ভরে ওঠে। কিন্তু নিজের ঘরটিতে পরিচিত পরিবেশে পেঁছে হেমকুসুম খানিক পরে ভুলেই যান যে তিনি কোন দিন এখানে অনুপস্থিত ছিলেন; ভুলে যান তাঁর শরীর এখনো দুর্বল। আবার তেমনি মহা উৎসাহে সকলের খবরাখবর নিতে, সংসার করতে শুরু করে দেন যেমন পুরনো দিনে করতেন।

অতুলপ্রসাদের বিশেষ অনুরাগীরা ইচ্ছে করলে যে কোন সময় তাঁর বাড়ির যে কোন অংশে এমন কি শোবার ঘরেও চলে যেতে পারতেন।

অরুণপ্রকাশ এসে দেখলেন হেমকুসুম বৌঠান স্নান সেরে খাটের ওপর শুয়ে আছেন। পাশেই একটি চেয়ারের ওপর অতুলপ্রসাদ বসে আছেন। দুজনে এমন হেসে হেসে অন্তরঙ্গভাবে গল্প করছেন যে দেখলে মনে হবে না এঁদের মধ্যে কোনদিন মতান্তর বা কলহ হয়েছে।

অরুণপ্রকাশকে দেখে অতুলপ্রসাদ উৎসাহিত হলেন। কোলকাতায় থাকাকালীন রচিত গানগুলি অরুণপ্রকাশের সামনেই হেমকুসুমকে গেয়ে শোনালেন।

অতুলপ্রসাদ একটি কেস-উপলক্ষে সীতাপুরে এসেছেন ; ডাকবাংলোয় আছেন। সংগে রয়েছেন জুনিয়র হেমন্তকুমার।

সন্ধ্যের পর ভোজনপর্ব সেরে দুজনে খোলা বারান্দায় দুটি চেয়ারে বসলেন। যে কেস নিয়ে এসেছেন তাকেই কেন্দ্র করে আলাপ আলোচনা হতে থাকল।

হঠাৎ সামনের আকাশ তাল তাল কালো মেঘে ছেয়ে গেল ; আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে যেন সুদৃঢ় এক ব্যবধান রচিত হল। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগল। শেষে সাদা পুঁতির মালার মত গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়ে গেল।

আবহাওয়া পরিবর্তনের সংগে সংগে অতুলপ্রসাদের কথা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল। ঝিমঝিম করে বৃষ্টি পড়তে অতুলপ্রসাদ যেন আপনার মাঝে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। হেমন্তকুমার ভাবলেন, উনি বোধ হয় কোন গভীর বিষয়ে চিন্তামগ্ন তাই আর কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেলেন। তবে শোবার আগে অতুলপ্রসাদের খোঁজ করতে এলেন। তিনি তখন তাঁর ঘরে। দরজা খোলা দেখে তাঁকে তা বন্ধ করার কথা বলতে এলেন। এসে দেখলেন ঘরের কোণে টেবিল-ল্যাম্পের নিচে বসে অতুলপ্রসাদ খস খস করে লিখছেন। মাঝে মাঝে তাঁর গলায় সুর গুনগুনিয়ে উঠছে। পরে একটু জোরে গেয়ে উঠলেন—

বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখি পাতে।
আমিও একাকী, তুমিও একাকী
আজি এ বাদল-রাতে।...

অতুলপ্রসাদ লখনৌয়ে ফিরে এসে চায়ের টেবিলে হেমকুসুমকে গানখানি গেয়ে শোনালেন। হেমকুসুম সে গান নিজের কণ্ঠে তুলে নিলেন।

একটু পরে অরুণপ্রকাশ এলেন। তিনিও অতুলপ্রসাদের কণ্ঠে গানটি শুনলেন। পরে হেমকুসুম পিয়ানো বাজিয়ে গানটি অরুণপ্রকাশকে গেয়ে শোনালেন।

অতুলপ্রসাদের গান হেমকুসুমের গলায় অপূর্ব শোনাত।

এর কিছুদিন পর প্রথমে হিরণ ও পরে মা, অন্য দু বোন—কিরণ ও প্রভা তাঁদের সন্তানসন্ততিসহ লখনৌয়ে এলেন।

হিরণ ডাক্তার রামস্বামী আয়েঙ্গারের, কিরণ আনন্দমোহন বসুর পুত্র শরৎচন্দ্র বসুর এবং প্রভা ডাক্তার রামস্বামী আয়েঙ্গারের ভ্রাতুষ্পুত্র, শেষাদ্রি আয়েঙ্গারের পত্নী ছিলেন।

মা ও বোনেরা আসার পর অতুলপ্রসাদের পারিবারিক জীবন আবার জটিলতাপূর্ণ হয়ে উঠল এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে দেখা দিল বিরক্তি ও তিক্ততা।

॥ তিরিশ ॥

লখনৌ কংগ্রেস অধিবেশনে নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিভেদ নিশ্চিত হয়ে ওঠে।

মন্টফোর্ড রিফর্মের পর দু দল সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। ১৯১৮ সালে বম্বে অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় লিবার‍্যাল ফেডারেশন গঠিত হয়।

অতুলপ্রসাদ ঐ ফেডারেশনের সভ্য হন।

১৯১৯-এর অ্যাক্টে গভর্ণমেন্ট যে সুবিধা দিয়েছিল নরমপন্থীরা তা সমর্থন করায় বিরুদ্ধ দলের দ্বারা ধিকৃত হন।

১৯১৯ সালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ লখনৌ এলেন। সহরে যেন সাড়া পড়ে গেল। অতুলপ্রসাদ তাঁকে সসম্মানে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। তাঁর পাশে বসে অতুলপ্রসাদ কল্পনায় যেন তাঁর কৈশোরকালে ফিরে গেলেন। মনে পড়ে গেল সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় স্টীমার যাত্রার কথা, কী প্রেরণাভরা কথায় তাঁর মনে স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছিলেন; চোখের সামনে এক নতুন জগৎ তুলে ধরেছিলেন।

রাষ্ট্রগুরুর ভাষণের ব্যবস্থা হল। অভ্যর্থনা করে তাঁকে রাফায়াম্ ক্লাবে আয়োজিত সভায় নিয়ে যাওয়া হল। সভাপতির আসনে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী বিরাজমান।

অতুলপ্রসাদ সুরেন্দ্রনাথের গলায় পুষ্পমাল্য দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন।

সুরেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়েছেন বক্তৃতা দিতে; সভা নিস্তব্ধ। একমনে সকলে তাঁর ভাষণে মনোযোগী; এমন সময় একজন অবাঙ্গালী তরুণ 'ট্রেটর, ট্রেটর

টু দি কানট্রি' বলে চিৎকার করে উঠে ভয়ে পালিয়ে গেল, সুরেন্দ্রনাথের স্বর নরম হল এবং তিনি চ্যালেঞ্জ করলেন, যে 'ট্রেটর' বলে তাঁকে সম্বোধন করলেন তাঁকে তিনি সম্মুখে প্রশ্ন করতে চান; কিন্তু সে তখন পালিয়ে গেছে। "মালব্যজী আসন থেকে উঠে নত হয়ে সভার সামনে অ্যাপলজি চাইলেন।[১]" অতুলপ্রসাদ দুঃখিত, লজ্জিত। জগৎনারায়ণ মোল্লা এবং বিশ্বেশ্বর নাথও লজ্জিত হলেন।

এরপর এলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯১৯-এর এক সকাল। অতুলপ্রসাদ কোর্টে যাবার জন্য তোড়জোড় করছেন, ৯-টা বেজে গেছে। স্নানের ঘরে গিয়ে যদি গানে পেয়ে বসে তবে সময়ে কোর্টে পৌঁছন মুশকিল হবে। ঠিক এমনি সময়ে ভৃত্য এসে অতুলপ্রসাদকে খবর দিলেন যে, একজন মৌলবী সাহেব আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

মৌলবী শুনে অতুলপ্রসাদ তাড়াতাড়ি দেখা করতে এলেন,'আদাব্ আর্জ' জানালেন। জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর আগমনের কারণ।

মৌলবীর পরনে ধুতি, গায়ে চাপকান, মাথায় ফেজ টুপি, চিবুকের কাছে অল্প দাড়ি। উজ্জ্বল চোখে অতুলপ্রসাদকে দেখছেন, ঠোঁটের কোণে যেন একটু চাপা হাসি।

অতুলপ্রসাদ হেরে গেলেন। শরৎচন্দ্র মাথার ফেজ খুলে হাসতে হাসতে বললেন, আমায় চিনতে পারলেন না তো?

অতুলপ্রসাদও হাসতে আরম্ভ করেছেন। হাসতে হাসতে খোঁজ করলেন আপনি কবে থেকে দাড়ি রাখতে শুরু করেছেন?

সেবার শরৎচন্দ্র অতুলপ্রসাদের অতিথি হন নি, সেজন্য অতুলপ্রসাদের আক্ষেপের সীমা ছিল না। সে আক্ষেপ মেটাতে শরৎচন্দ্র রোজ তাঁর বাংলোয় আড্ডা দিতে আসতেন।

ঐ বছরই অতুলপ্রসাদ দ্বিতীয়বার লখনৌ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান পদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়াবার মনস্থ করলেন। তাঁর অনুরাগী, ভক্তরা তাঁর জন্য প্রচার কার্য শুরু করে দিলেন।

কিন্তু ১৯১১-১২-র লখনৌ ও ১৯১৯-এর লখনৌর আবহাওয়ার তাপযন্ত্রে

১—সত্যকুমার মুখোপাধ্যায়—ডায়েরী।

অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। অতুলপ্রসাদ তখনো ধনী, মানী, দাতারূপে সারা লখনৌ সহরের নমস্য ; 'সেন সাহেব' বা 'ভাইদাদার' নামে তখনো সবায়ের মাথা নত হয়ে যায়। "কিন্তু সেদিন ব্যক্তির যোগ্যতার মানদণ্ড ছিল রাজনীতি"।[২]

তখন কংগ্রেসের দল সংখ্যাগরিষ্ঠ ও জনপ্রিয়। ফলে কংগ্রেসওয়ালাদের তরফ থেকে সেন সাহেবের নামে আপত্তি উঠল। তিনি বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতে পারতেন যদি পার্টি বদল করতে রাজী থাকতেন।

মেরুদণ্ডহীন সুবিধাবাদীর দল সব দেশে, সব কালেই আছে। লখনৌয়ে সে সময় অনেকেই সুবিধা বুঝে পার্টি বদল করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আদর্শবাদী, দৃঢ় চরিত্রের মানুষ অতুলপ্রসাদের কাছে তা ছিল অত্যন্ত ঘৃণিত প্রস্তাব। লিবার‍্যাল ফেডারেশনের সভ্যরূপেই তিনি মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের নির্বাচনে দাঁড়ালেন। তাঁর অনুরাগীরা আপ্রাণ চেষ্টা করলেন, "তখন নির্মল চন্দ্র দে, শম্ভুশরণ চৌধুরী, সত্যকুমার মুখোপাধ্যায়ের সংগে আমিও তাঁর জন্য কাজ করেছিলাম। কিন্তু সে বছর তিনি সফলকাম হন নি। রাজনীতি এমনিই বস্তু"।[৩]

অতুলপ্রসাদ কিন্তু সব রকম পার্টি পলিটিক্সের উর্ধ্বে ছিলেন। লিবার‍্যাল ফেডারেশনের সভ্য হলেও তিনি স্বভাবে নিরপেক্ষ ছিলেন। আদর্শগত ব্যাপারে পার্টি বদল করলেও যখনি যেখানে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছে তিনি যোগ দিয়েছেন। ১৯১৭-য় কংগ্রেসের সভ্যপদ ত্যাগ করেন কিন্তু পরের বছরই দিল্লী কংগ্রেসে তিনি যোগদান করেন। সে কংগ্রেসে অমল হোমও যান। তাঁর কথায়—"পেঁৗছে খবর পেলুম অতুল এসেছেন···বড় ক্লান্ত, শুয়ে পড়েছেন।"

"আমি তবু কার্ড পাঠালুম।

"অতুল তখুনি বেরিয়ে আমায় ঘরে নিয়ে গেলেন। দুটি খাটের একটিতে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী শুয়ে। একটি চেয়ারে আমায় বসিয়ে নিজে বিছানায় বসলেন। খাওয়া হয়নি শুনে তখুনি খাবার আনালেন।···ওভার কোট খুলে ফায়ার প্লেসের কাছে রেখেছিলুম। উঠলে সেটি নিয়ে নিজে হাতে আমায়

২—বিজনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়—চিঠি।

৩—বিজনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়—চিঠি।

পরিয়ে দিলেন এবং হাত দিয়ে দেখলেন গরম হয়েছে কিনা ও দিল্লীর শীতের পক্ষে যথেষ্ট কিনা।

"...পাঞ্জাবে জঙ্গী আইনের অত্যাচারে তিনি বিষম মর্মাহত হয়েছিলেন হাণ্টার কমিটির তদন্তের ফলে যখন সত্য ঘটনা, যা চাপা ছিল, বের হতে লাগল তখন তিনি আমাকে যে একটি চিঠি লিখে ছিলেন, তাতে মডারেট মনোবৃত্তির এতটুকু পরিচয় ছিল না। সত্যিই তিনি মতামতে মডারেট হলেও স্বভাবে মডারেট ছিলেন না। আমার মনে হয় গোখলের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা খুব বেশী রকম থাকাতে তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর অনুগামী ছিলেন।

"১৯২০ সালে মতিলাল নেহেরুর Independent' কাগজে যোগ দিলুম। এ কাগজ তখন Extremist-দের ভরা পালে চলছে। বিপিনবাবু সম্পাদক। রঙ্গ আয়ার ও আমি তাঁর দুই সহকারী। মডারেটদের মুণ্ডপাত করা আমাদের নিত্যকর্ম, বিশেষতঃ ইউ. পির. মডারেট লীডারদের। চিন্তামনির ওপর রাগটাই সবচেয়ে বেশী।

"এ হেন অবস্থায় একদিন জুন মাসের দুপুরে আফিসের মধ্যে মডারেট লীডার অতুল এসে হাজীর, সহাস্য বদন তাঁর বিকশিত। সাব এডিটর বিস্মিত, রঙ্গ আয়ার একটু অপ্রস্তুত, কোথাও যেন বাধছে।

"সেদিন একটা মামলার কাজে অতুলপ্রসাদ এলাহাবাদে এসেছেন, রাত্তিরে চলে যাবেন। বললেন, আজ শনিবার, কাল'ত তোমার ছুটি, আজ চল আমার সঙ্গে লখনৌ ; মোটরে যাব রাত্তিরে। তিনি সাপ্রুর অতিথি। আমি যেতে সাপ্রু ঠাট্টা করে বললেন, 'মডারেটদের বাড়িতে কি Indipendent-দের আসতে আছে ?' অতুল হেসে বললেন, 'তাই তো আমি নিজেই গিয়েছিলাম।'

"চিন্তামনি ও আমায় নিয়ে মোটরে করে চললেন। চিন্তামনি গম্ভীর। অতুল তাঁকে আমাদের দুজনের মাঝখানে বসালেন ও সারা রাস্তা খোসগল্প করে আমাদের এমন সহজ করে দিলেন যে দুদিন অতুলের বাড়িতে এক সঙ্গে থাকতে আমরা কেউ কারুর কাছে কণ্ঠাবোধ করি নি। এ কৃতিত্ব অতুলেরই।"[৪]

৪—অমল হোম—"স্মৃতিকথা" : 'উত্তরা'।

॥ একত্রিশ ॥

অতুলপ্রসাদ কোলকাতা থেকে ফিরে এলে সভাপতির আগমনে বঙ্গীয় যুবক সমিতির সভ্যরা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

অতুলপ্রসাদ তখন কোলকাতায়। বঙ্গীয় যুবক সমিতির খেলোয়াড়রা কোলকাতায় হকি খেলতে গিয়েছিলেন। পর পর তিন বছর ওঁরা বিখ্যাত বেটন কাপ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে চ্যামপিয়নের গৌরব অর্জন করেন। অতুলপ্রসাদের সেজন্য কী আনন্দ, কত গর্ব।

সমিতির হকি খেলোয়াড়রা সারা ভারত ঘুরে হকি খেলেছেন। তার জন্য যা খরচ হয়েছে তার সিংহ-ভাগ অতুলপ্রসাদ খুব খুশি মনেই বহন করেছেন। কিশোর, তরুণদের খেলাধূলায় তাঁর খুব সমর্থন ও উৎসাহ; নিয়মিত খেলাধূলো করলেই না শরীর মজবুৎ হবে।

কণ্ঠশিল্পীদের যেমন তিনি গানে উৎসাহ দিতেন, উৎসাহিত হয়ে নিজেই গান শেখাতেন, বঙ্গীয় যুবক সমিতির যন্ত্রশিল্পীবৃন্দকে যেমন তিনি বাজনায় উৎসাহিত করতেন, নিজের বাড়িতে ডেকে তাঁদের বাজনা শুনতেন, তারিফ করতেন তেমনি যাঁরা খেলোয়াড়, তিনি তাঁদের উপদেশ দিয়ে অর্থ দিয়ে সর্বদা উৎসাহিত করতেন। কিশোর তরুণরা স্বাস্থ্য চর্চা করে, খেলাধূলো করে স্বাস্থ্য ভাল রাখে এ দিকে তিনি দৃষ্টি রাখতেন।

উত্তর প্রদেশে তখন উর্দু ভাষার একাধিপত্য। আর কোন ভাষার কথা যেন ভাবাই যায় না। উর্দুতে মুসায়েরা শুনে অতুলপ্রসাদ আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠতেন।

তাঁরই কাছে কম্প্র বক্ষে নম্র পায়ে একটি তরুণ এলেন। তরুণটি তখন আই, এ, ক্লাশের ছাত্র, হিন্দী ভাষার পরম অনুরাগী। ইচ্ছে, হিন্দী ভাষা চর্চার ও প্রসারের একটি ব্যবস্থা হোক। কিন্তু সেজন্য তিনি কোন হিন্দী ভাষীর নিকট না গিয়ে সোজা পৌঁছে গেলেন সেন সাহেবের কাছে। অবাঙালী ঐ তরুণ ভাল রকম জানেন সেন সাহেব কত নিরপেক্ষ, অন্যের প্রচেষ্টায় তাঁর কত উৎসাহ।

সেন সাহেবের কাছে পৌঁছে যুবকটি তাঁর পরিচয় দিলেন; নাম বললেন

গোপালচন্দ্র সিন্‌হা। হিন্দী ভাষার একটি কেন্দ্র স্থাপন করা তাঁর একান্ত ইচ্ছা, এও জানালেন যে, সেন সাহেবকে এই কেন্দ্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও পরামর্শ-দাতারূপে পেতে চান। সেন সাহেবের সম্মতি ও উৎসাহ পেলে তিনি এ-কাজে অগ্রসর হতে পারেন।

সব শুনে সেন সাহেব এক কথায় রাজী। তিনি জানেন তরুণদের কিভাবে উৎসাহ দিয়ে কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হয়। উর্দু ভাষা তাঁর খুবই ভাল লাগে, কিন্তু হিন্দী ভাষারও চর্চা হওয়া দরকার।

অতুলপ্রসাদের পরামর্শে, উপদেশে ও গোপালচন্দ্র সিন্‌হার উৎসাহ ও পরিশ্রমে 'হিন্দী সভা' স্থাপিত হল এবং তার জন্য একটি গ্রন্থাগারও তৈরী হল। সে বৎসর ছিল ১৯২০ সাল। প্রারম্ভেই বেশ কিছু সভ্য পাওয়া গেল। সেন সাহেব হলেন সভাপতি, আর গোপালচন্দ্র সেক্রেটারী। প্রায় প্রতি সপ্তাহে হিন্দী সভার বৈঠক ডাকা হত। সেই বৈঠকে সেন সাহেব উপস্থিত থাকতেন এবং খুবই আগ্রহ দেখাতেন। এমন এক আধবারই হয়েছে যে তিনি বিশেষ কোন কাজের চাপে উপস্থিত থাকতে পারেন নি।

বৈঠকে কবিতা পাঠ, আলোচনা ইত্যাদি হত। সভ্যরা কবিতা পাঠ করতেন এবং সেন সাহেব তাঁর স্বরচিত বাংলা কবিতা পাঠ করে সভ্যদের শোনাতেন।

'তাঁর বাংলা ভাষা এত সরল ছিল যে আমরা তাঁর কবিতা সম্পূর্ণ বুঝতে পারতুম, বুঝে আনন্দ পেতুম। ওঁর বলবার ঢঙ, প্রকাশভঙ্গি বড় সুন্দর, বড় হৃদয়গ্রাহী ছিল।

কবিতা পাঠ ছাড়াও সেন সাহেব হিন্দী ভাষা প্রসার সম্বন্ধেও বলতেন। আর বিস্তারিতভাবে বোঝাতেন যে মৌলিক বাংলার সঙ্গে হিন্দী ভাষার সামান্যই তফাত, বুঝতে কোন অসুবিধা নেই।

'সেন সাহেবের মত মানুষ হয় না। তাঁর স্বভাব বড় মধুর ছিল, বড় সরল, স্নেহশীল ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন।'[১]

১—অতুলপ্রসাদের নাম শুনে অবসরপ্রাপ্ত জজসাহেব গোপালচন্দ্র সিন্‌হার মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে গেল। বললেন, সেন সাহেবের জন্মশতাব্দী পালিত হচ্ছে শুনে সুখী হলুম। অতুল-প্রসাদের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে বললেন, আমার বাবা বড় উকিল ছিলেন, কিন্তু আমি পাশ করার পর বাবা বললেন, আমার নয়, সেন সাহেবের জুনিয়র হয়ে তুমি শিক্ষানবীশী কর। আমি ১৯২০ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত তাঁর জুনিয়র ছিলুম। পরে সরকারি চাকরিতে অন্যত্র চলে যাই। তবে লখনৌয়ে যখনি আসতুম তাঁর সঙ্গে দেখা করতুম, তাঁর গানের আসরে গান শুনতুম। দেখা করতে গেলে তিনি খুব খুশি হতেন।

দরকার মত সেন সাহেব হিন্দী সভার জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেছেন।

এর পর থেকে অন্যান্যদের মত গোপালচন্দ্র সেন সাহেবের উপাসনা সভায় এবং সান্ধ্যবৈঠকে যোগ দিতে আসতেন। তাঁর মত আরো নতুন নতুন যুবকেরা সান্ধ্যবৈঠকে আসতেন—ব্যারিস্টার আলী জাহির, ব্যারিস্টার সয়ীদ হাসান ইত্যাদি। উকিল হরগোবিন্দ দয়াল শ্রীবাস্তব এবং মমতাজ হোসেনের পুত্র ব্যারিস্টার সিরাজ হোসেন এঁরা তো আসতেনই। মমতাজ হোসেন সম্প্রতি মারা গেছেন। প্রিয়বন্ধু বিচ্ছেদে অতুলপ্রসাদ খুবই মর্মাহত।

॥ বত্রিশ ॥

সত্যকুমারের চিঠিতে অতুলপ্রসাদ খবর পেলেন যে তাঁর কন্যা ও কনিষ্ঠ সহোদর কয়েকমাসের মধ্যে মারা গেছেন। অতুলপ্রসাদ এ সংবাদে খুবই দুঃখিত হলেন এবং সান্তনা দিয়ে সত্যকুমারকে চিঠি দিলেন—

স্নেহাস্পদেষু

সত্যকুমার, তোমার শোকাবেগময় পত্রখানি পাইয়াছি ; কি যে লিখিব জানি না। তাঁর নিয়ম ও অভিপ্রায় বুঝি না ; যতদিন দুঃখের অতীত না হওয়া যায় ততদিন দুঃখ সহ্য করিতে হইবে এই বুঝি। যে হস্ত আঘাত করে সে হস্তই ধরিয়া থাকা ছাড়া আর উপায় নাই। তিনিই ক্রমে ক্রমে তোমাদিগকে সান্তনা দিন এই প্রার্থনা করি। তোমার পিতাঠাকুর ও মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইও। তোমরা দুজনে আমার স্নেহসম্ভাষণ নিও। অপর পৃষ্ঠায় সে গানটি পাঠাইতেছি।

তোমার

অতুলদাদা

অপর পৃষ্ঠায় অতুলপ্রসাদের পাঠান গান—

"দিয়েছিলে যাহা গিয়াছে ফুরায়ে
ভিখারীর বেশ তাই।
ফুরায় না যাহা এবার সে ধন
তোমার দুয়ারে চাই।

সুখ আমায় দেয়না অভয়,
দুঃখ আমারে করে পরাজয় ;
যত দেখি তত বাড়িছে বিস্ময়
যাহা চাই তাহা হারাই।
ভবের মেলায় কতই খেলনা,
ফিরিলাম তবু সাধ ত গেল না ;
ঘাটে এসে দেখি কিছু নাই বাকি
কে দিবে তরীতে ঠাঁই।
দাও হে বিশ্বাস দাও হে ভকতি,
বিশ্বের হিতে দাও হে শকতি ;
সম্পদে বিপদে তব শিবপদে
স্থান যেন সদা পাই।

॥ তেত্রিশ ॥

সে ১৯২০-র কথা, কাশী থেকে সুরেশ চক্রবর্তী 'প্রবাস জ্যোতি-র অনুষ্ঠান পত্র'কে পতাকা করে লখনৌয়ে অতুলপ্রসাদের সংগে সাক্ষাৎ করতে এলেন। সাহিত্যরথী শরৎচন্দ্র বলে দিয়েছেন, 'লক্ষ্ণৌ গিয়ে এ, পি, সেনের সংগে দেখা কর…'।

সুরেশ চক্রবর্তী তখন বয়সে যুবক, বাংলা সাহিত্য-সেবায় অদম্য উৎসাহী। লখনৌয়ে আসার উদ্দেশ্য—'প্রবাস জ্যোতি'-র প্রচার এবং সেজন্য অতুলপ্রসাদের সাহায্য।

কালীকৃষ্ণবাবু সুরেশ চক্রবর্তীকে সংগে নিয়ে সকালবেলায় অতুল ভবনে এলেন। বারাণ্ডায় তাঁদের যেখানে বসতে দেওয়া হল তার পাশেই বাথরুম। জলের আওয়াজের সংগে সংগে মিষ্টি গলায় গুণ গুণ সুরে গান ভেসে আসছে—

হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে—

আধঘণ্টা পরে অফিস-ঘরে অতুলপ্রসাদের সংগে সুরেশ চক্রবর্তীর প্রথম সাক্ষাৎ হল। শালপ্রাংশু নাতিস্থূল, স্বভাব-গম্ভীর মানুষটির সংগে পরিচিত হলেন এবং আসার কারণ ব্যক্ত করলেন।

প্রবাসজ্যোতি অনুষ্ঠান পত্রটি হাতে দিতেই অতুলপ্রসাদের দুচোখ উজ্জ্বল হল এবং মুখে এমন এক আনন্দের আভাষ ফুটে উঠল যেন তিনি এমনি একটি বাংলা পত্রিকার জন্য অনেকদিন ধরেই অপেক্ষা করছিলেন।

লখনৌ থেকে পত্রিকার জন্য কিছু গ্রাহক সংগ্রহের কি করা যায় পরামর্শ চাইলে অতুলপ্রসাদ দুটি চিঠি লিখে সুরেশ চক্রবর্তীর হাতে দিলেন। একটি চিঠি হরিনফর বন্দ্যোপাধ্যায়কে ও অপরটি অন্য একজনকে লেখা।

অতুলপ্রসাদের বিশেষ অনুরাগী পাঁচ-ছ জন যুবক ছিলেন যাঁদের বলা যায় অতুলপ্রসাদের আজ্ঞাধারী; তাঁদের কাছে অতুলপ্রসাদের ইচ্ছাটুকু জানান মাত্র কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। অতুলপ্রসাদ যাঁদের নামে দুটি চিঠি লিখে দিয়েছিলেন তাঁরা ওঁদেরই দুজন ছিলেন।

আশাতীত গ্রাহক সংগ্রহ করে সুরেশ চক্রবর্তী অতুলপ্রসাদের নিকট বিদায় নিতে এলেন। মনে পড়ল শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'ওঁর কাছ থেকে লেখাটেখা চেয়ে নেবে।' কবি অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে সুরেশ চক্রবর্তীর তখন কোন ধারণাই ছিল না। আপ্যায়িত করার জন্য আব্দারের সুরে বললেন আপনাকে লেখা দিতে হবে।

অতুলপ্রসাদ একটি পুরনো খাতা তাঁকে ধরে দিলেন। তিনি তার থেকে দুটি গান বেছে লিখে নিলেন :—

"আ মরি বাংলা ভাষা"···

"হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে"···

অতুলপ্রসাদ গান দুটি দেখলেন এবং খুশি হলেন। খুশি মনে সুরেশ চক্রবর্তী বিদায় নিলেন।

॥ চৌত্রিশ ॥

নাটক শেষ হয়ে যাবার পর শূন্য মঞ্চ, পর্দা, দৃশ্যাবলী, পোশাক ইত্যাদি অবহেলায় পড়ে থাকে।

লখনৌয়ে নবাবী যুগ শেষ হয়ে গেলেও দীর্ঘদিন ধরে নবাবী বিলাস-ব্যসন, জমি আঁকড়ে পড়ে থাকা বেলা-শেষে রোদের মত এদেশের মানুষের মনের তলায় ছুঁয়ে ছিল। আলবোলার নল মুখে লাগিয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে আড্ডা দিয়ে

সময় কাটান, কানে আতর মাখা তুলো গুঁজে বাঈজীর গান শোনা বা সাধারণ গোসলখানায় রমণীর রমণীয় হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে স্নান করার কল্পনা তখনো লখনৌবাসীর মনকে উতলা করত বৈকি।

তবে প্রথমটি ছাড়া বাকি দুটি সাধারণ স্তরের মানুষের কাছে দুরূহ ছিল। অবশ্য কাঁচা পয়সা উপায় করতে পারলে দু নম্বর নবাবী ও কাঁচা পয়সার পরিমাণ আকাশ পথে দৌড় দিলে তিন নম্বর নবাবীতেও কেউ কেউ পা বাড়াতেন।

লখনৌ সে যুগে উকিল ডাক্তারদের স্বর্গরাজ্য ছিল—বিশেষ করে উকিলদের। আবার স্বর্গরাজ্যে বিত্তবানদের সংগে একই সারিতে উঠলে এবং বাড়িতে অতিথি এলে তখন তাঁকে নবাবী কায়দায় অভ্যর্থনা করতে হত; নিমন্ত্রণ করে বাড়ি এনে অতিথির সংগে ঢালাও পানের ব্যবস্থা রাখতে হত। তারপরও অতিথির হুঁশ থাকলে তিনি কামিনীর নূপুর নিকণ শুনতে চাইতেন। তাঁর জন্য নূপুর ধ্বনির ব্যবস্থা হলে গৃহস্বামীও সে রসে বঞ্চিত হবেন না কাজেই, সানন্দে সে ব্যবস্থাও হত, তবে সাবধানে; এবং বাঈজী কণ্ঠের মধুপান করে ফেরার পথে একে অপরকে বলতেন, আমি যে এসেছিলুম, দেখ ভাই, কেউ যেন না জানতে পারে।

নবাবের দেশে পুরুষরা যেখানে নবাবী চালে চলতেন নবাব-হারেমের মত তাঁদের অন্দর মহল অসূর্যম্পশ্যা থাকত। এমনি ভাবে গড়ে উঠেছিল তখনকার লখনৌয়ের শ্রেণীকেন্দ্রিক রক্ষণ-শীল পরিবার।

১৯২০ সালে নতুন করে পশ্চিমী হাওয়া বইল, শুরু হল লখনৌ বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনে প্রাথমিক আয়োজন।

লর্ড ক্যানিং ১৮৬২ সালে মারা যান। তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে তালুকদাররা ক্যানিং ইন্স্টিটিউট নামে একটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। সেখানে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ান হত।

১৯২১ সালে লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয় এবং সে যাত্রার প্রস্তাবক হিসাবে মামুদাবাদের নবাবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং তাঁকে সমর্থন জানান অন্যান্য তালুকদারেরা আর সেনসাহেব।

এবার প্রশ্ন ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় ভবন হবে কোথায়। তারও সমাধান হল। চঞ্চলা তরুণী 'গোমতীর' ওপারে লখনৌয়ের বিগত নবাব নাসিরুদ্দিন হায়দারের বিলাস-কুঞ্জ; তাকেই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নেওয়া যেতে

পারে। তার জন্য টাকা চাই। সেন সাহেব এক থোকে দশ হাজার টাকা দান করলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। গঠিত হল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরি সমিতি। অতুলপ্রসাদ তার একজন সদস্য নির্বাচিত হলেন এবং প্রধান পরামর্শদাতাও।

"সতেরোই জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষা দেওয়া শুরু হল"।[১] তার আগেই এলেন এক ঝাঁক প্রতিভাধর অধ্যাপকের দল—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত; পরে শ্রীবিনয়েন্দ্র দাসগুপ্ত, শিল্পী অসিতকুমার হালদার প্রভৃতি।

নদীর ওপারের শিক্ষিত প্রোফেসরদের এপারের লোকেরা সন্দেহের চক্ষে দেখেন, যেন কমল বনে শ্বেতহস্তী প্রবেশ করেছে। উচ্চ শিক্ষিত আধুনিক, আবার অনেকে বিলেৎ ফেরত, কে জানে কেমন হবে। আবার সমীহও করেন।

ওপারের লোকদের ভাবনা, বনেদী, রক্ষণশীল, নবাবী শহরের আদব-কায়দায় অভ্যস্থ ব্যক্তিরা না জানি কেমন হবে।

গোমতী নদী যেন দু দলের মাঝখানে সুস্পষ্ট বিষুবরেখা।

অতুলপ্রসাদ তাঁর উদারতার বন্যায় সব সীমারেখা মুছে দিয়ে দু দলকে তাঁর স্নেহের বন্ধনে একত্র করলেন, তাঁর বৈঠকখানা সবার মিলনে তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল। পশ্চিমী হাওয়া এপারে রক্ষণশীল অংশেও বইতে শুরু করল। এপারের বাঙালী বন্ধু, ভক্তরা তো আসতে লাগলেনই, ওপারের জ্ঞান চক্রবর্তী, রাধাকুমুদ, রাধাকমল, নির্মল সিদ্ধান্ত, ধূর্জটিপ্রসাদও আসতে লাগলেন। বুদ্ধিতে, বাচনে, গানে ধূর্জটিপ্রসাদ একটি অপূর্ব চরিত্র। অতুলপ্রসাদের তিনি প্রিয় সংগী হয়ে উঠলেন। ধূর্জটিও অতুলপ্রসাদের পরম ভক্ত, গুণমুগ্ধ। তাঁর নিজের ভাষায় "তিনি আমাদের সকলেরই 'অতুলদা'। লখনৌয়ের সেরা ব্যারিস্টার, তাঁর বিপুল সম্পত্তি তিনি দু' হাতে খরচ করতেন গরীব দুঃখীর জন্যে। সারা শহর তাঁর গুণমুগ্ধ"।[২]

লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর বাঙালী প্রোফেসরবৃন্দের আগমন এবং

১—লখনৌ বিশ্ববিত্তালয়ের "রৌপ্য জয়ন্তী রিপোর্ট"।

২—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—"সংগীত স্মৃতি"ঃ 'পরিচয়'।

অতুলপ্রসাদের সংগে তাঁদের সংযোজন একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সংযোগ তাঁর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় ঈপ্সিত লক্ষের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিত করে দেয়। তাঁদের বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব অতুলপ্রসাদকে উৎফুল্ল, উৎসাহিত করে এবং তিনি নব নব গঠনকার্য ও সৃষ্টি সাধনায় মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন; তাঁর প্রতিভা পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে ওঠে।

অতুলপ্রসাদ জন্মকর্মী, তাঁর কাজের ধারা সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না কিন্তু এতদিন সে ধারা ছিল সীমাবদ্ধ; তাঁর সৃজনীশক্তি সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনীতিচর্চার নিচে সংকোচে তলিয়েছিল। মাঝে মাঝে গান লিখতেন, কিন্তু তা আলোচনার, ঘসামাজার অপেক্ষা রাখত। অনুরাগীদের সংগে সাহিত্যালোচনা করতেন কিন্তু তা প্রায় এক তরফা। তাঁর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গুণীর সামনে দু চার কথা বললেও শ্রোতারা বিনয়-মুগ্ধ নিঃশব্দে থাকতেন, তিনিই শুধু বক্তা। তাছাড়া তাঁরা সংগ দিতে পারতেন কিন্তু সংগী, বন্ধু, অন্তরের মানুষ হয়ে উঠতে পারতেন না।

কিন্তু গোমতীর ওপারের বিদগ্ধরা তাঁর সংগী হলেন, বন্ধু হলেন, তারার মত উদয় হয়ে তাঁর প্রতিভাকাশের জ্যোৎস্নালোককে উজ্জ্বল করে তুললেন। তাঁরা শুধু শ্রোতা নন, বক্তা; অর্থাৎ অতুলপ্রসাদ যা বলেন আলোচনার কষ্ঠিপাথরে তাকে ঘসেমেজে নেন। তাঁর সৃজনী শক্তির তারিফ করলেও মতামত প্রকাশ করেন, সংগীতে উৎসাহ দেন। উত্তর ভারতে অতুলপ্রসাদের সাহিত্যপ্রচার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করেন, সহযোগিতা করেন, সাহায্যের জন্য সর্বদা তাঁর পাশে পাশে থাকেন। ফলে অতুলপ্রসাদের সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও রাজনীতিচর্চা তো রইলই উপরন্তু তিনি একদল বিশ্বস্ত সহযোগী পেয়ে বাংলা সাহিত্যসভা, সাহিত্য পত্রিকা—যা তাঁর একান্তই মনের জিনিস তাই নিয়ে উজিয়ে উঠলেন, শুরু হল তাঁর সবচেয়ে কর্মবহুল জীবনের জয়যাত্রা। সে যাত্রায় দিলীপকুমার রায় হলেন তাঁর অন্তরের সংগী।

তিনি সফল হলেন, নন্দিত হলেন।

অবশ্য এ কথা বললে ভুল হবে যে তাঁদের সংগ, সহযোগিতা না পেলে অতুলপ্রসাদ সফলকাম হতেন না। তা নয়, স্রোতস্বিনীকে পাথর চাপা দিলেও সে তার পথ করে বেরিয়ে আসবেই তবে পাথরের চাপ যদি সরল করে দেওয়া যায় তবে তার ধাবমানতা তীব্র হয়ে উঠবে বৈকি।

পরবর্তীকালে অতুলপ্রসাদের গানের সংগী ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। "যেখানে

গান শুনতে যান ধরে নিয়ে যান। গান শুনে মুগ্ধ হলে অতুলপ্রসাদের মুখ থেকে নানারকম উর্দু জবানের খই ফুটতে থাকে। শেষে বেসামাল হয়ে পড়েন। শিল্পীর দশগজ দূরে থেকে তিনি শুরু করতেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আরম্ভ হত তাঁর 'ওয়া ওয়া' (বাহবা বাহবা), আরো পাঁচ মিনিটের মধ্যে আরো ঘেঁষে আসতেন শিল্পীর, সংগে টেনে আনতেন গুটোনো সতরঞ্চটিকে আর তারই সংগে আমাকেও, যদিও বার বার আমাকে সাবধান করতেন তাঁর এই ধরনের পাগলামির বিরুদ্ধে, বলতেন যেন এমন কাণ্ড কখনো না করি।···কত বার বলেছেন, দ্যাখ্, একটু ব্যাকুল বা বেসামাল হয়ে পড়লে আমার জামা ধরে টেনে······"৩

দিলীপকুমার রায় তাঁর মনের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন ; একটি করে স্বরচিত গান শোনাতেন,শেখাতেন আর বলতেন সে গান রচনার ইতিহাস।

সুবালামাসী প্রথম অতুলপ্রসাদের গান প্রকাশ্যে গেয়ে শোনালেও আজ যে ঘরে ঘরে অতুলপ্রসাদের গান শোনা যায় সে প্রচারের কৃতিত্ব প্রধানতঃ দিলীপ-কুমার রায়ের। "আমি তাঁর গান সর্বত্র প্রচার করার ফলে তিনি গানের পর গান বাঁধতে আরম্ভ করলেন"।[8] অর্থাৎ এতদিন অতুলপ্রসাদ অবসর সময়ে গান রচনা করতেন। এখন সে কাজ তিনি উৎসাহের সংগে করতে লাগলেন।

প্রবাসী বংগ-সাহিত্য-সম্মেলনের লখনৌ অধিবেশনে সবাই একযোগে অতুলপ্রসাদকে সাহায্য করেছেন। অতুলপ্রসাদ এই সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন সত্য, কিন্তু দায়িত্বভার সবাই সানন্দে বহন করেছেন যাতে তাঁর সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে। রাধাকমল হাতে ফাইল নিয়ে সমানে তদারক করে বেড়িয়েছেন।

'উত্তরা' পত্রিকা সমিতির সভাপতি অতুলপ্রসাদ, যুগ্ম সম্পাদকের একজন —রাধাকমল, কোষাধ্যক্ষ রাধাকুমুদ। 'উত্তরা'র জয়যাত্রায় রাধাকমল, রাধা-কুমুদ, অসিত হালদার ছিলেন তাঁর সহযোগী, পার্শ্বচর।

অতুলপ্রসাদ ১৯২৫-এ স্থানীয় বাঙালী বালিকা বিদ্যালয়—'হরিমতী গার্লস্ স্কুলের' সভাপতি নির্বাচিত হন। পরে 'হরিমতী গার্লস্ স্কুলে'র নাম বদলে যখন 'জুবিলী গার্লস্ স্কুল' করা হল তখনো তিনি তার সভাপতি এবং আমৃত্যু তিনি এই পদ অলংকৃত করেছিলেন।

স্কুল আছে কিন্তু ঠিকমত তার অগ্রগতি কই ? অভাব লক্ষ্য করলেন

৩—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—'সংগীত স্মৃতি' : "পরিচয়"।

৪—দিলীপকুমার রায়—'স্মৃতিচারণ' ২য় খণ্ড।

বিনয়েন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। অতুলপ্রসাদের সঙ্গে সে বিষয়ে বিষদভাবে আলোচনা করলেন। উৎসাহিত অতুলপ্রসাদ বললেন, 'বেশ তো, তুমি যা ভাল বোঝ, যা করতে পার কর না ভাই। আমিও যে ভাবি না তা নয়, তবে কি জান একা মানুষ কতটুকু আর দেখতে পারি। তুমি এগিয়ে যাও'।

পরের নির্বাচনে বিনয়েন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত হলেন হরিমতী গার্লস্ স্কুলের সেক্রেটারী। অতুলপ্রসাদ যতদিন জীবিত ছিলেন এই স্কুলের প্রয়োজনে হাজার হাজার টাকা দিয়েছেন। বিনয়েন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের চেষ্টায়, পরিশ্রমে বিরাট স্কুল বিল্ডিং গড়ে উঠেছে, সংশোধিত শিক্ষার সুচারু ব্যবস্থা হয়েছে এবং ক্রমে স্কুল থেকে আজকের 'জুবিলী গার্লস্ কলেজে' রূপান্তরিত হয়েছে।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গান্ধীজীর পরামর্শে ভারতবাসী ইংরেজ সরকারকে যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন এই আশায় যে যুদ্ধ অন্তে তাঁদের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হবে, বিশেষ করে, ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ এবং আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসন পরাধীন জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দানের কথা এ সময়ে ঘোষণা করছিলেন। সেজন্য ভারতবাসী তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুবই আশান্বিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু ১৯১৯-এর শাসন সংস্কারের রূপরেখা জেনে ভারতবাসী নিরাশ হন। চরমপন্থীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং নেতারা সভা-সমিতিতে তাঁদের ক্ষুরধার ভাষণে জনতাকে সচেতন করে তোলেন।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কোলকাতায় নেশন্যাল লিবার্যাল ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। লিবার্যাল পার্টির নেতাদের লক্ষ্য ছিল সরকার থেকে যা সুবিধা পাওয়া যায় গ্রহণ করে দেশের উন্নতি সাধন করা ও জনতাকে সচেতন করে তোলা। নিজেদের উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য প্রতি বছর সর্বভারতীয় লিবার্যাল ফেডারেশনের অধিবেশন হত ও পার্টির প্রদেশীয় শাখার অধিবেশনেরও আয়োজন হত।

১৯২১-এর ৬ই আগষ্ট, লখনৌয়ে উত্তর প্রদেশ লিবার্যাল পার্টির অধি-বেশন হয়। সভাপতি হন মুন্সী নারায়ণপ্রতাপ আস্থানা। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন অতুলপ্রসাদ।

সে সভায় "Both President and the Chairman made strong comments on the policy of the Government, in matter of racial distinction and mention the Khoreal Shooting case as an instance. In this case an European Planter of Assam shot at the father of a coolie girl whom he wanted for his lust, but in the trial the European jury acquitted him. The case created considerable sensation at that time and though the great majority of Indians took this thing as the inevitable consequence of a system of administration with which they were attempting strenuously to non-cooperate, to the Liberal they offered a good field for the exercise of their constitutional method of co-operative exorcism of the belight of recial ascendency."

"Mr. A. P. Sen moved a resolution supporting the Swadeshi movement and in his speech, while exherting them to take to Swadeshi he condemned and spectacular demonstration of industrial patriotism in the boycott and burning of foreign clothes at a time when the country had not even half the output of clothes to meet its demand."[১]

॥ ছত্রিশ ॥

সম্ভবত ১৯২২ সালে একটি কেস নিয়ে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পাটনায় এসেছিলেন। পরে বিশ্বনাথ দর্শনে কাশীধামে যান। অতুলপ্রসাদ এ সুযোগের সদব্যবহার করলেন। তিনি আশুতোষকে নবাবের দেশে সাদর নিমন্ত্রণ করে নিজের বাংলোয় নিয়ে এলেন।

তাঁকে কুইন্স কলেজের প্রাঙ্গণে স্বাগত অভ্যর্থনা জানান হল। অতুলপ্রসাদ তাঁকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করলেন। স্যর আশুতোষ বাঙালীদের এই প্রতিষ্ঠান

১—Indian Annual Register (1921)—by Mittra.

দেখে পরম প্রীত হলেন। সমবেত ছাত্র ও দর্শকদের সামনে তাঁর গুরুগম্ভীর স্বরে ভাষণ দান করলেন।

স্যর আশুতোষ মিষ্টি জিনিস খেতে খুব ভালবাসতেন। তাঁকে এক থালা মিষ্টান্ন নিবেদন করা হলে তিনি তা পরম পরিতোষের সঙ্গে গ্রহণ করেন।

সেই সময়ে অতুলপ্রসাদ তাঁর স্বরচিত এই গানটি সুধা-কণ্ঠে গেয়ে শোনান—

মোদের গরব, মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা!……

গান শেষ হতেই আশুতোষ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে অতুলপ্রসাদকে দুহাতে আলিঙ্গনবদ্ধ করে আশীর্বাদ করলেন; বজ্রগম্ভীর নিনাদে বলে উঠলেন, "ধন্য অতুলপ্রসাদ, ধন্য বাঙালী সমাজ যে বাংলার এত দূরে থেকেও বাংলা ভাষার এত আদর এত কদর আমার কর্ণকুহরকে শীতল করে দিলে—মে মাসের দারুন গরম যেন শরমে পালিয়ে গেল…"।[১]

সভা শেষে আশুতোষকে শোভাযাত্রা করে অতুলপ্রসাদের বাংলোয় পেঁছে দেওয়া হল।

এরপর স্যর আশুতোষ লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ভাষণ দেন।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

জব্বলপুর নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে চক্রবর্তী রাজাগোপালচারী বাঙালীর সাহিত্য প্রীতিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন যে, 'দুজন মাদ্রাজীর দেখা হলে তাঁরা ইংরাজীতে কথা বলবেন, কিন্তু দুজন বাঙালীর দেখা হলে নিজের ভাষায়, বাঙলায় কথা বলবেন হয়তো পরনে তাঁদের বিদেশী পোশাক'। বাঙালীর নিজের ভাষাপ্রীতি, সাহিত্যপ্রীতি এমনিই প্রবল, এমনিই গভীর। তাই ঘর ছাড়া হয়ে বাঙালী দেশদেশান্তরে যাত্রা করলেও ভাষা ও সাহিত্য-প্রীতির পতাকা বহন করে নিয়ে যেতে ভোলে না।

আর্থিক কারণে বাঙালী সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে, কাশীধামেও গেছে।

১—সত্যকুমার মুখোপাধ্যায়—ডায়েরী।

কাশী এককালে, যেমন পুণ্যার্থীদের পুণ্যধাম ছিল তেমনি বাঙালী দিক-পাল পণ্ডিত ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী অধ্যাপকদের সমাগমে প্রগতির আবহাওয়া বইতে থাকে; উৎসাহিত তরুণদের চেষ্টায় বাংলা গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। তারপর হাওয়াবদলের উদ্দেশে খ্যাতনামা সাহিত্যিক কেউ এলে তাঁকে কেন্দ্র করে ঘরোয়া সাহিত্য-বৈঠক বসত, সাহিত্যালোচনা হত। তার ফলে কাশীতে একাধিক বাংলা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রচারের ভবিষ্যৎ জয়যাত্রার ইঙ্গিত তুলে ধরে।

কাশীর আদর্শ এলাহাবাদ ও কানপুরেও সংক্রামিত হয়।

১৯২২ সালে কানপুরে বঙ্গ সাহিত্য সমাজ-এর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অধিবেশনের আয়োজন হয়। অতুলপ্রসাদ এই অধিবেশনে সভাপতিরূপে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। স্থানীয় প্রখ্যাত ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন এই অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। উভয় সভাপতির ভাষণেই একটি প্রস্তাব সোচ্চার হয়ে ওঠে—প্রবাসে বাঙালীদের জন্য একটি সাহিত্য সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তার কথা। অতুলপ্রসাদ শুধু প্রস্তাব করেই ক্ষান্ত নন, এ সম্বন্ধে তাঁর মনে যে পরিকল্পনা আছে তাও তাঁর ভাষণে পরিস্ফুট করে তুললেন।

তাঁর প্রস্তাব সভায় সানন্দে গৃহীত হল। অনেক বাদানুবাদের পর ভবিষ্যৎ সম্মেলনের নামকরন করা হল—"উত্তর ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন।"

এই গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে স্থির হয় যে আগামী বৎসর কাশীতে প্রথম "উত্তর ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন" প্রতিপালিত হবে।

তখন থেকেই তার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়ে গেল। এ সাহিত্য যজ্ঞে অতুল-প্রসাদ হলেন প্রধান কর্ণধার ও পরামর্শদাতা।

বিপুল উৎসাহে ও সমারোহের সঙ্গে পরের বৎসর কাশীতে উত্তর ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হল। সভাপতি হলেন রবীন্দ্রনাথ।

লখনৌ নগরীর সভ্যদের সঙ্গে অতুলপ্রসাদ অধিবেশনে যোগ দিলেন। এ সাহিত্য-যজ্ঞে অতুলপ্রসাদ যদিও একজন অন্যতম কর্মী কিন্তু তিনি প্রচার বিমুখ, নীরব কর্মী; নিজেকে এগিয়ে দেওয়ার চেয়ে গুটিয়ে রাখা, লুকিয়ে রাখা তিনি বেশি পছন্দ করতেন।

কিন্তু সুগন্ধ গোলাপ কি করে তার গন্ধ গোপন করবে। রবীন্দ্রনাথের

আহ্বানে তাকে মঞ্চে আসতে হল, গান করতে হল, সেই মন ভোলান গান—
"আ মরি বাংলা ভাষা—"

আরো কত গান তাঁকে শোনাতে হল। যে দুদিন ছিলেন সর্বদা তাঁরই রচিত গান গাওয়ার অনুরোধ এসেছে। অক্লান্ত অতুলপ্রসাদ একটির পর একটি গান গেয়ে তাঁর শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছেন, তৃপ্ত করেছেন।

॥ আটত্রিশ ॥

সে ১৯২২-২৩-এর কথা। সি. ওয়াই. চিন্তামণি এসেছেন। অতুলপ্রসাদের পরম স্নেহের ও প্রিয়পাত্র। সন্ধ্যার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বন্ধুরা এলেন। উপস্থিত হলেন বন্ধুবর গোকরননাথ মিশ্র ও বিশেশ্বর নাথ শ্রীবাস্তব।

রাতের ভোজনের পর মজলিস বসল। সি. ওয়াই. মহা স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। অতুলপ্রসাদ প্রস্তাব করলেন, সি. ওয়াই. তোমার কিছু ট্রিক্ দেখাও।

শুরু হল ট্রিক্। 'Z" অক্ষর যার আদিতে সেইসব নাট্যশালার নাম, পোপেদের নাম ও কে কবে পোপ হয়েছেন তার সব তারিখ। চিন্তামণি গড়গড় করে সব বলে গেলেন।

গোকরন মিশ্র মন্তব্য করলেন, কে আর তোমার ভুল ধরতে যাচ্ছে। আচ্ছা, বলো দেখি বোম্বাই হাইকোর্টের চীফ জাস্টিসরা কে কবে চাকরি করেছেন? সি. ওয়াই. তাও এক নিশ্বাসে বলে গেলেন।

বিশেশ্বর নাথ বাধা দিলেন। বললেন, ও সব চলবে না. আমি একটা সাল বলছি, কোন কোন স্বনামধন্য উকিল ঐ সালে জন্মেছিলেন? 'কোন দেশের' খোঁজ করলেন চিন্তামণি। এই অঞ্চলের জানালেন বিশেশ্বর নাথ। আবার এক নিশ্বাসে তাও বলে দিলেন। অতুলপ্রসাদ বললেন,'এই সালের একটা মাসে আসা যাক; এবার বলো ঠিক তারিখটা'। চিন্তামণি তারিখটা এবং দুজনের নাম নিয়ে বললেন, And last but not least my friend on the right: অর্থাৎ অতুলপ্রসাদ। অতুলপ্রসাদ খুব হেসে উঠলেন, বললেন, এবার তোমায় পাকড়েছি। আমার জন্মতারিখটা ভুল বলেছ। চিন্তামণির কালোমুখ বেগুনি হয়ে উঠল! সিগারেটটা, কল্কের মতন ধরে টান দিতে লাগলেন। আধ মিনিট পরে তিনি বললেন, 'Go and ask your mother'।

উত্তরে অতুলপ্রসাদ জানালেন, তার আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু তিন চার দিন পরে অতুলপ্রসাদ বললেন, "ওহে ধূর্জটি, লোকটাকে পারা গেল না। চিন্তামণির ডেট্‌টাই ঠিক। পরে জানা গেল, চিন্তামণি অতুলপ্রসাদের এক জন্মদিনে কলকাতায় ছিলেন ; ছেলের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁর মা তাঁর বন্ধুদের খাওয়ান—তার মধ্যে ছিলেন চিন্তামণি"।[১]

ঐ বছরই অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দিলীপ রায়ের সাক্ষাৎ ঘটে। ওদের দুজনের মিলন যেন সুগন্ধের সঙ্গে বায়ুর সংযোজন ; বাংলাগানের ইতিহাসে সে একটি উল্লেখযোগ্য সন্ধিক্ষণ। অতুলপ্রসাদের গানকে ধূর্জটিপ্রসাদ ও দিলীপকুমার রায় প্রথম বরণ করে নিলেও তাকে সকলের মনের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়ার কৃতিত্ব দিলীপকুমার রায়ের এবং সাহানা দেবীর।

গায়ক অতুলপ্রসাদকে চেনবার আগে দিলীপকুমার রায় দেখেছেন মানুষ অতুলপ্রসাদকে, তাঁকে যথার্থ চিনেছেন তাই তাঁর গানের গভীরে ডুব দিতে তলিয়ে যেতে তাঁর অসুবিধা হয়নি।

দিলীপকুমার রায়কে নিজের গান শোনাতে বা শেখাতে বসে অতুলপ্রসাদ একাধিকবার বিশেষ ভাবপ্রবণ মুহূর্তে তাঁর মনোবেদনার রুদ্ধ দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

"কি আর চাহিব বল হে মোর প্রিয়
তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও……"

গানটি শোনাবার সময় বলেছিলেন, "জান দিলীপ, এ গানটি আমি বেঁধেছিলাম আমার জীবনের এক দারুণ দুঃখের সময়ে—যখন মনে হয়েছিল···যাক সে কথা।"[২]
আবার

"বিধি আরতো তোমায় নাহি ডরি
আমি পেয়েছি অকূলে আজি তরি!

গাইতে গাইতে তাঁর কণ্ঠ এসেছিল গাঢ় হয়ে, যে সন্ধ্যায় আমাকে সেদিন গানটি শেখান। বলেন, দিলীপ, এ গানটি কিন্তু···যার তার কাছে গেয়ো না। এ গানটি আমার বড় ব্যথার দিনে লেখা।"[৩]

১—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—"মনে এলো"।
২—দিলীপকুমার রায়—"স্মৃতিচারণ" ২য় খণ্ড।
৩—দিলীপকুমার রায়—"সুরেলা" : 'উত্তরা'।

আবার তিনিই রচনা করেছেন অপূর্ব রোম্যান্টিক ঠুংরি—

"চাঁদনী রাতে কেগো আসিলে"

গানটি রচনা করে যখন দিলীপ রায়ের সামনে পেশ করেন মুখে তখন তাঁর লাজুক নম্র আগ্রহ। জানালেন, "দিলীপ কাল সন্ধ্যেবেলা চাঁদের আলোয় একটি গান তৈরী করেছি।"[৪]

তাঁর গান রচনা করতে, গাইতে কুণ্ঠা। নিজের মত তাঁর সৃষ্টিকেও লুকিয়ে রাখতে তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু গানের কথা প্রকাশ করে ফেলার পর ও দিলীপ রায়ের অনুরোধে গানটি গেয়ে ফেলার পর অনেক সহজ হয়ে গেছেন।

দিলীপ রায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় এবার মুখে দেখা দিয়েছে প্রীতির সলজ্জ আভা, "স-সত্যি তোমার ভাল লেগেছে দিলীপ? দেখ, আ-আমি কখনো কোন দিন মনেই করতে পারি নি যে আ-আমার গান কারুর এত ভাল লাগতে পারে।" একটু থেমে: "কিন্তু দেখ, শেষের আভোগটা এখনো আমার ম-মনোমত হয় নি।" আত্ম প্রশংসা শুনলেই তাঁর কথা কি রকম পদে পদে বেধে যেত[৫]। একটু তোতলামির আভাস দেখা দিত।

ঐ সময় অতুলপ্রসাদ "কত গান তো হল গাওয়া আর মিছে কেন গাওয়া" গানটি রচনা করেন। আরো কত গান শোনালেন, কত আনন্দের গান আবার কত দুঃখের গান।

বিধি! আর তো তোমারে নাহি ডরি
আমি পেয়েছি অকূলে আজি তরী।

এই গানটি গেয়ে শেষ করার পরই অতুলপ্রসাদের কাছে অতিথিরা এলেন। তিনি হেসে মাতিয়ে তুললেন সবাইকে।

রাত্তিরে অতুলপ্রসাদ এবং দিলীপ রায় একত্রে শয়ন করতেন। সে রাত্তিরে দিলীপ রায় বিস্ময়ের সংগে প্রশ্ন করেন, কেমন করে এত হাসতে পার তুমি—অমন গান গাওয়ার পরই?

মৃদু হেসে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "দিলীপ, গান ও হাসিই আমার জীবন।...আমি কি প্রার্থনা করি জান ভগবানের কাছে। শ্মশানে যেদিন আমাকে নিয়ে যাবে সেদিন চিতায় শুয়ে হঠাৎ যেন সকলের দিকে চেয়ে একবার হেসে তবে চোখ মুদি।"[৬]

৪, ৫—দিলীপকুমার রায়—"সুরেলা": উত্তরা।

৬—দিলীপকুমার রায়—"সুরেলা": উত্তরা।

যে কদিন দিলীপ রায় ছিলেন গানে গানে অতুল-ভবন যেন সংগীতময় জগৎ হয়ে উঠেছিল।

॥ ঊনচল্লিশ ॥

বছরের পদক্ষেপের শুরুতেই অতুলপ্রসাদের গৃহে বিজয়ার বিষণ্ণতা নেমে এলো।

দিলীপকুমার আর পড়াশোনা করতে চাইলেন না, পড়ায় তাঁর আর আগ্রহ নেই; পড়াশোনা করার পর তিনি কিছু মনে রাখতে পারেন না।

আসল কারণ পারিবারিক অশান্তি। অতুলপ্রসাদ-হেমকুসুমের বিচ্ছেদ, মায়ের কষ্ট এ সব তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে, মন বিচলিত ও অস্থির হয়ে ওঠে।

একমাত্র পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চিন্তিত, উদ্বিগ্ন।

অতুলপ্রসাদ পড়াশোনার কথা বললে দিলীপকুমার তাঁর অনীহা জানালেন, পড়াশোনা আর নয়, তিনি কিছু শিখতে চান।

অতুলপ্রসাদ তাতেই রাজী, বেশ তো, কি শিখবে শেখ। দিলীপকুমার জানালেন যে তিনি ফার্মিং শিখতে চান। এলাহাবাদে নৈনী কলেজে শেখার ব্যবস্থা আছে।

অতুলপ্রসাদ দিলীপকুমারের জন্য নৈনীতে সব ব্যবস্থা করালেন। এবার যাবার পালা।

দিন যত এগিয়ে আসে সন্তান চিন্তায় হেমকুসুম ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে পড়েন। দিলীপ যে বড় সরল, সাদাসিধে আর ভালমানুষ, একলা কি ওকে ছেড়ে দেওয়া যায়। অন্তত সংগে বাড়ির কেউ যাক, খানসামা জুম্মত পুরনো লোক, দিলীপকুমারকে খুব যত্ন করে, ওর সংগে কদিনের জন্য এলাহাবাদে যাক। হোস্টেলে দিলীপকুমারে ব্যবস্থা ভালরকম হয়ে গেছে, ভাল আছে দেখে চলে আসবে।

কিন্তু দিলীপকুমারের সংগে জুম্মতের যাওয়ার প্রস্তাবে অতুলপ্রসাদের মা ও ভগ্নীদের ঘোর আপত্তি, এই খানসামাটি হল অতুলপ্রসাদের খাস ভৃত্য, ও চলে গেলে তাঁর অসুবিধা হবে। তা ছাড়া বাড়িঘরের কাজকর্মেরও ব্যাঘাত হবে।

এই সামান্য ব্যাপারকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ঘোরাল হয়ে উঠল। উভয় পক্ষই নিজেদের জিদ সম্বন্ধে অনড়, অটল। হেমকুসুম ক্ষুব্ধ, ক্ষিপ্ত; অতুলপ্রসাদ কুণ্ঠিত, অসহায়।

হেমকুসুমের নিজের ওপর অবিচার তবু সহ্য হয় কিন্তু তাঁর সন্তানের ওপর অবিচার! তিনি স্থির করলেন আর এ বাড়িতে থাকবেন না। দিলীপকুমারকে নিয়ে তিনি অতুলপ্রসাদের একজন অনুরাগী, স্নেহভাজনের বাড়িতে চলে গেলেন।

এ ঘটনাতে হেমন্তশশী অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং বলেন, "আমি বেঁচে থাকতে হেমকুসুমের এ বাড়িতে আর আসা চলবে না।"[১]

কিছুদিন পরে হেমকুসুম ক্যাণ্টনমেণ্ট রোডে একটি বাড়ি ভাড়া করে দিলীপকুমারসহ সেখানে থাকতে লাগলেন।

হেমন্তশশীর জীবিতকালে হেমকুসুম মাত্র একবারই অতুলপ্রসাদের গৃহে এসেছিলেন।

১৯২৩-এর মার্চ মাস। রবীন্দ্রনাথ লখনৌ যাবেন শুনে তাঁর এক পরিচিত ব্যক্তি বলেছিলেন, আর নবাব আসফ-উ-দ্দৌলা নেই লখনৌ কি যাবেন।

উত্তরে কবি বলেছিলেন, আসফ-উ-দ্দৌলা নেই কিন্তু অতুলপ্রসাদ তো আছেন।

পশ্চিমী গোলাপী আতরের খুসবুর মত সু-খবর সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লখনৌ আসছেন, চারদিন থাকবেন। সাজ সাজ রব পড়ে গেল। সব দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়ে অতুলপ্রসাদ এগিয়ে এলেন। ক'দিন কবির দুর্লভ সান্নিধ্য পাওয়া যাবে ভেবে তিনি উৎসাহিতও হয়ে উঠলেন। তাঁকে ঘিরে লখনৌয়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, বেঙ্গলী ক্লাবের কর্মকর্তারা কবি-সংবর্ধনা জন্য তৈরী হতে লাগলেন।

বঙ্গীয় যুবক সমিতির তরুণ ও তার কনসার্টপার্টি'র সভ্যবৃন্দের ডাক পড়ল। নৃপেন, আদিত্য, সুরেন ঘোষ, হরিসেবক মিত্র এবং আরো অনেকে এলেন। হরিসেবক এই প্রথম অতুলপ্রসাদের সংস্পর্শে এলেন ও তাঁর মহানুভব ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন। তাঁর বাজনার স্বর অতুলপ্রসাদকে মুগ্ধ করেছে জেনে তিনি ধন্য হলেন।

১—সেন পরিবারের একজন নিকট আত্মীয়া।

একটি ঘরোয়া সভায় কবির আগমন উপলক্ষ করে একটি অনুষ্ঠানসূচী তৈরী হল।

অতুলপ্রসাদের ক্ষুদে শিল্পীরা গান করবে। রবীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষ করে তিনি গান রচনা করলেন। পাহাড়ী সান্যালের ডাক পড়ল তা কণ্ঠে তুলে নিতে। তিনি অতুলপ্রসাদের সংগে গলা মিলিয়ে গাইলেন—

"জয়তু জয়তু জয়তু কবি,
জয়তু পূরব—উজল রবি,

জয় জগতবিজয়ী কবি,
জয় ভারত গৌরব রবি,
বংগ মাতার দুলাল 'রবি'—
জয় হে কবি।"...

সারা লখনৌ শহর যখন রবীন্দ্রনাথের আগমনকে কেন্দ্র করে মাতোয়ারা, ক্যাণ্টনমেণ্ট রোডের বাড়িতে হেমকুসুমের মন উতলা হল, রবীন্দ্রনাথ লখনৌ আসছেন, অতুলপ্রসাদের অতিথি হবেন, অর্থাৎ তাঁরও অতিথি। এমন দুর্লভ সৌভাগ্যের দিনে তিনি উপস্থিত থাকবেন না।

মনে মনে অভিমান হল, এই আনন্দ যজ্ঞের হোতা তো অতুলপ্রসাদ। সবাইকে ডেকে কাছে টেনে নিলেন, আর তাঁর কথা একবারও মনে পড়ল না।

কিন্তু তিনি অভিমান করে দূরে সরে থাকবেন না, কবিকে উপলক্ষ করে যে আনন্দ-সাগরের তরংগধ্বনি তাঁর কানে ভেসে আসছে তার অংশ নিতে তিনি নিজেই এগিয়ে যাবেন।

অতুলপ্রসাদের চিরপরিচিত বাংলোখানি যেন কনের সাজ পরে অপরিচিতার রূপ নিয়েছে। সেখানে কি উৎকণ্ঠা উত্তেজনা, সাগর অংগে বীচিভংগের মত সুর তরংগ ভেসে আসছে।

দিলীপকে নিয়ে হেমকুসুম অতুলপ্রসাদের সামনে পৌঁছে গেলেন।

"বিস্মিত অতুলপ্রসাদ পুলকিত হলেন, উচ্ছ্বসিত আনন্দে হেমকুসুমকে স্বাগত জানালেন।"[২]

রবীন্দ্রনাথকে স্টেশন থেকে সংবর্ধনা করে আনার জন্য মামুদাবাদের নবাবের

২—সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।

ল্যাণ্ডোগাড়ি ফুল পাতা দিয়ে সাজিয়ে অপরূপ করে তোলা হল। কবিকে নিয়ে ট্রেন এসে পৌঁছতেই বঙ্গীয় যুবক সমিতির শিল্পীদের ঐকতান বাদনের সুরমূর্ছনায় বাতাস মন্দ্রিত হতে লাগল।

সেদিন রবীন্দ্রনাথকে দেখার জন্য লখনৌ স্টেশনে লোকে লোকারণ্য। রাস্তার দুধারে উৎসুক জনতা, বারান্দায়, ছাতে, জানলায় কুণ্ঠিত রমণীরা।

শোভাযাত্রা কিছুদূর যাবার পর উৎসাহী জনতা ল্যাণ্ডো গাড়ির ঘোড়া খুলে নিয়ে নিজেরাই কবিকে বহন করে নিয়ে চললেন। কবিকে উদ্দেশ্য করে ওপর থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। বাতাসে জয়ধ্বনির তরঙ্গ, অগণিত জনতার উচ্ছল উল্লাসে লখনৌ শহর মুখরিত।

রবীন্দ্রনাথসহ অতুলপ্রসাদ তাঁর বাংলোর সামনে পৌঁছলেন। সেখানে প্রভাতীরাগে সানাইয়ের মিষ্টি সুর হাওয়ার বুকে প্রতিধ্বনি তুলে ভেসে চলেছে।

কবিকে স্বাগতম্ জানাতে প্রথমে পাহাড়ী সান্যাল তাঁর মধুর কণ্ঠে অতুল-প্রসাদ রচিত দেশরাগে একক সংগীত 'চাহরে আজি ভারতমাতার প্রতি···' গাইলেন। তারপর আর একটি অতুলপ্রসাদের গান বালকবালিকারা সমবেতকণ্ঠে গেয়ে শোনালেন :—

"এসো হে এসো হে ভারতভূষণ
মোদের প্রবাস ভবনে।
আমরা বাঙালি মিলিয়াছি আজ
পূজিতে ভারতরতনে।"···

এবার রবীন্দ্রনাথকে প্রার্থনা জানান হল যে তিনি তাঁর কোন একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান।

অভূতপূর্ব সম্মানে অভিসিক্ত হয়ে কবি বিস্মিত, পুলকিত। তিনি আনন্দের সঙ্গে তাঁর "কৃষ্ণকলি" কবিতাটি আবৃত্তি করে সকলকে শোনালেন।

অতুলপ্রসাদের বাংলোয় সারা শহর যেন ভেঙে পড়ল—বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আনাগোনা, সাধারণ মানুষের ভিড়। অতুলপ্রসাদ আজ গানের উৎস-মুখ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন—গাইছেন, ভক্তদের গাওয়াচ্ছেন, কবিকে গাইতে অনুরোধ করছেন। তাঁর অনুরোধে কবি গান গেয়ে শোনালেন।

কবিকে বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতিতে অভ্যর্থনা করে আনা হল।

সুসজ্জিত ক্লাব-ভবনে কবি তাঁর আসনে সমাসীন। অতুলপ্রসাদের নির্দেশে বালকবালিকারা অতুলপ্রসাদ রচিত গানটি গাইলেন :—

'জয়তু জয়তু জয়তু কবি'।...

এই সভায় অতুলপ্রসাদ রচিত অন্যান্য গানও কবিকে শোনান হয়। তার মধ্যে একটি হল :—

"কাঙাল বলিযা করিও না হেলা
আমি পথের ভিখারী নহি গো"...

গানটি শেষ হলে শ্রোতাদের মধ্যে কলগুঞ্জন শোনা যায়, 'আহা, রবীন্দ্রনাথের গানের কি মিষ্টি সুর!'

লখনৌয়ে বাস করে লখনৌবাসীর এই উক্তিতে বোঝা যায় অতুলপ্রসাদ কত প্রচার বিমুখ ও আত্মগোপনকারী ছিলেন।

শ্রোতাদের মন্তব্য কবির কানেও পেঁছে যায়। তিনি পরে অতুলপ্রসাদকে পরামর্শ দেন যে তিনি যেন তাঁর স্বরচিত গানগুলি একত্র করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে দেরী না করেন।

অতুলপ্রসাদ প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রতিদিনের মত সেদিনও রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে বাঙালী-অবাঙালী অভ্যাগতে অতুলপ্রসাদের বৈঠকখানা পরিপূর্ণ। হঠাৎ যেন মল বাজিয়ে ঝমাঝম করে বৃষ্টি নামল। বরষার কবি রবীন্দ্রনাথ একের পর এক বরষার গান করতে লাগলেন। কয়েকটি গান করার পর অতুলপ্রসাদকে বললেন, এবার তুমি তোমার গান কিছু শোনাও।

"অতুলপ্রসাদ কিন্তু নিজের গান গাইলেন না, কবির অনুরোধে একটি হিন্দী লোকগীতি গেয়ে শোনালেন :—

'মহারাজ কেওড়িয়া খোল
রস কি বুঁদি পড়ে'...

রবীন্দ্রনাথ সে গান শুনে এতই মুগ্ধ হলেন যে অতুলপ্রসাদের গানের তালে তালে চোখ বুজে তালি দিতে লাগলেন"।[৩]

এরপর রবীন্দ্রনাথ লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা করেন। পরে বোম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।

৩—বলেছেন বিখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক অমৃতলাল নাগর।

কবি বিদায় নেবার পর সেই দিনই হেমকুসুম দিলীপকুমারকে নিয়ে তাঁর ক্যান্টনমেন্ট রোডের বাড়িতে চলে গেলেন।

অসহায় অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমের বিদায়-বেদনাকে তাঁর গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করলেন, রচিত হল :—

ওগো নিঠুর দরদি, এ কী খেলছ অনুক্ষণ!
তোমার কাঁটায় ভরা বন তোমার প্রেমে ভরা মন।
মিছে দাও কাঁটার ব্যথা, সহিতে না পারো তা;
আমার আঁখি-জল তোমায় করে গো চঞ্চল—
তাই নয় বুঝি বিফল আমার অশ্রু বরিষণ!
ডাকিলে কও না কথা, কী নিঠুর নীরবতা!
আবার ফিরে চাও, বল, 'ওগো শুনে যাও,
তোমার সাথে আছে আমার অনেক কথন'।

॥ চল্লিশ ॥

লখনৌয়ে রবীন্দ্র-আগমন উপলক্ষে অতুলপ্রসাদ তাঁর কিশোর বয়স্ক শিষ্যদের গান শেখাতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ রাজার সম্মান নিয়ে বিদায় নিলেন। কিন্তু অতুলপ্রসাদের কিশোর শিষ্যের দল রয়ে গেলেন। সে দলে অতুলপ্রসাদের সর্বকনিষ্ঠ প্রিয় শিষ্য ছিলেন পাহাড়ী সান্যাল। অতুলপ্রসাদের সঙ্গে পাহাড়ী সান্যালের সংযোগ সেই 'আওয়ার ডে'—১৯১৬ থেকে।

তখন কানাঘুষোয় শোনা যেত যে সেন সাহেবের জন্য একটি ছেলে বিগড়ে যাচ্ছে, কারণ যখন তখন অতুলপ্রসাদের বাংলোয় পাহাড়ী সান্যালের ডাক পড়ত এবং তিনিও যেতেন। অতুলপ্রসাদ যখনি কোন গান রচনা করে তাতে সুর যোজনা করতেন অমনি তা কণ্ঠে তুলে নিতে পাহাড়ী সান্যালের ডাক পড়ত; রাত দশটায়ও ডাক পড়েছে।

অতুলপ্রসাদ একদিন পাহাড়ী সান্যালকে ডেকে "কত গান তো হল গাওয়া" গানটি শোনালেন এবং বলে দিলেন, তুমি আবার এসো, গানটি শিখিয়ে দেব।

কিন্তু পাহাড়ী সান্যালের এরপর আর দেখা নেই; ডেকে ডেকেও তাঁকে আনা যায় না। আনবেন কি, বাড়িতে তখন দ্বিজুদার (দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল)

বিবাহ, নতুন বৌদি আসছেন, মন পড়ে রয়েছে সেখানে ; গানের কথা মনেই নেই।

এর কিছুদিন পর বেঙ্গলী ক্লাবে থিয়েটার হল-এ দুজনের সাক্ষাৎ। অতুলপ্রসাদ তাঁর চেয়ারে বসে আছেন। বেঙ্গলী ক্লাবে তাঁর ও হেমকুসুমের জন্য সর্বদা আসন সংরক্ষিত থাকত।

পাহাড়ী সান্যালও থিয়েটার দেখতে গেছেন। অতুলপ্রসাদের পাশের চেয়ার শূন্য পড়েছিল। সেখানে তিনি বসলেন। কিন্তু তাঁকে দেখে অতুলপ্রসাদের মধ্যে কোন রকম ভাবান্তর হল না, স্বাভাবিক স্মিতহাস্যে তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্যকে অভিনন্দিত করলেন না, কথাও বললেন না। পাহাড়ী সান্যাল অবাক।

খানিক পরে তাঁর হাতের কোমল স্পর্শ পাহাড়ী সান্যাল পিঠের ওপর অনুভব করলেন। তারপর তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'তোমাকে বার বার ডেকে পাঠালাম নতুন গান শেখাব বলে, মনে আছে সে গান? কিন্তু কই, তুমি তো এলে না'।

পাহাড়ী সান্যালের মনে পড়ে গেল "কত গান তো হল গাওয়া" গানটি শিখে নেবার কথা। তিনি চুপ করে রইলেন। হঠাৎ দেখলেন অতুলপ্রসাদের দীঘল দু চোখ দিয়ে টস টস করে জল ঝরে পড়ছে।

বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অতুলপ্রসাদের মনের কোমলতার পরিচয়ে পাহাড়ী সান্যাল তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন।

অতুলপ্রসাদের গানে তান ও সুর বিহারের যথেষ্ট অবকাশ আছে। দিলীপকুমার রায় ও পাহাড়ী সান্যাল তার সুযোগ নিয়ে ওস্তাদী ঢঙে তাঁর গান করতেন। অতুলপ্রসাদ এ-সব শুনে খুশি হলেও বেশি ওস্তাদী ঢঙে গাইতে বারণ করতেন। 'না, পাহাড়ী অতটা—মানে একটু কম তান লয়ে—' পাহাড়ী শুনে নিজেকে একটু সংযত করে নিতেন। কিন্তু দিলীপকুমার রায় প্রাণ ঢেলে তাঁর গান ওস্তাদী ঢঙে গাইতেন, কোন বাধা-বারণ মানতেন না। অতুলপ্রসাদ যেন অসহায়, বিব্রত বোধ করতেন—কারণ বিশ্বকবির প্রতি তদগতচিত্ত অতুলপ্রসাদ চাইতেন রবীন্দ্র-সংগীতের পাশে তাঁর গান যেন সাধারণ, সাদামাঠা মনে হয়!

অতুলপ্রসাদ যেমন গাইতে তেমনি গান শেখাতেও ভালবাসতেন। তার

একটি চিত্র পাওয়া যায় সাহানা দেবীর লেখায়। "অতুলদার কাছে প্রথম শেখা গান হল—'তব পায়ে যাব কেমনে হরি।' 'বঁধু ধর ধর মালা পর গলে', গানটিও শিখি।...অতুলদার কাছে গান শেখার ইচ্ছে অনেকদিন থেকেই, কিন্তু এ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠে নি। এইবার দার্জিলিং পাহাড়ে প্রথম যে সুযোগ হল।...অতুলদার গান শেখানর ধরণ আর পদ্ধতি এমন ছিল যে, গান শেখার আনন্দ ও আগ্রহ দুই-ই যেন বেড়ে যেত। তিনি নিজেও গান শেখাতে উৎসাহিত বোধ করতেন। দেখতাম তাঁর সংগীত-পিপাসু মন কি রকম রসঘন হয়ে উঠত। গান শুধু শুনতেই ভালবাসতেন না, শেখাতেও ভালবাসতেন সমানই।"[১]

রেণুকা দাসগুপ্তেরও অতুলপ্রসাদের নিকট গান শেখার সুযোগ হয়েছিল। "গানের গলা দেখলেই তিনি উৎসাহের সংগে গান শেখাতে আরম্ভ করতেন। গান শেখাতে ওঁর উৎসাহ ছিল অপরিসীম। কী যে ভালবাসতেন, এতটুকু ক্লান্তি দেখি নি কোনদিন।...ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওঁর কাছে গান শিখেছি, ভাবে গদগদ, সুরের ভিতর কি যে মাদকতা...।"[২]

সেবার সিমলায় গেছেন; অসুস্থ শরীর, রক্তচাপবৃদ্ধি রোগে ভুগছেন। ১৯২০-তে এই রোগের সূত্রপাত। তখন গরমের ছুটির অবসরে শৈলাবাসে বেড়াতে ও বিশ্রাম নিতে এসেছেন। খবর পেলেন কুমুদিনী দত্তর ছোট-বৌদিরা সিমলায় এসেছেন। ছোটবৌদি খুব সুন্দর গান করেন, অতুলপ্রসাদের গানের ভক্ত। কিন্তু থাকেন বেশ দূরে ও পাহাড়ের এক উঁচু অংশে।

সংগীতানুরাগীর সন্ধান পেলে অতুলপ্রসাদের কাছে কোন বাধা বাধাই নয়। তিনি অসুস্থ শরীরে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে ছোটবৌদিকে দিনের পর দিন তাঁর গান শেখাতে যেতেন।

সি, ওয়াই, চিন্তামণির উদ্যোগে ১৯২৩ সালে ২৩শে ও ২৫শে আগস্ট বেনারসে উত্তর প্রদেশীয় লিবার্যাল পার্টি'র অধিবেশন হয়। সে অধিবেশনে অতুলপ্রসাদ মূল সভাপতি নির্বাচিত হন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণের পর অতুলপ্রসাদ যে সুচিন্তিত, সুদীর্ঘ ভাষণ দেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হল :—

১—শ্রীমতী সাহানা দেবী—'সুরে-ভরা দিনগুলি' : দেশ পত্রিকা।

২—শ্রীমতী রেণুকা দাসগুপ্ত—'গীতকার অতুলপ্রসাদ সেন' : আমাদের কথা।

"The President dwelt mainly on all India topics, especially on the position of India in the Empire, the Kenya outrage, then the burning topic of the day, and advocated strong measures such as retaliation and boycott of the Imperial Conference and the Empire Exhibition in return. He further insisted upon freeing the Government of India from the Secretary of States control, a radical reform of the Military policy and a substantial reduction of the Military expenditure and exposed the farce that was being enacted by the Government of Indianising the eight units of the Indian army. He strongly urged for complete Provincial autonomy and a thorough-going Indianisation of the services and recruitment in England should be stopped at once. He also dwelt upon the subjects of the seperation of functions (Judicial and Executive), Hindu-Muslim relations, the Swadeshi movement, the relations between landlords and tenants, between Capital and Labour and some other provincial or less important topics."[৩]

॥ একচল্লিশ ॥

অতুলপ্রসাদের বাড়ি তখন ভাগ্নে-ভাগ্নীদের উপস্থিতিতে গম গম করছে। কিরণের কন্যা বুলবুলের শিক্ষকের দরকার, অংকয় কাঁচা। অতুলপ্রসাদ অরুণপ্রকাশকে অনুরোধ করলেন, ভাই, তুমি ওকে একটু অংক দেখিয়ে শুনিয়ে দাও।

অরুণপ্রকাশ অংক শেখাতে খুব ইচ্ছুক নন। কিন্তু অতুলদাদাকে নিরাশ করা যায় না। বুলবুলকে পড়াতে লাগলেন। বড় মিষ্টি মেয়ে বুলবুল।

১৯২৪ সালের মে মাসে অতুলপ্রসাদের সদা-আনন্দভবনে শোকের ছায়া নেবে এলো। কয়েকদিন রোগ ভোগের পর বুলবুল মারা গেল।

৩—Indian Annual Register (1923)—Mitra.

ভোর বেলায় ছাত্রীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ব্যথিত অরুণপ্রকাশ অতুলপ্রসাদের কাছে চললেন। রাস্তায় যেতে যেতে ভাবছেন, অতুলদাদার যা নরম, কোমল মন, তাঁর সামনে কি করে গিয়ে দাঁড়াব।

গেটের কাছে এসে দেখলেন নিত্য দিনের মত অতুলপ্রসাদ এ সময়ে বাগানে রয়েছেন। অরুণপ্রকাশের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, অন্যমনস্কও ছিলেন তাই তাঁর উপস্থিতি টের পান নি!

অরুণপ্রকাশও তাঁকে বিরক্ত করলেন না। তাঁর ব্যথিত হৃদয়ের কথা ভেবে চুপ করে রইলেন। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে শুনলেন অতুলপ্রসাদ গুন গুন করে তাঁর বিখ্যাত গানের কলি ভাঁজছেন :—

"কি আর চাইব বলো, হে মোর প্রিয়,
তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।
বলিব না রেখো সুখে, চাহ যদি রেখো দুখে,
তুমি যাহা ভাল বোঝ তাই করিয়ো।
শুধু, তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।"...

বুলবুলের মরদেহ ভৈঁসাকুণ্ড শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। অতুলপ্রসাদের গুণমুগ্ধ ভক্তবৃন্দ এবং বন্ধুস্থানীয়রা শবানুগমন করলেন। নলিনী বিহারীও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন।

দাহকার্যের দিকে অতুলপ্রসাদ গেলেন না। উনি একধারে সরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যখন সব কিছু সমাধা হয়ে গেল, নলিনী বিহারী তাঁর নিকট এলেন ; অতুলপ্রসাদ মৃদুস্বরে বললেন, নলিনীবাবু. আপনার দাদার সেই গানটি গেয়ে শোনান তো, সেই—

"হরি হরি বলে দুইবাহু তুলে
প্রাণ সখারে ডাকিরে আয়,
ও সে ভুবন মোহন নব ঘনশ্যাম
ভকতি পরান হরিয়া লয়"।...[১]

অতুলপ্রসাদ গান পাগল ছিলেন। উৎসবে আনন্দে উচ্ছল হয়ে গান পরিবেশন করতেন এবং অন্যের গান শুনে রস গ্রহণ করে আনন্দ পেতেন ঠিকই। কিন্তু সেই-ই সব কথা নয়, গান তাঁর কাছে যেমন আনন্দের

১—উত্তরপাড়া নিবাসী ডাক্তার মণিভূষণ হালদার রচিত।

উৎস ছিল তেমনি দুঃখে, শোকে, বেদনায় গান ছিল তাঁর কাছে সান্ত্বনা ও শান্তির উৎস।

ঐ বছরই অতুলপ্রসাদের ভগ্নী, বুলবুলের মা কিরণ বিধবা হন।

॥ বিয়াল্লিশ ॥

ছুটির দিনে অতুলপ্রসাদের ভবনে অপরাহ্নকাল থেকেই গল্প, সাহিত্য, গান, চা-পান ইত্যাদি চলত। এ ব্যাপারটি তিনি খুবই ভালবাসতেন। এর সভ্য-সংখ্যা প্রথমে মাত্র কয়েকজন ছিল। সে বৈঠকে "তাঁর কাছে বঙ্কিম, দ্বিজেন্দ্র, রবীন্দ্র প্রভৃতির রচনা বা তাঁদের জীবনের ঘটনাগুলি শুনিতে পড়িতে, আলোচনা করিতে ভালবাসিতাম। তাঁর নিজের রচিত দেশ-সংগীত বা প্রেম-সংগীত আমাদের শুনিবার বা যাহার ইচ্ছা লিখিবার সুযোগ হইত। হোলীর দিনে হোলীর গান, শ্রাবণের বরিষায় বর্ষাসংগীত, শারদীয়া বৈকালে পুরবীর তান বারে বারে শুনিতাম, কখনও পুরাতন হইত না। এই সাহিত্যের আখড়ায় অতুল যেমন প্রাণ খুলিয়া হাসিতেন গল্প করিতেন এমন কোথাও নয়।…বাঙলা রচনায় তিনি আমাদের উৎসাহ দিতেন।…বর্ষাসুন্দরীকে বিদায় নিবেদন উপলক্ষে অতুল আমাদের কবিতা রচনা করিতে আদেশ করেন…। এ সব রচনার মূলে ছিল অতুলের প্রেরণা। তিনি সব সময়ে চাহিতেন যেন আমরা বাঙলার তুলি দিয়া বাঙালীর মর্মকথা গদ্যে ও পদ্যে চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া বঙ্গভারতীর পূজায় উপঢৌকন দিই। প্রবাসী বাঙালীর কাছে তাঁর এই নিবেদন পরে প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলনে পর্যবসিত হইয়াছিল।"[১]

রবিবারের সাহিত্য বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দও আসেন—ধূর্জটিপ্রসাদ, রাধাকমল, রাধাকুমুদ, নির্মল সিদ্ধান্ত, অসিত হালদার, বিনয়েন্দ্র দাসগুপ্ত। মাঝে মাঝে হেমেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রলাল রায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, শচীন দত্ত, প্রশান্ত দাসগুপ্ত আসতেন। এ ছাড়া অধ্যক্ষ ভীম সেন, হামিদ আলি খাঁ ও অন্যান্য অবাঙালী সাহিত্যিক ও সংগীত পিপাসুরাও আসতেন। নীরব শ্রোতা বাঙালী যুবকরাও উপস্থিত থাকতেন। যেমন, ভিক্টর

১—অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়—"অতুলপ্রসাদ" : "উত্তরা"।

নারায়ণ বিদ্যান্ত; কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোকপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি।

সেদিন রবিবারের সাহিত্য আসরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে কথা উঠল। অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে পেলে আর কিছু চাইতেন না। বললেন, "ওঁর কবিতা পড়ার পর লিখতে লজ্জা হয়, ইচ্ছে করে কেবল পড়ি; কিন্তু হঠাৎ হাত কি রকম করে ওঠে"।[২]

এর পর শরৎচন্দ্রের কথা উঠল, তাঁর 'চন্দ্রনাথ' বইটি নিয়ে আলোচনা চলল। অতুলপ্রসাদ বইটির খুব প্রশংসা করে বললেন, আমার তো খুব ভাল লেগেছে, এটিকে শরৎবাবুর শ্রেষ্ঠ রচনা বলা যায়।

ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের কথাও হল। দাড়ি রেখে মুসলমানী পোশাক পরে এসে কেমন অতুলপ্রসাদকে জব্দ করেছিলেন। আবার ওস্তাদী গানের সামনে তিনি কেমন অধৈর্য হয়ে পড়তেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ এবার অতুলপ্রসাদের নতুন রচনার খোঁজ করলেন। অতুলপ্রসাদের প্রথম খানিক সংকোচ, খানিক লজ্জা। পরে উঠে গিয়ে অফিসঘর থেকে উকিলের ডায়েরী নিয়ে এলেন। তারই পাতার ফাঁকে ফাঁকে গান লেখা কাগজের টুকরো! একটু হাসির খোরাক হল।

অতুলপ্রসাদও হাসলেন, সলজ্জ হাসি। তারপর নতুন রচিত গানটি পড়ে শোনালেন—

'ভারত ভানু কোথায় লুকালে—'

শ্রোতারা বিস্ময়ে স্তব্ধ, আনন্দে উদ্বেল, শেষে প্রশংসায় সোচ্চার—অপূর্ব অপূর্ব!

এবার গানটি গেয়ে শুনিয়ে দিন, অধ্যাপকবৃন্দ অনুরোধ করলেন।

অতুলপ্রসাদের গান শোনাতে অনীহা কোথায়। চোখ বুজে চুপ করে রইলেন, গাইবার আগে তার জন্য পরিবেশ তৈরী করার এই ছিল তাঁর রীতি। তারপর ধীরে সংযতস্বরে গান ধরলেন:—

"ভারত ভানু কোথায় লুকালে—
পুনঃ উদিবে কবে পূরব-ভালে?
হা রে বিধাতা, সে দেবকান্তি
কালের গর্ভে কেন ডুবালে?"...

২—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—"অতুলপ্রসাদ": 'উত্তরা'।

"তাঁর নিজের গান আসরে ভাল গাইতে পারতেন না। সভায় অতি সহজেই নিজের ওপর বিশ্বাস হারাতেন ; মূল সুর খুঁজে পেতেন না। ছোট আসরে তাঁর গলা খুলত ভাল, সব চেয়ে ভাল শোনাত গুন গুন করে গাইবার সময়।"[৩]

সে ঘরোয়া আসরে বিস্ময়কর স্বরচিত স্বদেশী গানটি তাঁর দরদভরা গলায় অপূর্ব শোনাল।

অতুলপ্রসাদ নানা গুণে ভূষিত হলেও গীতিকার এবং সুরকাররূপেই তিনি সর্বাধিক বিখ্যাত। প্রবাসে এসে যেমন তিনি সে প্রদেশের মানুষদের ভালবেসে আপন করে নিয়েছিলেন, তাঁদের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলায় অনুরাগ দেখিয়েছিলেন তেমনি লখনৌয়ের ঠুংরি-দাদরার বিশেষ করে ঠুংরির ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। লখনৌয়ের ঠুংরি-বিশারদ 'বিন্দাদীন' ও 'কালকা'র সংগে তাঁর অত্যন্ত হৃদ্যতা হয়েছিল এবং তাদের ঠুংরি অতুলপ্রসাদের বড় প্রিয় ছিল। 'বিন্দাদীনের' আবাসে তাঁর খুবই যাওয়া আসা ছিল ; তাঁর একাধিক গানে তিনি বিন্দাদীনের ঠুংরির সুর আরোপ করেছেন।

বিন্দাদীন ছিলেন নবাব ওয়াজিদ আলি শা-র সভা-গায়ক ঠাকুরপ্রসাদের পুত্র, কালকা তাঁর অপর পুত্র। এঁরা দুজনেই ঠুংরি গানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। অনেক ঠুংরি বিন্দাদীনের রচিত যার শেষে 'বিন্দা কহে' ভনিতা পাওয়া যায়। শৃংগার রসাপ্লুত কথক নৃত্যে ঠুংরি গানের যে প্রভাব তা বিন্দা-কালকার ঘরানা। অতুলপ্রসাদের অনুরোধে বৃদ্ধ বিন্দাদীন ও কালকা কখনো কখনো তাঁর বাংলোয় এসেছেন। প্রায়ই যে সব অবাঙালী গুণী গায়ক তাঁর বাংলোয় আসতেন তাঁরা হলেন বিখ্যাত হারমোনিয়ম বাদক নবাব আলী সাহেব, কণ্ঠশিল্পী ওস্তাদ আহম্মদ খলীফ খাঁ, ছোটে মুন্নে খাঁ, যন্ত্রশিল্পী বরকৎ আলী, সাকায়েৎ হোসেন খাঁ, তবলা বাদক বীরু মিশ্র, খুরসেদ আলী খাঁ, আবীদ হোসেন ইত্যাদি।

অতুলপ্রসাদ যে শুধু গানের বৈঠক করতেন এবং গান শুনতে ভালবাসতেন তাই নয়, সংগীত শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং একাধিক শিল্পী তাঁর আসরের শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন।

ছোটে মুন্নে খাঁ ওয়াজিদ আলি শা-র দরবারের শেষ গায়ক। এসে জুটে-

৩—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—"অতুলপ্রসাদ" : "উত্তরা"।

ছিলেন অতুলপ্রসাদের বৈঠকখানায়। তামিল হুসেন লখনৌয়ের শেষ বিখ্যাত সানাইয়া—কৈশরবাগে থাকত। রোজ ভোরবেলা টোড়ী আর ভৈরোঁ রাগ বাজাতেন। অতুলপ্রসাদ সেই সুর শুনতে শুনতে ঘুম থেকে উঠতেন। ইউসুফের সেতারের মিঠে হাত, তাকে রাখলেন। বরকতের ছড়ির টান ভাল—নিয়ে এসো তাকে। 'কদর দান' বলতে কি তিনি তা জানতেন।[৪]

শুধু বাড়িতে ডাকাই নয়, অতুলপ্রসাদ স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গায়ক-গায়িকাকে অনুসরণ করতেন, প্রয়োজনে তাঁদের বাড়ি পোঁছে যেতেন।

"পর্ণকুটিরে ভৈরবীর (রাগের) ঠুংরী শুনতে গিয়েছি তাঁর সংগে। বৃদ্ধ ওস্তাদ কেঁপে অস্থির—সেন সাহেবকে কোথায় বসাবেন? সেই ছেঁড়া ভাঙা খাটিয়াটির ওপর বসে ঘন্টার পর ঘন্টা গান শুনলেন। ওস্তাদের ছেলের হাতে দুখানা নোট গুঁজে দিলেন—আর "কিসী রোজ তসরীফ" নিয়ে আসতে অনুরোধ করলেন। এক বিখ্যাত লখনৌর গায়িকা পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াত। অদ্ভুত টোড়ী আর ভৈরবী গায়। তিনি শুনেই সংবাদদাতাকে পাঁচটাকা দিলেন, 'তাকে নিয়ে এসো, নিয়ে এসো'—বললেন বার্তাবাহককে। কে একজন একবার তাঁকে বললেন যে একজন ভিখারিনী নাকি ভৈরবী গাইছে অপরূপ। অতুলদা তাঁকে বললেন, তাকে একটি রাস্তার মোড়ে ডেকে আনতে। দূরে গাড়ি রেখে তিনি মোড়ের দিকে এগোলেন। ভিখারিনী তাঁকে দেখেই পালায়। অতুলদা তাকে চিনলেন। সে ছিল লখনৌয়ের এক বিখ্যাত বাঈজী—প্রেমে পড়ে তার সর্বস্ব সে বিলিয়ে দিয়েছিল তার প্রেমিককে। প্রতিদানে তার কপালে জুটেছিল প্রবঞ্চনা। আর একবার তিনি অম্বিকা মজুমদারের বাড়িতে গিয়েছিলেন। কাছেই এক আশ্চর্য ঠুংরী গাইয়ে এসেছে কিন্তু তাঁর ঘরে বসতে দেয়ার একটি চেয়ারও নেই। অতুলপ্রসাদ শুনে তখনই সেখানে গেলেন এবং তার গান শুনলেন ছ ঘন্টা ধরে। এমন যে কিছু ভাল গাইয়ে তা নয়, তবু অতুলদা ঠাওরালেন যে লোকটার গানের চাল ভালোই।"[৫]

বিজনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ আট বছর অতুলপ্রসাদের সংগ লাভ করার পর অন্যত্র চলে যান।

৪—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—"অতুলপ্রসাদ" : 'উত্তরা'।

৫—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—"গানের স্মৃতি : লখনৌ পর্ব" : 'শারদীয়া কালান্তর'।

পুনরায় ১৯২৪ সালে লখনৌ আসেন এবং বলাবাহুল্য আবার অতুলপ্রসাদের সান্নিধ্যে ধন্য হন।

সেদিন অতুলপ্রসাদ কলকাতা থেকে এসেছেন। বিজনবিহারী দুই সুহৃদ শম্ভুশরণ ও নির্মল দে সহ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

এ-কথা যে-কথার পর অতুলপ্রসাদ তাঁর নতুন রচিত একটি গান গেয়ে শোনালেন :—

"এত হাসি আছে জগতে তোমার,
বঞ্চিলে শুধু মোরে।
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে!
হাসিব হাসাব এই মনে লয়ে রচিলাম কত গান;
সেই গানে আমি কাঁদিলাম কত, কাঁদালেম কত প্রাণ।
যে ডোরে সবার হয় মালা গাঁথা, দিলি ফাঁসি সেই ডোরে।
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে!
আমিও তো কত সুখের আশায় আশার ভেলায় ভেসেছি;
আমিও তো কত সেই বাঁশি শুনি' যমুনার কূলে এসেছি।
কোথা শ্যামরায়, যার লাগি হায় রহিতে নারিনু ঘরে?
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে!
বুঝেছি তোমার মধুর মুরলী বাজিবে না মোর তরে
এসো ঘনশ্যাম, তোমার রুদ্র দণ্ড লইয়া করে।
লয়ে যাও মোরে হে চিরবিরাম, তোমার রথের 'পরে।
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে!"

"তাঁর গানের বইয়ে এর চেয়ে করুণ গান আর আছে কিনা জানি না। গান শেষ করার পর নিজেও পাঁচ মিনিট ধরে কথা কইলেন না বা কথা কইতে পারলেন না। আমরাও কি বলে কথা আরম্ভ করব বুঝতে না পেরে নিশ্চুপ বসে রইলাম। অতুলদাই প্রথম একটা সাধারণ কথা দিয়ে কথা আরম্ভ করলেন। গানটি সম্বন্ধে কেউই কোন মন্তব্য করলেন না। পরেও এ গান সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা হয় নি। এদিন যেমন বেদনা ও দারুণ অস্বস্তি মনে উদয় হয়েছিল তেমন আর কোনও গান শুনে কোনও দিনই হয় নি।"[৬]

৬বিজনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়—চিঠি।

১৯২৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর লখনৌয়ে প্রথম এবং শেষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়।

আমিনাবাদ পার্কের এক দিকে হিন্দু মন্দিরে পুজো ও তার অপর দিকে মুসলমানদের নমাজ পড়া এতদিন বেশ শান্ত ভাবেই চলে আসছিল।

মুসলমানরা হঠাৎ দাবি করে বসলেন যে, তাঁদের নমাজ পড়ার সময় মন্দিরে শাঁখ ঘণ্টা বাজানো চলবে না, ওতে ওঁদের প্রার্থনার বিঘ্ন ঘটে। সামীউল্লা বেগ তখন লখনৌয়ে এসেছেন। ঐ কথা শুনে মন্তব্য করেন যে, চব্বিশ ঘণ্টা হর্ন বাজিয়ে মোটর চলছে তাতে প্রার্থনার বিঘ্ন হয় না, মন্দিরে কিছু শব্দ হলেই প্রার্থনার বিঘ্ন হয়!

মুসলমানরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করেন নি। তাঁরা প্রতিবাদ স্বরূপ ১২ই সেপ্টেম্বর ঐ পার্কে সভা আহ্বান করা স্থির করলেন। বলা বাহুল্য হিন্দুরাও ঐ দিন সভা করবেন মনস্থ করলেন।

অবস্থার গুরুত্ব বুঝে সরকার থেকে ঐ দিন সভা সমিতি করা নিষিদ্ধ হল। এক পক্ষ এ নিষেধ শুনলেন, অপর পক্ষ শুনলেন না। ফলে ঐ দিন বিকেল বেলা থেকে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল।

অতুলপ্রসাদ তখন কোর্টে। দাঙ্গার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দু-মুসলমান বন্ধুদের নিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনতে ছুটে যান। দায়িত্বপূর্ণ রাজপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অবিলম্বে দাঙ্গা বন্ধের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানান।

রাজপুরুষেরা শুনে মন্তব্য করেন, 'তবেই বুঝুন মিস্টার সেন, আমরা চলে গেলে আপনাদের দেশের কী পরিণতি হবে।'

অতুলপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, 'পরিণতি তখন খুবই শান্তিপূর্ণ হবে কারণ, অশান্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করতে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ থাকবেন না।'

অতুলপ্রসাদ তাঁর প্রকৃতিতে এমনিই স্পষ্টবাদী, নির্ভীক ছিলেন।

১৯০৬ সালে র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে সরেজমীনে তদন্ত করতে এদেশে আসেন। লখনৌয়ে তিনি অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করেন। সে সময়ে অতুলপ্রসাদের প্রতি নজর রাখতে বৃটিশ সরকার দুজন গোয়েন্দা নিযুক্ত করেন। একদিন র‍্যামজে সাহেব অতুলপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, মিস্টার সেন, দুটি লোক কেন সর্বদা পিছন পিছন ঘুরছে? উত্তরে

সহাস্যে অতুলপ্রসাদ রহস্য করে বললেন, "তোমাদের রাজকর্মচারীরা আমার জন্য দুটি দেহরক্ষী নিযুক্ত করেছেন।"[৭]

॥ তেতাল্লিশ ॥

১৯২৫, বাংলার ১৩৩১ সাল, চৈত্রমাস। ১৯২২-এ কানপুরে 'বঙ্গ সাহিত্য সমাজ'-এর বার্ষিক উৎসবে অতুলপ্রসাদ যে বীজটি বপন করেছিলেন সেই প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন মাত্র তিন বছরের মধ্যে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। কাশী প্রয়াগ প্রদক্ষিণ করে আজ তা উদ্যান নগরী লখনৌয়ে সাহিত্যের সৌরভ বিকিরণ করতে এসেছে, বাঙালী সমাজে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে।

অতুলপ্রসাদের মুহূর্তের বিশ্রাম নেই, তিনিই এ সম্মেলন ডেকেছেন। তাঁর ওপর সব দায়িত্ব। সে দায়িত্ব বহনে তাঁর আনন্দের সীমা নেই, সাহিত্য তাঁর প্রাণের জিনিস, মানুষের জীবনে তার প্রয়োজনীয়তাও তিনি বোঝেন। প্রবাসী বাঙালী বাংলার সবচেয়ে বড় সম্পদ—সাহিত্য, তার সঙ্গে পরিচিত হবে না, তাকে জানবে না এ যেন তাঁর কাছে এক অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। তিনি নিজে একজন কবি, সাহিত্যসেবী; বাংলা সাহিত্যের জন্য তাঁর গর্বের সীমা নেই। তাই তাঁর দায়িত্বেরও শেষ নেই।

লখনৌর বিশিষ্ট বাঙালীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবর্গ, বঙ্গীয় যুবক সমিতির সভ্যরা সবাই অতুলপ্রসাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন, লখনৌ শহর আদব-কায়দা ভদ্রতার জন্য বিখ্যাত, আজকের সাহিত্য যজ্ঞে যেন কোথাও ত্রুটি না থাকে, নিন্দে না হয়।

সাহিত্য সভার মূল সভানেত্রী সরলা দেবী চৌধুরাণী অতুলপ্রসাদের বিশিষ্ট অতিথি; পরিচয় অনেক দিনের।

ডেলিগেটরা এসে উঠেছেন চার্চ মিশন স্কুল-ভবনে যা 'বর্তমানে ন্যাশন্যাল হেরাল্ড' পত্রিকার অফিস।

বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতি-র প্রাঙ্গণে অধিবেশনের আয়োজন হয়েছে।

অতুলপ্রসাদ রচিত উদ্বোধন সঙ্গীতের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অতুলপ্রসাদ সুমধুর কণ্ঠে তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণটি পাঠ করলেন :—

৭—বেলা সেন—"স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেন"।

স্বাগত সুধীমণ্ডলী,

আপনারা লক্ষ্ণৌ নিবাসী বাংগালীগণের বিনম্র নমস্কার গ্রহণ করুন। অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি। এ সাহিত্যোৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। আপনাদের অভ্যর্থনা ও আতিথ্যের যথোচিত আয়োজন করিতে পারি নাই; সে ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাহিতেছি।

হয়ত আপনারা ভাবিতেছেন যে নবাবপ্রধান লক্ষ্ণৌ শহরে নবাবোচিত সৌজন্য ও আতিথ্যের বিপুল ব্যবস্থা হইবে। সত্য, এককালে লক্ষ্ণৌ নগর প্রচুর সুখ স্বচ্ছন্দতা, মনোরম সৌজন্য ও অপরিমেয় আতিথেয়তার জন্য সর্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছিল; একদিন সচ্ছল—অবকাশসাপেক্ষ মধুর সংগীতে এদেশ ঝংকৃত হইত; ঐশ্বর্যপরিপুষ্ট শিল্পকলা এ দেশে সকলের মনোরঞ্জন করিত। লক্ষ্ণৌর রাজগণ যদিও কুক্কুট কিংবা বটের সংগ্রামে যেরূপ পারদর্শী ছিলেন রাজ্যশাসন বিষয়ে তদ্রূপ দক্ষ ছিলেন না তথাপি তাঁহাদের অধিকাংশই উদারচেতা ও মুক্তহস্ত ছিলেন। মচ্ছিভবনের অধিষ্ঠাতা নবাব আসফদ্দৌলা সাহেবের দানশীলতা এরূপ জনশ্রুত ছিল যে, এখনও চৌকের কোন কোন বণিক প্রাতে আপনার বিপণিদ্বার উদঘাটন করিবার পূর্বেই এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করে:—

জিস্‌কো ন দে মৌলা
উস্‌কে দে আসফদ্দৌলা

অর্থাৎ যাহাকে ভগবান বঞ্চিত করেন, আসফদ্দৌলা তাহাকে বঞ্চিত করেন না।

জনপ্রবাদ আছে যে, লক্ষ্ণৌর উদ্যানের অপূর্ব শোভা ও পুষ্পসম্পদ ভূত-কালে নন্দনেও এত খ্যাতিলাভ করিয়াছিল যে, একদা নন্দনের উদ্যানপালক লক্ষ্ণৌর কুসুমসম্ভারের শোভা নিরীক্ষণ করিবার জন্য লালায়িত হইলেন; এবং দেবগণের অনুমতিক্রমে কিছুদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিয়া মর্ত্যভূমের উদ্যানভূমি লক্ষ্ণৌ নগরে অবতীর্ণ হইলেন; কিন্তু অনতিকাল পরে স্বর্গরাজের নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন—'দেবরাজ, ক্ষমা করিবেন, আমি আর নন্দনে ফিরিতে পারিব না।' কিন্তু যেদিন হইতে লক্ষ্ণৌর বাদশাহ 'ছোর চলে লক্ষ্ণৌ নগরী, যেদিন হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার শোষণযন্ত্র এ দেশের বক্ষস্থলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সেদিন হইতে কমলার অনুকম্পা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে, বিশ্বকর্মাও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমাদের অভ্যর্থনার দারিদ্র্য সেই অপহৃত

বৈভবের অনুকৃতি মাত্র। 'ভুখা নবাবের' দেশে ভুখা বাঙগালীর নিমন্ত্রণ তাই এত সাজ-সজ্জাহীন।

কিন্তু যদিচ লক্ষ্ণৌর পুরাতন গৌরবরশ্মি নিতান্ত হীনপ্রভ হইয়াছে তথাপি এ মহানগরী সম্পূর্ণ হতশ্রী হয় নাই। এখনও এদেশ শস্যশ্যামলা ; এখনও পূতসলিলা বঙ্কিমগতি গোমতী তাহার শীতল আলিঙ্গনে এ দেশকে সুশীতল করিতেছে। এখনও লোহিতাভ সন্ধ্যায় যখন লক্ষ্ণৌর সমাধি-সৌধের উচ্চ মুকুট এবং শৃঙ্গাবলী আকাশপটে চিত্রিত হয় তখন গত গৌরবের ধূসর স্মৃতিতে আমাদের নয়ন মধুর বিষাদে আদ্র হয়। যদিও প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ লক্ষ্ণৌ নগরী হইতে চিরবিদায় লইয়াছেন তথাপি এখনও লক্ষ্ণৌর রাজপথ পথচারীর সুললিত সঙ্গীতে মুখরিত। এখনও সুকবিগণ তাঁদের 'মারসিয়া' সঙ্গীতে হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে সকলের চিত্তবিনোদন করেন। এখনও 'মুসায়েরা' সম্মিলনে ধনী ও দরিদ্র, সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত কাব্যামোদিগণ একাসনে বসিয়া একপাত্র কাব্যসুধা পান করেন। পুরাতন শিল্পকলা ও কারু-কার্য যদিও এখন নিঃশেষপ্রায় তথাপি তাহার ক্ষীণাবশিষ্ট এখনও বিদ্যমান। যদিও মুসলমান-রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সভ্যতার প্রতিপত্তি প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে তথাপি এখনও অসামান্য সৌজন্য উর্দু ভাষার অপূর্ব সৌষ্ঠব, কথোপকথনের মোহন প্রণালী, মনোহর ভাষাবিন্যাস ইংরাজি সভ্যতার বাহ্যিক নিদর্শন তিরোহিত হয় নাই। অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, আমাদের লক্ষ্ণৌ নগরী উত্তরোত্তর পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভের পথে অগ্রসর হইতেছে। হয়ত অচিরে লক্ষ্ণৌ নবীন সম্পদে সম্পন্ন এবং নবীন গৌরবে গৌরবান্বিত হইবে।

তিন বৎসর পূর্বে কানপুরে কতিপয় সাহিত্যপ্রেমী বাঙ্গালী বহির্বঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যকতা অনুভব করিয়া এই সাহিত্য সম্মেলনের সূচনা করেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট চির-কৃতজ্ঞ। যাঁহারা এই মহাব্রত সাধনের প্রথম পথ প্রদর্শক তাঁহাদের মধ্যে আমাদের পরমবন্ধু কানপুরের জনপ্রিয় শুভকর্মী লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় অন্যতম। তৎপরবৎসর ভাগীরথী তীরে পুণ্যভূমি কাশী নগরে তথাকার সাহিত্যানুরাগী ও উদ্‌যোগী বাঙ্গালীগণ বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের এক চিরস্মরণীয় মহাসভার অনুষ্ঠান করেন। বর্তমান সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠতম কবি অতুল-প্রতিভাসম্পন্ন বাঙ্গলার কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সে সাহিত্য যজ্ঞের

পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়া সে অনুষ্ঠানের সফলতা সম্পাদন করেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার অপূর্ব অভিভাষণে শ্রোতৃবর্গ মগ্ধ হইয়াছিলেন।

গত বৎসর গঙ্গা যমুনার সঙ্গিস্থলে পবিত্র প্রয়াগ নগরীতে এই সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হয়; সেখানের কৃতী ও সাহিত্য-সেবী বাঙ্গালীগণ অতি সুচারু রূপে সম্মিলনের কার্য সুসম্পন্ন করেন। বাঙ্গলা সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রবাসী কুল গৌরব রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সে সভার সভাপতিত্বে বৃত হন; কিন্তু অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি সে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই; তাঁহার মনোরম ও সারগর্ভ অভিভাষণ সভাস্থলে পঠিত হয়। তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রমথনাথ তর্কভূষণ সভাপতির কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

এ বৎসর লক্ষ্ণৌ সে সৌভাগ্যের অধিকারী। কাশী কিংবা প্রয়াগের ন্যায় এ নগর তীর্থভূমি নহে; তথাপি এ প্রদেশ পুণ্যভূমি। পূর্বদিকে পুণ্যতোয়া সরযূর উপকূলে রঘুকুলমণির রাজধানী অযোধ্যা নগরী—অধুনা দেবমন্দির-সমাকুল তীর্থভূমি। পশ্চিমে গোমতী তীরে মহাভারত রচয়িতা ঋষিকুল পুঙ্গব বেদব্যাসের পবিত্র তপোবন নৈমিষারণ্য। উত্তরে দেবত্রাতা আত্মত্যাগের চরম আদর্শ রাজর্ষি দধীচির সমাধিভূমি এবং তীর্থসমূহের মিশ্রণভূমি মিশ্রিখ। দক্ষিণে পূতসলিলা জাহ্নবী। কেন্দ্রস্থলে বিনয়াবতার লক্ষ্মণদেবের রাজধানী ক্ষুদ্রগ্রাম লক্ষ্মণপুর—যে স্থলে আজ বৃহৎ লক্ষ্ণৌ মহানগরী বিরাজিত। আমরা অযোগ্য হইলেও ভারতীর পূজার জন্য এ দেশ অযোগ্য নহে।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে,এ ভারতীর পূজায় ভারতীর বরকন্যা ভারতী-সম্পাদিকা অধিনায়িকার পদ গ্রহণ করিয়াছেন। বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া কর্মসাধনার পঞ্চধারার মধ্যেও যে তিনি বাঙ্গলা-সাহিত্য-সেবা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন ইহা প্রবাসী বাঙ্গালীদের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার বিষয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই বিদুষী মহোদয়ার নেত্রীত্বে ও সস্নেহ পরিচর্যায় আমাদের এই প্রবাসী সাহিত্য-শিশু স্বাস্থ্য ও সৌষ্ঠবে বর্ধিত হইবে।

আমাদের এই নবীন শিশুটি আমাদের এত আদরের যে ইতিমধ্যেই ইহার একাধিকবার নামকরণ হইয়া গিয়াছে। প্রথমে ইহার নাম রাখা হয় 'উত্তর ভারতীয়-প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন'। গত বৎসর ইহাকে 'প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যদিও এ সম্মিলন বাঙ্গালার বহির্ভূত

বাঙালী মাত্রেরই সম্মিলন হয় তবে উহাকে 'উত্তর ভারতীয়' বলা সঙ্গত নহে, কেননা মধ্য ভারত ও দক্ষিণ ভারতে বাঙালী বাস করেন, তাঁহারাওএ সম্মিলনের সভ্যপদের অধিকারী।

'প্রবাসী' নামটি অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত; কিন্তু এ নামটি সম্পূর্ণ নিরাপত্তিতে গ্রহণ করা চলে না; ইহার কারণ প্রধানতঃ এই যে, এদেশে বহু-সংখ্যক বাঙালী এমন আছেন যাঁহারা দীর্ঘকাল হইতে এবং বংশপরম্পরায় এখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন; তাঁহাদিগকে ঠিক প্রবাসী বলা চলে কিনা সন্দেহ। তারপর 'প্রবাসী' শব্দ দূরত্বব্যঞ্জক ও আগন্তুকতার পরিচয়; বাঙালী এবং এদেশবাসী সকলেই আমরা ভারতমাতার সন্তান, সুতরাং ভারতে বাস করিয়া নিজেকে 'প্রবাসী' বলা সমীচীন বোধ হয় না। আমরা নিজ বাসভূমে পরবাসী নহি, বরঞ্চ যদি আমরা নিজেকে পরবাসভূমে নিজবাসী বলিয়া মনে করিতে পারি তবেই প্রশস্ততার সমর্থন করা হইবে। তবে নামকরণ লইয়া আমি পুনরায় মতান্তর কিংবা আলোচনা সৃষ্টি করিতে চাহি না। সম্মিলনের সদুদ্দেশ্য সিদ্ধিই আমাদের মুখ্য সাধনা, নামকরণ অতিশয় গৌণ।

এমন বাঙালী বোধ হয় কেহই নাই যাঁহারা সাহিত্য-সম্মিলনের উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান: এ দেশবাসী আমরা অনেকেই বহুকাল হইতে মাতৃভাষার প্রচার ও প্রসার সাধন-কল্পে ও বাঙালী জাতির উন্নতি ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা মানসে সম্মিলিত চেষ্টার আবশ্যকতা বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছি। ভগবৎ কৃপায় আমাদের এ উদ্দেশ্য ফলবতী হইবার পূর্বাভাস দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কিন্তু আমাদের এ সম্মিলনকে স্থায়ী ও হিতপ্রদ করিতে হইলে যে নিরলস সাধনা ও দলবদ্ধ প্রয়াসের প্রয়োজন তাহা আমাদের ন্যায় জীবিকান্বেষী ও নিরবসর বাঙালীর সাধ্যায়ত্ত কিনা সে সম্বন্ধে মনে দ্বিধা উপস্থিত হওয়া অস্বভাবিক নহে। তথাপি প্রবাসী বাঙালীদের হৃদয়ে অধুনা মাতৃ-ভাষার প্রতি যে নবীন অনুরাগের উদ্দীপনা দেখিতেছি তাহাতে আশা হয় যে, আমাদের এ নবপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যমন্দির নিতান্ত ভঙ্গুর হইবে না।

অভিনন্দন সমিতির সম্ভাষণে বাঙলা-সাহিত্য-সম্মিলনের সার্থকতা এবং বহির্বঙ্গে বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যের প্রচার ও উৎকর্ষতা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়ত সুশোভন হইবে না। কেবল সংক্ষেপে আমার ২।১টি বক্তব্য নিবেদন করিবার অনুমতি চাহিতেছি। প্রবাসী বঙ্গ সন্তানগণের অন্তত বৎসরান্তে একবার সাহিত্যোৎসবে সম্মিলিত হওয়ার সফলতা বহুবিধ।

কেবলমাত্র সামাজিকতার দিক দিয়া বিচার করিলেও ইহার উপকারিতা অতি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। সামাজিক পরিচয় ও আত্মীয়তার সাফল্য হয়ত কেহই অস্বীকার করিবেন না। অথচ প্রবাসী বাঙ্গালী আমরা অনেকেই পরস্পরের নিকট অপরিচিত। বরঞ্চ অনেক স্থলে বাঙ্গলা দেশের বাঙ্গালীদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ অধিকতর ঘনিষ্ঠ। আমাদের অভাব, আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির অন্তরায়, ভবিষ্যৎ উন্নতির পন্থা, আত্মরক্ষার এক উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু একত্র হইবার সুযোগ না থাকায় পরিচয় ও ভাব বিনিময়ের অভাবে আমরা বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের সহায়তা হইতে বঞ্চিত; সুতরাং আমরা দুর্বল। যদি সাহিত্যসূত্রে আমরা কখনও কখনও একত্র হইতে পারি এবং আমাদের শুভাশুভের আলোচনা করিবার অবসর পাই তবে আমাদের সমূহ লাভ, ইহা সকলের স্বীকার্য।

প্রবাসে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতিসাধন করিতে হইলে সাহিত্য-সম্মিলন অপরিহার্য। এ দেশে সাহিত্য সাধনা কি প্রকার হইতে পারে, কোন পন্থা প্রশস্ত সে সম্বন্ধে বিবেচ্য বিষয় অনেক আছে; তন্মধ্যে মাত্র দুটি একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

সর্বপ্রথমে আমাদের কর্তব্য প্রবাসে বাঙ্গালী বালক-বালিকাদিগের বাঙ্গলা শিক্ষার সুব্যবস্থা করা। যেখানে বহুসংখ্যক বাঙ্গালীর বাস সেখানে সুপরিচালিত বাঙ্গলা স্কুল স্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা ব্যয়সাপেক্ষ সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি সকলের নিজের উপার্জনের এক ক্ষুদ্রাংশও এ উদ্দেশ্যে ব্যয় করেন, তবে তথায় অন্ততঃ মেয়েদের একটি পাঠশালা উত্তমরূপে চলিতে পারে।

প্রবাসে বাঙ্গালীদের বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বোধ হয় নিতান্ত অল্প হইবে, কিন্তু যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার খুব সুবন্দোবস্ত আছে এরূপ বিদ্যালয় বিরল। তাহার কারণ এ বিষয়ে আমরা কথঞ্চিৎ অলস ও উদাসীন। যাহাদের সংগতি অল্প তাহারা যদি আপন পুত্র কন্যাদের শিক্ষার ব্যয় বহন করে তাহা হইলেই যথেষ্ট, কিন্তু যাহাদের সাংসারিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল, তাহাদেব এ সম্বন্ধে গুরুতর দায়িত্ব আছে। তাহাদের দরিদ্র বাঙ্গালী ভাইদের পুত্র কন্যারা যদি অর্থাভাবে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিতে না পারে তাহা হইলে তাহাদের সাংসারিক সচ্ছন্দতা নিরর্থক।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা দেব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের

বংশধর, ৺তারক পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের স্বজাতি। আমাদের নিকট বিদ্যা বিতরণ বিষয়ে দানশীলতার পরম সার্থকতা কেবলমাত্র শাস্ত্রের অনুশাসন নহে; উহা প্রত্যক্ষীকৃত সত্য; বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এ ব্রতে সিদ্ধ স্বার্থ-ত্যাগী পুরুষের অভাব নাই।

তৎপর বাঙ্গালী জনসাধারণের মধ্যে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রচার করিতে হইলে, যেখানে যেখানে সম্ভব বাঙ্গলা পুস্তকাগার সংস্থাপন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। লাইব্রেরী সংক্রান্ত একটি কথা নিবেদন করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি। পুস্তকালয়ের উদ্দেশ্য পাঠক সাধারণের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তার করা। যে সাহিত্য পাঠে মনের উচ্চ বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হয় সেই সাহিত্য পাঠে জন-সাধারণকে প্রলুব্ধ করাই পুস্তকালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। জনসাধারণ যাহা পাঠ করিতে চায় শুধু ততো সংগ্রহ করাই পুস্তকাগারের কর্তব্য নহে, উহা পুস্তক বিক্রেতার লক্ষ্য হইতে পারে। লঘু সাহিত্যের প্রতি স্বতঃই লোকের আকর্ষণ অধিক; যে সাহিত্য চিন্তাশক্তিকে সক্রিয় করে তৎপ্রতি সাধারণের দৃষ্টি অল্প। তাই সচরাচর পুস্তকাগারে গল্প ও উপন্যাসের বাহুল্য দেখিতে পাই। সে বিষয়ে আমাদের একটু সতর্ক হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গলা ভাষায় সুখপাঠ্য সদ্‌ গ্রন্থের অভাব নাই; লোকের মনোরঞ্জন করিতে হইলেও কেবলমাত্র হা হতোস্মি পূর্ণ কিংবা রোমাঞ্চক সাহিত্যের স্মরণাপন্ন হইবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু আজকাল লঘু সাহিত্য যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যেরূপ ত্বরিতগতিতে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে মনে আশাঙ্কা হয়; গল্প-সাহিত্যের অসামান্য কালের বৃদ্ধি দেখিয়া মনে ভীতির সঞ্চার হয়। আজকাল এক শ্রেণীর ছোট গল্পের প্রাবল্য দেখা যায়; এগুলিতে প্রশংসার যোগ্য যদি কিছু থাকে তাহা এই যে, সেগুলি ছোট। পাঠক সমাজকে বিশেষতঃ পাঠাগার সংস্থাপকদিগকে এ সাহিত্যের প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষার জন্য সচকিত হইতে অনুরোধ করি। বাঙ্গলা সাহিত্যে অনেক অমূল্য রত্ন ভাণ্ডার ক্রমেই নূতন ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যশালী হইতেছে; অতি অল্পকালের মধ্যে সুলেখক ও সুসাহিত্যিকের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে; পাঠক সমাজকে আজকাল অন্য সাহিত্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। প্রায় সকল প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হইয়াছে এবং হইতেছে। তবে আমাদের সাহিত্যের পরিমাণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবর্জনাও বাড়িতেছে; সুতরাং প্রবাসী পাঠক সমাজের একটু সাবধান হওয়া আবশ্যক। এক প্রকার নব্যসাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে।

তাহার গতিবিধি আমার নিকট শিব কিংবা সুন্দর বলিয়া মনে হয় না। উহার ভাব, ভাষা ও ভংগী আমাদের সাহিত্যকে লঘু করিতেছে। উহার ভাব নিতান্তই প্রচ্ছন্ন, ক্ষীণ এবং কখনও কখনও মলিন ; ভাষা অযথা উদ্বেলিত ও তরল, ভংগী অন্যের অনুকারী এবং কৃত্রিম। এ দলের সাহিত্যিকেরা এবং এ সাহিত্যের পাঠকেরা না বুঝিতে পারার আনন্দে বিভোর। মহাকবি কালিদাস হইলে বলিতেন—"ইহাদের বাক্ আছে অর্থ নাই ; পার্বতী আছে পরমেশ্বর নাই।" প্রবাসী পাঠকবর্গ এবং নবীন সাহিত্যিকেরা যেন এ সাহিত্যের মোহমুগ্ধ না হন।

প্রবাসী বাংগালীদের মধ্যে সাহিত্য-সাধনার একটা প্রবল ইচ্ছা দেখা দিয়াছে তাহার ফলে বাংগালীবহুল কাশী নগরী হইতে কয়েকটি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে "অলকা" অলক্ষিত, প্রবাস-জ্যোতিঃ নির্বাপিত প্রায়। সম্প্রতি সাহিত্যপ্রেমী শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী কাশীধাম হইতে "প্রবাসী বাংগালী" নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করিতেছেন, আমি তাঁহার সাহিত্যোৎসাহের প্রশংসা করি এবং তাঁহার সুলিখিত পত্রিকার স্থায়িত্ব কামনা করি। আমি কিন্তু তাঁকে একটি মনোরম ও সারগর্ভ মাসিক পত্রিকা সম্পাদন বিষয়ে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। পত্রিকাখানি সচিত্র হইবে। উত্তর ভারতে আজকাল একাধিক খ্যাতনামা বাংগালী চিত্রশিল্পী বাস করেন। আমার বিশ্বাস এ বিষয় শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সারদা চরণ উকিল প্রমুখ চিত্রবিদ্যা বিশারদ বাংগালীদের সহায়তা অনায়াসে পাইতে পারি। সুপ্রতিশ্ঠিত সাহিত্যিক বন্ধুবর ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন এরূপ আশাকরি। পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ এবং লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনেক সুযোগ্য বিদ্বান বাংগালী অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা অনেকে সাহিত্যিক ও সুলেখক। তাঁহারা কষ্ট স্বীকার করিলে অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধাদি এ পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে পারে। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার প্রমুখ প্রবাসী ঐতিহাসিকেরা এ দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধীয় অনেক অনাবিষ্কৃত তথ্য প্রকাশিত করিতে পারেন। যাঁহারা উর্দু ভাষায় পারদর্শী তাঁহারা দাগ, গালিব জোখ, আমির, আতস্, রতননাথ, আকবর, হালি প্রভৃতি সুকবিগণের কাব্য-ভাণ্ডার হইতে রত্ন সঞ্চয় করিয়া আমাদের বাংগলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন। যাঁহারা হিন্দী ভাষায় সুশিক্ষিত, তাঁহারা তুলসীদাস, সুরদাস, কবীর,

বিহারীদাস, কেশবদাস, ভূষণ, মীরাবাঈ, রসখান, পদ্মাকর, রহিম, হরিশ্চন্দ্র, প্রতাপ, শ্রীধর পাঠক প্রমুখ প্রসিদ্ধ হিন্দী কবিগণের কাব্যকুসুম হইতে মধু আহরণ করিয়া আমাদের মধু-চক্রটিকে আরো মধুময় করিতে পারেন। এ দেশের তীর্থাদি, জনপ্রবাদ, লোকাচার ইত্যাদি সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উপকরণ যথেষ্ট বিদ্যমান। আমার ধারণা, এ সব উৎকৃষ্ট উপাদান অবলম্বন করিয়া যদি একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রবাসে নিয়মিতরূপে সম্পাদন করা যায় তাহা হইলে বহির্বঙ্গীয় বাঙ্গালীগণের মাতৃসাহিত্য সেবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করা হইবে, সাহিত্যপ্রেমিকদিগকে মাতৃভাষায় প্রবন্ধ ও কবিতাদি রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ করা হইবে। প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের জাতীয়তা রক্ষা ও উন্নতিসাধন বিষয়ে চিন্তাশীলেরা এ পত্রিকায় আলোচনা করিবেন। বাংগলা সাহিত্য আমাদের অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আরো সমৃদ্ধ হইবে। আমি এ বিষয়ে সাহিত্য সম্মিলনের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

প্রবাসী বাঙ্গালীর আর একটি দায়িত্ব আছে যাহা সাহিত্যসেবী বাঙ্গালীদের মনে রাখা কর্তব্য। যাহাতে বাঙ্গালী জাতি ভিন্ন এদেশীয়দের মধ্যে বাংগলা সাহিত্যের প্রতিপত্তি ও প্রসার সংসাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে আমাদিগকে যত্নবান হইতে হইবে। আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে আধুনিক হিন্দী ভাষা অনেকটা বাংগলা ভাষার অনুকরণে গঠিত হইতেছে। হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী ভাষায় বাংগলা সাহিত্যের বিস্তর গ্রন্থাদি অনুবাদিত হইয়াছে— বিশেষতঃ বাংগলা গল্প ও উপন্যাস। আমার বোধ হয় বাংগলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশিত করিলে এবং অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি সংক্ষিপ্ত টিকাসহ বাংগলা অক্ষরে মুদ্রিত করিলে আদান-প্রদানের দ্বারা বাংগলা সাহিত্যের সম্পদবৃদ্ধি তো করা হইবেই, অন্যান্য ভারতীয় ভাষাকেও আমাদের বাংগলা সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত করা হইবে। আজকাল ভারতের অন্য প্রদেশীয় সাহিত্যিকেরা বাংগলা সাহিত্য সাদরে শিক্ষা করিতেছেন। হয়ত কালে আমাদের বাংগলা সাহিত্য বিশ্বভারতের সাহিত্য হইবে। প্রবাসী বাঙ্গালীদের যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারাই আমাদের এ অভিষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে।

প্রবাসী বন্ধুগণ, আপনাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, আজ আমি কৃতার্থ বোধ করিতেছি; সম্মিলনের শুভফল অবশ্যম্ভাবী—যদি আমরা আমাদের গুরুদায়িত্ব সকল ভুলিয়া না যাই। মনে রাখিবেন আমাদিগকে বঙ্গবাণীর

পূজার জন্য নূতন উপচার সংগ্রহ করিতে হইবে। নূতন ভূষায় তাঁহাকে ভূষিত করিতে হইবে; বিবিধ সাহিত্য-কুসুম হইতে পরিমল সংগ্রহ করিয়া আমাদের মধুভাণ্ডারকে আরো মধুর করিতে হইবে। সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ আজ বিশ্বজগতে আমাদের সাহিত্যকে যশস্বী করিয়াছেন; ভারতের দেশ-বিদেশে প্রবাসী বাঙ্গালীগণ বাঙ্গলা সাহিত্যের মহৎ বার্তা বহন করিবেন এবং প্রচার করিবেন। আমাদের সাহিত্য সত্য, শিব ও সুন্দর। এই সত্য শিব সুন্দরের মন্দির ভারতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বাঙ্গালীর সর্বোচ্চ সম্পদ তাহার সাহিত্য; ইহাকে সযত্নে রক্ষিত ও বর্ধিত করিতে হইবে।

সাহিত্য-প্রেমী বন্ধুগণ, আমরা বহুদিন পরে প্রবাসে বঙ্গবাণীর উৎসব-মন্দির স্থাপন করিলাম। পুরোহিত কিংবা উপাসকের অভাব হইবে না; কিন্তু ইহাকে চিরস্থায়ী করিতে হইলে হৃদয়ে ভক্তি চাই; গভীর নিষ্ঠা চাই; প্রচুর ধৈর্য চাই—নতুবা আমাদের সাহিত্য-সাধনা নিষ্ফল হইবে। ক্ষণিক উৎসাহ কিংবা ভাবুকতায় আমাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে না; কার্যতৎপরতা, অধ্যবসায়, শৃঙ্খলা, স্বার্থত্যাগ, পরার্থপরতা এ সদগুণ সমূহের সমাবেশ হইলে তবে আমরা সফল হইব। ভগবৎচরণে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের সাহিত্য-সেবা সার্থক করুন।

পুনরায় আমি শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিনিধি মহোদয়গণকে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। আপনারা ভক্তিভরে ভারতীর পূজায় প্রবৃত্ত হউন।

প্রবাসে সাহিত্য সভার সঙ্গে সঙ্গে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সাহিত্য পত্রিকার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি মনে মনে অনুভব করতেন। তাই নিজের ভাষণে সেই প্রয়োজনের কথা পরিস্ফুট করলেন। সুরেশবাবু যখন 'প্রবাস-জ্যোতির' প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে প্রথম এসেছিলেন তখন তাঁর আনন্দ ও উৎসাহের সীমা ছিল না। কিন্তু একটির পর একটি সাহিত্য পত্রিকা যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি অল্পকালের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে তিনি অনুভব করেছিলেন তার কারণ কি। তাই বাংলা সাহিত্য পত্রিকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ওপর দিতে চাইলেন।

লখনৌয়ে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সাহায্যে একটি বাঙ্গলা সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করা হল।

সেই পত্রিকার নামকরণ হল 'উত্তরা'; করলেন অতুলপ্রসাদ। তিনিই

'উত্তরা'র কার্যকরী সমিতির সভাপতি এবং সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় যুগ্ম সম্পাদক ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন। উত্তরার জন্মকাল-সম্ভাবনা থেকেই যত দায়দায়িত্ব তিনি বহন করেছেন, আর্থিক কর্ণধার হিসাবেও দায়দায়িত্ব তাঁর। 'উত্তরা' কি করে, কি ভাবে প্রকাশ হবে, কি করে কোথায় সাহায্য পাওয়া যাবে এজন্য সহ-সম্পাদক সুরেশবাবু বার বার তাঁর কাছে ছুটে এসেছেন এবং যখনি অর্থের প্রয়োজন হয়েছে তিনি দিয়েছেন।

সাহিত্য সম্মেলন শেষ হল। সভ্যরা সব আনন্দ প্রকাশ করে ও ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলেন। অতুলপ্রসাদ অধিবেশনের দায়িত্ব মুক্ত হলেন, কিন্তু 'উত্তরা'র দায়িত্ব ও চিন্তায় তাঁর শান্তি নেই।

পত্রিকা প্রকাশের জন্য ব্যয়ভার আছে। পরিচালক সমিতিতে স্থির হয় যে পাঁচশো গ্রাহক ও এক হাজার টাকা নগদ হাতে নিয়ে তবে 'উত্তরা' প্রকাশের কাজে অগ্রসর হওয়া যাবে। সে উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানের সভ্যদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত রূপ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল: লখনৌ—৩০০৲, এলাহাবাদ—২০০৲, কাশী—১০০৲, কানপুর—২০০৲, আগ্রা—৫০৲, লাহোর—৫০৲, ফয়জাবাদ ২৫৲, ইন্দোর ২৫৲, আজমগড় ৫০৲ ও অন্যান্য সংস্থা থেকে ২৩৫৲।

কিন্তু তারপর অনেকদিন কেটে গেল, না কোন উচ্চবাচ্য, না পাওয়া গেল প্রতিশ্রুতি মত টাকা। অতুলপ্রসাদ ইতিমধ্যে পারিবারিক ব্যাপার এবং নিজের শরীর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কাশীতে সুরেশ চক্রবর্তী চিন্তিত তবে তিনি অতুলপ্রসাদের কাছ থেকে আহ্বানের অপেক্ষা করতে লাগলেন। অতুলদাই তো তাঁর আশাভরসা।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

হেমকুসুম ক্যান্টনমেন্ট রোডের একটি বাড়িতে কিছুদিন থাকার পর দিলীপকুমার সহ ডেরাদুন চলে যান এবং সেখানেই থাকতেন। অতুলপ্রসাদ তাঁকে মাসে মাসে টাকা পাঠাতেন, বিদেশে যেন ওঁরা কোন কষ্টে না পড়েন।

ডেরাদুনে এক রবিবারে হেমকুসুম তাঁদের এক বিশিষ্ট বন্ধুর বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে টাঙ্গায় উঠতে গিয়ে পড়ে যান ; পড়ে গিয়ে তাঁর পেলভিস্ বোন্ ভেঙে যায়।

এ খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠিত অতুলপ্রসাদ ডেরাদুনে চলে এলেন। হেমকুসুমের অবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ডাঃ জ্যোতিলালকে খবর দেওয়া হল।

জ্ঞান ফিরে এলে অতুলপ্রসাদকে শয্যাপার্শ্বে দেখে হেমকুসুম যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত—তিনি স্বপ্ন দেখছেন না তো ? অভিমান মিশ্রিত খুশিতে তাঁর দু চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। জিজ্ঞাসাও করলেন, তুমি সত্যি এসেছ ?

—কেন, এখনও কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু এখন কোন কথা নয়, চুপ করে শুয়ে থাক, বললেন অতুলপ্রসাদ। তাঁর ইচ্ছা ছিল হেমকুসুমকে সঙ্গে করে লখনৌ নিয়ে যান। এরপর এতদূরে একা একা রাখা নিরাপদ নয়। কিন্তু তাঁর অবস্থা এখন নিয়ে যাবার মত নয়। এখানেই তাঁকে ডাঃ জ্যোতিলালের চিকিৎসায় থাকতে হবে। যদি সাধারণ চিকিৎসায় ভাল না হয় জ্যোতিলাল বললেন—তিনি ইলেকট্রো চিকিৎসা করে দেখবেন।

কিন্তু অতুলপ্রসাদের তো এখানে বসে থাকলে চলবে না। যা বোঝা যাচ্ছে হেমকুসুমের চিকিৎসা সময় সাপেক্ষ। তাঁর কোর্ট কাছারি আছে, একাধিক জরুরী কেস সর্বদা তাঁর হাতে থাকে। তাঁর অর্থে অনেকগুলি প্রাণী নির্ভর করে—তাঁর টাকায় কারুর সংসার চলে, কারুর পড়া তো কারুর চিকিৎসা। এই সব কারণেই না রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগে ভুগছেন, তবু বিশ্রাম নিতে পারছেন না।

হেমকুসুমকে সব বুঝিয়ে, দিলীপকুমারকে মার সেবাযত্নের উপদেশ দিয়ে জ্যোতিলালের দায়িত্বে হেমকুসুমকে রেখে তিনি দিন কয়েক পরে লখনৌ ফিরে গেলেন।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

অতুলপ্রসাদ ব্যাংকস্ রোড থেকে আউট্রাম রোডে নতুন এক বাংলোয় চলে এসেছেন। ব্যাংকস্ রোডের বাড়ি এখন তাঁর অফিসঘর।

অতুলপ্রসাদ খুবই চিন্তিত, মার শরীর ভেঙে পড়েছে, স্বাস্থ্য ভাল থাকছে না। জীবনে কত শোক পেলেন তিনি। বৃদ্ধ বয়সেও শোকের শেষ নেই। হিরণ কিরণ বিধবা হলেন ; দুজনেই সন্তান শোকাতুরা। প্রভার স্বামীর চাকরি নেই, চাকরিক্ষেত্রে গোলমালের জন্য মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছেন। অতুলপ্রসাদ প্রভাকে তাঁর সন্তানসন্ততিসহ নিজের কাছে এনে রেখেছেন।

বুলবুলের মৃত্যুর পর হেমন্তশশী কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শরীর ভাল থাকছে না, অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শুনে অতুলপ্রসাদ আবার তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। তাঁর সুচিকিৎসার সব রকম ব্যবস্থা করলেন। নিজে মার দেখাশোনা করেন, অবসর সময় মার পাশে বসে থাকেন। মার জন্য তাঁর মনে বড় কষ্ট।

কিন্তু হেমন্তশশীর অবস্থা ক্রমশই অবনতির দিকে এগিয়ে চলল। তিনি একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়লেন।

সেদিন অরুণপ্রকাশ যখন চলে যাচ্ছেন অতুলপ্রসাদ তাঁকে ডেকে বললেন, কাল একটু সকাল সকাল এসো।

পরের দিন সকালবেলা একটু তাড়াতাড়ি অরুণপ্রকাশ অতুলপ্রসাদের নিকট পৌঁছে গেলেন। নিত্য দিনের মত অতুলপ্রসাদ তাঁর বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বেছে বেছে একটি দুটি করে গোলাপ ফুল কেটে নিচ্ছেন। কিসের ইংগিতে চিন্তান্বিত মুখ কিছু উজ্জ্বল, উত্তেজিতও বোধ হয়।

অরুণপ্রকাশ হেমন্তশশীর স্বাস্থ্যের খোঁজ করলেন।

ভাল নেই, অতুলপ্রসাদ বিষণ্ণকণ্ঠে জানালেন, ক্রমশই নিস্তেজ হয়ে আসছেন। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

এবার অরুণপ্রকাশকে সংগে নিয়ে ভেতরে এলেন। চলতে চলতে তিনি পাশের ঘর থেকে একটি মোড়ক নিয়ে বেরিয়ে মার ঘরে এলেন।

হেমন্তশশী নির্জীব ভাবে চোখ বুজে বিছানায় পড়ে আছেন। অতুলপ্রসাদ

তাঁকে ডাকলেন। মোড়ক খুলে একটি বই দেখালেন—তাঁরই রচিত গানের বই —"কয়েকটি গান।" অরুণপ্রকাশকে বললেন, তুমি সাক্ষী থাক এ বই মাকে দিচ্ছি। এতটা বলে মার পায়ের কাছে বইটি ও কিছু গোলাপ ফুল রাখলেন; গ্রীষ্মের দাবদাহের দিনে তাঁর দুচোখ বেয়ে যেন শ্রাবণের ধারা নেমে এলো।

হেমন্তশশী ক্ষীণ হাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

"কয়েকটি গান"-এর উৎসর্গ পত্রে লেখা আছে : পরমারাধ্যা মাতৃঠাকুরাণীর চরণে এই কয়েকটি গান ভক্তিভরে উৎসর্গ করিলাম ॥ অতুল

ইতিমধ্যে অতুলপ্রসাদ নিজেই সর্দি কাশি জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। মা মৃত্যুপথ যাত্রিণী, নিজে অসুস্থ কিন্তু তার মধ্যেও তিনি সামাজিক, সাহিত্যিক নানা মঙ্গল চিন্তায় ব্যস্ত এবং নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন।

সুরেশ চক্রবর্তীর কাছ থেকে চিঠি এলো, 'উত্তরা' আষাঢ় মাসে প্রকাশ হবে, এখন থেকে তার ব্যবস্থা হওয়া চাই, টাকার যোগাড় হওয়া চাই, অতুলদা কি পরামর্শ দেন।

উত্তরে অতুলপ্রসাদ তাঁকে চিঠি লিখলেন—

18 Outram Road,
Lucknow,
21.4.25

স্নেহাস্পদেষু,

আমার শরীর এখনও অসুস্থ, আজ জ্বরটা কম আছে। কাশিটা আছে। বাড়িতে মার পীড়া বাড়িয়াছে, ডাক্তারেরা নিতান্ত সংকটাপন্ন মনে করেন; সুতরাং আমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বুঝিতেই পার। তোমায় আপাততঃ খরচের জন্য ৫০ টাকার Cheque পাঠাইতেছি। আমার বোধ হয় কলেজ বন্ধ হইবার পূর্বে তোমার একবার লক্ষ্ণৌ আসা দরকার; রাধাকমলবাবু এবং রাধাকুমুদবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া এবং পরামর্শ করিয়া কাজে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। আমার কয়েকটি কথা যাহা মনে হয় তাহা এই :

১. সম্মিলনী ঠিক করিয়াছে যে ১০০০৲ এবং ৫০০ গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া তবে কাজ আরম্ভ করা; তন্মধ্যে ১০০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে কিন্তু গ্রাহক সংখ্যা কিছুই স্থির হয় নাই। তাহাদের নামও লিখা হয় নাই। সে কাজটি সকলের আগে।

২. তারপর পরিচালক সমিতির মত না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের কয়েকজনের দায়িত্বে কাগজটা বাহির করা সংগত হইবে না। সুতরাং গ্রহক সংখ্যা (৫০০) সংগ্রহ এবং পরিচালন সমিতির অনুমতি দুই-ই আবশ্যক।

৩. কাগজটি কোথায় কোন প্রেসে ছাপান হইবে তাহাও কয়েকটি প্রেসের terms পাইয়া তবে ঠিক করা বোধহয় যুক্তিসংগত হইবে।

৪. কেহ বলিতেছেন যে শীঘ্রই কলেজ ও স্কুল ছুটি হইবে; এ সময় পত্রিকার প্রকাশ কার্য আরম্ভ করা সমীচীন হইবে না।

যাহা হউক এ সব বিষয় আলোচনা আবশ্যক; তাই আমার মনে হয় তোমার একবার আসা দরকার। বাড়িতে মা মরণাপন্ন পীড়িত না হইলে আমার বাসায়ই তোমাকে থাকিতে বলিতাম। তুমি বোধ হয় পত্র পাইয়া যত শীঘ্র পার আসিলেই ভাল হয় নতুবা প্রফেসররা চলিয়া যাইবেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

পুঃ কাগজটা যদি আমার নিজের হইত—সম্মিলনীর মুখপাত্র না হইত তবে নিজের দায়িত্বেই সব কাজ করিতাম।

অতুল।

এ চিঠি পেয়ে সুরেশ চক্রবর্তী সত্বর লখনৌ চলে এলেন। অতুলপ্রসাদ সুরেশ চক্রবর্তী, রাধাকমল ও রাধাকুমুদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। স্থির হল, 'উত্তরা'র জন্মক্ষণ আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে স্থগিত রাখা হোক। পরে সময় সুযোগ মত সে শুভ কাজ করা যাবে।

হেমন্তশশীর অবস্থা ক্রমশই চিকিৎসার বাইরে চলে গেল। ডাক্তারদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে ও অতুলপ্রসাদের সব উৎকণ্ঠার অবসান করে তিনি ১২ই মে ১৯২৫ সালে মরদেহ ত্যাগ করলেন।

অতুলপ্রসাদ ছোট শিশুর মত কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

"পঞ্চাশ বছরেরও অধিক অতুলপ্রসাদ মায়ের স্নেহ ভোগ করেছেন, কখনও মার অবাধ্য হন নি। মায়ের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল যেন শিশুর মত; অসাধারণ ছিল তাঁর মাতৃভক্তি।"[২]

হেমন্তশশীর শ্রাদ্ধবাসরে অতুলপ্রসাদ প্রার্থনা করলেন—

২—সুবালা দেবী—'অতুলপ্রসাদ' : 'উত্তরা'।

'বিশ্বজননী। সংসারে পাইয়াছিও অনেক, হারাইয়াছিও অনেক। কিন্তু এবার সকলের চেয়ে অমূল্য সম্পদ হারাইলাম।—মা। তুমি আমাকে অনেক সুখে বঞ্চিত করিয়াছ কিন্তু একটি পরম সুখে একদিনের জন্যও বঞ্চিত কর নাই, সেটি অপূর্ব মাতৃস্নেহ। আজ তাহা হইতেও বঞ্চিত করিলে। এক এক সময় মনে হয় এখন কি লইয়া থাকিব, কে আমাদের সকল সুখে সুখী ও সকল দুঃখে দুখী হইবে। শৈশব হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে প্রৌঢ়াবস্থায়, প্রৌঢ়াবস্থা হইতে প্রায় বার্ধক্যে আসিয়া পড়িলাম, মার কাছে চিরকাল শিশু হইয়া রহিলাম। যখন মা বলিয়া ডাকিতাম আর মা যখন অতুল বলিয়া ডাকিতেন তখন ভুলিয়া যাইতাম যে এত বড় হইয়াছি। শৈশবে যেমন স্নেহের শাসন পাইতাম সেদিনও সেইরূপ পাইয়াছি। হায়। আজ তেমন করিয়া শাসন করিবে কে? এই গৃহ রক্ষা করিবে কে? মাতৃহারা হইয়া নিজেকে নিঃসম্বল মনে হইতেছে। বিশ্বজননি! তুমি আমার সহায় হও।"[৩]

অতুলপ্রসাদ কত মাতৃভক্ত ছিলেন এবং প্রৌঢ়াবস্থায়ও কেমন শিশুর মত অসহায় ছিলেন শ্রাদ্ধবাসরে এই 'প্রার্থনা' তার একটি নিদর্শন।

॥ ছেচল্লিশ ॥

১৯২৫, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে যাবার আমন্ত্রণ লিপি পেলেন অতুলপ্রসাদ।

গ্রীষ্মের ছুটিতে কোর্ট কাছারি বন্ধ হলেই অতুলপ্রসাদ বেড়াবার অবসর পান। এই সময়ে তিনি কোন শীতের দেশে গিয়ে তাঁর দুর্লভ অলস সময় ব্যয়িত করে আসেন। নবীনতাও সংগ্রহ করে আনেন।

এ বছরে অতুলপ্রসাদের মাতৃবিয়োগ হয়। মনে হয় কবি সে খবর পেয়েই কোমল হৃদয় তাঁর স্নেহের পাত্রটিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। আশা করেছিলেন আশ্রমের শান্ত পরিবেশে তিনি শান্তি পাবেন।

কবিরও তখন দীর্ঘ অবসর। আশ্রম গ্রীষ্মের ছুটির জন্য বন্ধ। ছাত্র, অধ্যাপক তখনও যাঁরা আছেন কবি তাঁদের জন্য ইংরাজি ও বাংলা কবিতার ক্লাস নিচ্ছেন, তাঁর গান শেখাচ্ছেন। আশ্রমের দিনগুলি এইভাবে বেশ আনন্দেই কেটে যাচ্ছে।

৩—সুবালা দেবী—"অতুলপ্রসাদ": 'উত্তরা'।

কবির আহ্বানে অতুলপ্রসাদ ঐ বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে শান্তিনিকেতনে গেলেন। "দুই গীতকার একত্র হতেই গানের আসর বসতে লাগল। 'দেহলির' কাছে নতুন কলাভবনের দ্বিতলে প্রতি সন্ধ্যায় গানের আসর বসত। গুরুদেব তাঁর সব পুরনো গান গেয়ে শোনাতেন—'মনে রয়ে গেল মনের কথা', 'দে লো সখি দে পরাইয়ে গলে', 'শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা,' 'হেলা ফেলা সারা বেলা, 'তবু মনে রেখ' ইত্যাদি।

"অতুলপ্রসাদও তাঁর গান গেয়ে সকলকে আনন্দ দান করতেন। গাইতেন—'মুরলী কাঁদে রাধে রাধে বলে', 'নিদ নাহি আঁখিপাতে', 'হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর', ও আমার নবীন শাখী' ইত্যাদি।

"গুরুদেব তাঁর গান শুনে খুবই খুশি হতেন। তিনি শান্তিনিকেতনে এলেই যেন সাড়া পড়ে যেত এবং যে কদিন থাকতেন দু'কবির গানে গানে শান্তিনিকেতন মুখর হয়ে থাকত।"[১]

শান্তিনিকেতন থেকে ক'দিন পরে অতুলপ্রসাদ ফিরে এলে কলকাতা থেকে সস্ত্রীক শিশিরকুমার এলেন তাঁর কাছে। বললেন, ভাইদাদা আমাদের সংগে সিমলায় বেড়িয়ে আসবেন চলুন। আমরা ওখানেই যাচ্ছি। শিশিরকুমার জানেন অতুলপ্রসাদ মাতৃবিয়োগের শোকে কত কাতর, তিনি কত শূন্যতা বোধ করছেন; তাঁকে সান্ত্বনা দিতে সংগ দিতেই তো আসা। প্রিয় ভাই শিশিরকুমারকে কাছে পেয়ে অতুলপ্রসাদের আনন্দের সীমা নেই। মা, ভগ্নীরা ও সত্যদাদা ছাড়া এতদিন কোন আত্মীয়ই তাঁর কাছে আসেন নি। অতুলপ্রসাদ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। শিশিরকুমারের সংগ শিশির বিন্দুর মতই সুন্দর। মা মারা যাবার পর এই প্রথম যেন নিজেকে হালকা বোধ করছেন।

প্রতি বছরই তো কোর্ট বন্ধ হলে অতুলপ্রসাদ উত্তর প্রদেশের কোন না কোন শৈলাবাসে যান। এবারেও যাবেন। তবে শৈলাবাসে যদি শিশির-সংগ পাওয়া যায় তো তার আর তুলনা নেই। এবছর সিমলাতেই যাবেন ঠিক করলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই তিনজনে সিমলার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

কত আনন্দের ভেতর দিয়েই না সিমলার দিনগুলি কাটতে লাগল। একদিন শিশিরকুমার বললেন, চলুন ভাই দাদা 'ভোজ্যি' ঘুরে আসা যাক।

ভোজ্যি শতদ্রু-নদীর উৎস। তিনজনে খাবার সংগে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ভোজ্যি চললেন।

১—বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত নোট।

চলার পথের দুধারে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য অতুলপ্রসাদের ব্যথিত মনে যেন শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল—পাহাড়ী উঁচু নিচু রাস্তা উন্নতশির প্রহরীর মত দীর্ঘ দেবদার গাছ পথের দুপাশে যেন প্রহরায় রয়েছে। কতও ঝর্ণা মিষ্টি সুরে গান গাইতে গাইতে নেবে আসছে। পাখির কলকাকলিতে কী অপূর্ব সুরের ঝংকার !

এমন পরিবেশে অতুলপ্রসাদের গলায় গানের সুর গুনগুনিয়ে ওঠে। শিশিরকুমার, কুমুদিনীর অনুরোধে তিনি একটির পর একটি গান গেয়ে যান, বিশ্রাম নিতে বসেও গান করেন। তুঙ্গশীর্ষ হিমালয়ের পাদদেশে, স্রোতস্বিনীর পাশে বসে অতুলপ্রসাদের অপূর্ব সব গান শুনে স্বামী-স্ত্রী মুগ্ধ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন।

শিশিরকুমার ও কুমুদিনীর অনুরোধে গাইলেন—

"কি আর চাহিব বল হে মোর প্রিয়
তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।"...

গান শুনে স্বামী-স্ত্রী দুজনে কি যেন এক ব্যথাতুর স্পর্শে মৌন, অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছেন। তারপর খেয়াল হতে দেখলেন পাশে ভাইদাদা নেই। সে কী, কোথায় গেলেন ! শিশিরকুমার খুঁজতে বেরুলেন।

খানিক দূর গিয়ে দেখেন পাথরের আড়ালে রুগ্ন, দুঃস্থা এক বৃদ্ধাকে অতুলপ্রসাদ সঙ্গে আনা খাবার যত্ন করে খাওয়াচ্ছেন। খাওয়ান শেষ হলে তার শীর্ণ হাতে অতুলপ্রসাদ একমুঠো টাকা গুঁজে দিলেন। শিশিরকুমার অদূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ অতুলপ্রসাদ তাঁকে দেখতে পেয়ে ভীষণ লজ্জিত হয়ে দ্রুতপায়ে ফিরে এলেন।

সব শুনে কুমুদিনী অবাক ! কই আমরা তো ঐ বুড়ীকে একবারও দেখতে পাই নি, ভাইদাদা কি করে ওর দেখা পেলেন !

অতুলপ্রসাদের দানের কাজ এমনিই গোপনে, নীরবে হত। *

প্রফেসর বন্ধুদের মধ্যে অতুলপ্রসাদের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছিলেন ধূর্জটি-প্রসাদ। একদিন ধূর্জটিপ্রসাদকে নিজের মোটরে তুলে নিয়ে অতুলপ্রসাদ বেড়াতে বেরুলেন।

গাড়ি একটি গলির মুখে আসতেই অতুলপ্রসাদ ড্রাইভারকে থামতে বললেন। ধূর্জটিপ্রসাদকে অনুরোধ জানালেন, একটু বস গাড়িতে, আমি এই এখুনি আসছি। কথার শেষে তিনি গলির ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কিন্তু এই সরু গলির মধ্যে সেন সাহেবের কি প্রয়োজন থাকতে পারে! ধূর্জটিপ্রসাদের মনে কৌতূহল জাগল। অতুলপ্রসাদ বেশ খানিকদূর এগিয়ে গেলে ধূর্জটিপ্রসাদ গাড়ি থেকে নেমে নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। দেখলেন ছোট্ট কুঁড়ে ঘরের মধ্যে অতুলপ্রসাদ প্রবেশ করলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ দেখলেন যে, একটি খাটিয়ার ওপর এক বৃদ্ধ শয্যাশায়ী। অতুলপ্রসাদ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একমুঠো রুপোর টাকা ও নোট বার করলেন এবং সেগুলি সব বৃদ্ধের বালিশের তলায় গুঁজে দিলেন। চেয়ে দেখলেন না কত টাকা বার করলেন, গোনা তো দূরের কথা।

ঘুরে দাঁড়াতেই অতুলপ্রসাদ ধূর্জটিপ্রসাদের সংগে মুখোমুখি হলেন। "ওটা কি হল অতুলদা?" প্রশ্ন করলেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

সলজ্জে অতুলপ্রসাদ বন্ধুকে নিয়ে গাড়িতে ফিরে এলেন। তারপর তিনি সবিস্তারে জানালেন লখনৌয়ে তাঁর প্রথম জীবনের কথা। তখন তিনি লখনৌয়ে নতুন ব্যারিস্টার, সবে কোর্টে যাতায়াত শুরু করেছেন; সামান্য রোজগার হতে আরম্ভ করেছে, মনে মনে ভয়—সফল হবেন তো? সেই সময়ে এক ফকিরের সংগে ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে যায়। ফকির তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে, তুই কোন চিন্তা ভাবনা করিস না, তোর অনেক টাকা রোজগার হবে বেটা। এই সেই ফকির। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা হয় নি।

অতুলপ্রসাদ পরবর্তীকালে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছেন কিন্তু সেদিনের ফকিরকে তিনি ভোলেন নি। মাঝে মাঝে তাঁর ডেরায় গিয়ে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ফকিরকে এমনি পকেট-ভর্তি (অতুলপ্রসাদের ভাষায় 'সামান্য কিছু') টাকাকড়ি বালিশের তলায় গুঁজে দিয়ে আসেন।

এরপর তিনজনে সিমলায় ফিরে এলেন।

প্রকৃতির স্পর্শে ও সস্ত্রীক শিশিরকুমারের সংগ লাভ করে অতুলপ্রসাদের শোকসন্তপ্ত মন কিছু শান্ত হল। স্থির হয়ে এবার সত্যদাদাকে চিঠি লিখতে বসলেন:

Carlton Hotel
Simla
22.6.25

দাদা,

আমি ছুটিতে তিন হপ্তার জন্য সিমলাতে আসিয়াছি। শারীরিক ভালই আছি, কিন্তু মা-হারা হওয়াতে মনটা মাঝে মাঝে বড় বিচলিত হয়। তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য একরকম ভালভাবেই হইয়াছে। কলিকাতা হইতে প্রচারক গুরুদাস চক্রবর্তী আসিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রায় ১৫০০ রুগ্ন আতুর ও বিপন্নদের খাওয়ানো হইয়াছিল। মার নামে সেবাশ্রমে একটি শুশ্রূষালয় নির্মাণ করিবার জন্য ৩০০০ টাকা দিব প্রতিশ্রুত হইয়াছি। ফিরিয়া গেলে তাহার কাজ আরম্ভ হইবে। আরো ১৫০০ টাকা ব্রাহ্মসমাজে প্রচারের কাজে দিব বলিয়াছি।...মার ইচ্ছা ছিল জেঠীমার সঙ্গে দেখা করিতে—হইল না। ভগবানের নির্ভর ভিন্ন আর উপায় নাই।

তোমরা পুরী বেড়াইতে আসিলে, এবং জেঠীমাতাঠাকুরাণীকে তীর্থ দর্শন করাইয়া আনিলে, ভালই করিয়াছ। আমি লখনৌ ফিরিয়া গিয়া টনুমাকে[২] একখানা গানের বই পাঠাইয়া দিব। দিলীপ শ্রাদ্ধের সময় আসিয়াছিল। এবং লখনৌতে কয়েকদিন আমার কাছে ছিল। আবার জুলাই মাসে আসিবে। এখন সে দেরাদুনে। তাহাকে কোন একটি এগ্রিকালচার ফারমে ভর্তি করাইয়া দিব ভাবিতেছি। সেইজন্য লেখালেখি করিতেছি। তাহারও সেদিকে ইচ্ছা। তাহার মা এখন দেরাদুনে। আমাদের বিশেষ বন্ধু মেজর জ্যোতি-লালের (বিহারী সেন মহাশয়ের পুত্র) বাড়িতে ইলেকট্রো-চিকিৎসার জন্য আছে। কয়েক মাস থাকিতে হইবে। মার পরলোক গমনের পরেই কোনরূপ অবস্থা পরিবর্তন আমার ইচ্ছা নহে। ভবিষ্যতের কথা এখনও ভাবিতে পারি না।

আমার জন্য ভাবিও না। যিনি দুঃখ কষ্ট দিতেছেন তিনিই রক্ষা করিবেন। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জেন। আমি ৩রা জুলাই লখনৌ ফিরিব। সেখানেই পত্র লিখ।

তোমার ছোট ভাই
অতুল

২—জ্যোৎস্না সেন

অতুলপ্রসাদ সিমলায় শোকার্ত হৃদয়কে শান্ত করতে এসেছেন, সুস্থ হতে এসেছেন। কিন্তু শোক দুঃখের মাঝেও তাঁর কর্তব্যে অবহেলা নেই, সাহিত্যের প্রতি আনুগত্য ও উৎসাহের শেষ নেই, 'উত্তরা'র সম্বন্ধে সুরেশ চক্রবর্তীর কাছ থেকে চিঠি পেয়ে তাঁকে লিখলেন :

Carlton Hotel
Simla
23.6.25

প্রিয় সুরেশ,

আমি সিমলায় ছুটিতে এসেছি। এখানে আসার পর তোমার চিঠি পেলাম। উত্তর দিতে দেরী হল তার কারণ আমি ১ সপ্তাহের জন্য সিমলার বাইরে গিয়াছিলাম।

তোমার জ্বর হয়েছিল, দুঃখিত হইলাম। তোমার পত্র এতদিন না পাওয়াতে আমি একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম।

'উত্তরা' বাহির করিবার চেষ্টা এখন থেকে করতে হবে।

আমি তোমার প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে পরম্পরায় মত প্রকাশ করিতেছি। ১—আপাততঃ Indian Press-এ ছাপাতে দেওয়াই সংগত মনে হয়, বিশেষতঃ যখন ১২৲ ফর্মা ছাপাবে। কাজটা বোধহয় পাকা করে ফেলাই ভাল। তারপর যদি লখনৌয়ে ভাল বাংলা ছাপাবার বন্দোবস্ত হতে পারে (লখনৌ বাংলা প্রেস) তবে বিবেচনা করা যাবে।

২—অফিস লখনৌতেই হওয়ায় আমার মত এবং তোমাকে এখানে থেকেই কাজ করতে হবে। প্রুফ দেখা সম্বন্ধে তুমি একটা সুবন্দোবস্ত করে এসো।

৩—বেশ, ১লা আশ্বিন থেকেই কাগজটা বাহির হোক—মহালয়ার দিন। ততদিনে আশা করি প্রতিশ্রুত টাকাগুলি পাওয়া যাবে। আমার বোধহয় তোমাকে একবার টাকা ও গ্রাহক সংগ্রহ করার জন্য বেরুতে হবে।

৪—আপাততঃ আমার অফিসে অর্থাৎ 3, Banks Road লখনৌ-এ 'উত্তরা'র অফিস হোক। যদি বাংলায় মাসিক পত্রিকায় 'উত্তরা'র বিজ্ঞাপন দিতে চাও দিতে পার।

৫—লখনৌ ফিরে গিয়ে অসীতবাবুকে 'উত্তরা'র Cover-র জন্য অনুরোধ করব। আমি 3rd July ফিরব।

৬—আমি রবিবাবুকে (রবীন্দ্রনাথ) অনুরোধ করব এবং আমি হয়তো

জুলাই মাসের শেষে কলিকাতায় যাব তখন তাঁকে বিশেষ করে ধরব, কবিতা ও প্রবন্ধের জন্য।

৭—শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এবং কেদারেশ্বরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তা পাইব শুনিয়া সুখী হইলাম।

৮—তুমি সরলাদেবীর কাছে তাঁর অভিভাষণটা চেয়ে পাঠিও। তাঁর কাছে আছে। আমার অভিনন্দনটা তোমার কাছে আছে তো? 'প্রবাসী বাঙালী' তো সমস্ত ছাপালে না, 'উত্তরা'-য় দিব (দিও)।

৯—বিজ্ঞাপন ও গ্রাহক সংগ্রহের চেষ্টায় কলিকাতা ও পরে অন্যান্য স্থান আমি ভালই মনে করি। আমি কায়মনোবাক্যে উত্তরা-র প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব কামনা করি।

সুতরাং আমার যত্ন ও চেষ্টার ওপর তুমি আশা করিতে পার। আমাকে লখনৌর ঠিকানায় লিখিও।

শুভাকাঙ্ক্ষী
অতুলপ্রসাদ সেন

চিঠিতে অসিতবাবুর স্থানে 'অসীত' ও কেদানাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্থানে 'কেদারেশ্বরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' অতুলপ্রসাদের শোকসন্তপ্ত চঞ্চল মনের পরিচয়। কিন্তু এমন মানসিক অবস্থায়ও অতুলপ্রসাদ তাঁর দায়িত্ব, উত্তরা-র ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করছেন।

জুলাই মাসে অতুলপ্রসাদ সিমলা থেকে ফিরে এলেন। গ্রীষ্মাবকাশের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দেরা যথা সময়ে এসে গেলেন।

আবার সুরেশ চক্রবর্তী'র ডাক পড়ল। অতুলপ্রসাদ অধীর, 'উত্তরা' প্রকাশের আর বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। মিটিং হল। জানা গেল প্রতিশ্রুতি মত কিছু টাকা পাওয়া গেছে। বাকী টাকার জন্য ভাবনা কি, অতুলপ্রসাদ তো আছেন।

স্থির হল আগামী আশ্বিন মাসে 'উত্তরা'র প্রথম আবির্ভাব হবে। অতএব উৎসাহের সংগে শুভকাজ আরম্ভ করা হল। ইতিমধ্যে নানা স্থান থেকে 'উত্তরা'র জন্য লেখা আসা শুরু হয়ে গেছে। অতুলপ্রসাদ, রাধাকমল ও সুরেশচন্দ্র সে-সব লেখা নিয়ে আলোচনা করেন। অতুলপ্রসাদের উৎসাহই সব চেয়ে বেশি। কোর্ট থেকে এসে বিশ্রাম নেই, 'উত্তরা'র কাজে বসে যান।

প্রেসের কাজ আরম্ভ হলে তা নিয়েও আলোচনা হয়। তারপর 'উত্তরা'-র জন্য উপযুক্ত প্রচ্ছদপট চাই। বিখ্যাত শিল্পী অসিতকুমার হালদার এ সম্বন্ধে আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। অতুলপ্রসাদ সুরেশচন্দ্রকে নিয়ে গাড়ি করে শিল্পীর বাড়ি গেলেন। অসিত হালদার আশ্বাস দিলেন, সময়ের মধ্যেই তিনি প্রচ্ছদপট এঁকে দেবেন।

কাশী থেকে 'উত্তরা'-র প্রথম প্রকাশন হল বাংলা ১৩৩২, আশ্বিন মাস। সুরেশচন্দ্র, প্রকাশিত 'উত্তরা'-র বাণ্ডিল বেঁধে কাশী থেকে লখনৌয়ে এলেন। অবশ্য এখানে আসার আগেই তিনি অতুলপ্রসাদকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, 'উত্তরা'সহ খুব শীঘ্রই লখনৌ পৌঁছবেন।

এক কপি 'উত্তরা' নিয়ে তিনি প্রথমেই ১৮, আউট্রাম রোডে উপস্থিত হলেন। দূর থেকে দেখতে পেলেন অতুলপ্রসাদ তাঁর বাংলোর বারান্দায় দ্রুত পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। 'উত্তরা'-র জন্য তাঁর উত্তেজনা আর কি।

সুরেশচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তাঁর প্রথম প্রশ্ন 'কই "উত্তরা" কই?' 'উত্তরা' হাতে পেয়ে সেটি নিয়ে সুরেশচন্দ্রসহ চায়ের টেবিলে গিয়ে বসলেন। 'উত্তরা'-কে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন আর অপার তৃপ্তির আনন্দে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাঁর দীর্ঘ প্রত্যাশার আজ শেষ, সোনালি স্বপ্ন আজ বাস্তব সার্থক। সুরেশচন্দ্রের উদ্যমের খুব প্রশংসা করলেন।

'উত্তরা'-র প্রথম সংখ্যা পেয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"উত্তরা উত্তম হইয়াছে।"[৩]

॥ সাতচল্লিশ ॥

মনে হয় সত্যপ্রসাদ স্নেহের ভাই অতুলপ্রসাদকে পূজার ছুটিতে দেশে বেড়াতে যাবার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু অতুলপ্রসাদের পারিবারিক পরিস্থিতির জন্য হয়তো তিনি যেতে পারবেন না তাঁর চিঠিতে এমন সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। সত্যপ্রসাদের চিঠির উত্তরে অতুলপ্রসাদ লিখেছেন:

—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

Dak Bunglo
Lakhimpur (Oudh)
19. 9. 25.

দাদা,

আজ তোমার পত্র পাইলাম। আমিও দেখিতেছি যে এ পূজার ছুটিতে দেশে যাওয়া হইবে না। তাহার কারণ এই :

১। একটা কেসে এখানে এমন আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে ছুটিতে কাজ করিতে হইবে, আর ২।৩ অক্টোবরেও কাজ আসিয়া পড়িয়াছে।

২। ২।৩ দিনের জন্য দেরাদুন যাইতে হইবে, হেমকুসুমের শরীর বড়ই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার চিকিৎসা আবশ্যক। জ্যোতিলালের ট্রীটমেণ্টে কিছুই হইল না।

৩। তুমি ভাই বলিয়াছ যে দেশে গেলে কিছু টাকা সংগে না লইয়া যাওয়া চলে না। যাহা কিছু হাতে আসে তাহা বাড়ির জন্য খরচ করিতে যায়, এ যাত্রায় তাই যাওয়া হইল না। দেখি যদি শীতকালে পারি। তোমরা আমার ভালবাসা নিও। আশা করি তোমরা সকলে ভাল।

তোমার ভাই ॥ অতুল

ডাক্তার জ্যোতিলালের চিকিৎসায় হেমকুসুমের পা সম্পূর্ণ ভাবে ভাল হল না। এ অবস্থায় হেমকুসুম ডেরাদুনে একা একা থাকেন অতুলপ্রসাদের ইচ্ছা নয়। এবার হেমকুসুমও সে কথা বুঝলেন এবং লখনৌ ফিরে যাওয়াই স্থির করলেন। দিলীপকুমারকে পাঠিয়ে অতুলপ্রসাদকে নিজের মনের কথা জানালেন।

অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমের মনোভাব জেনে খুবই আনন্দিত হলেন। দিলীপ-কুমারকে বললেন, ডেরাদুনে ফিরে গিয়ে তোমার মাকে সত্বর এখানে নিয়ে এসো। দিলীপকুমার চলে গেলেন।

অতুলপ্রসাদ খুশিতে উচ্ছল হয়ে গান লিখলেন :

"আমার আঙিনায় আজি পাখি গাহিল এ কী গান?
শুনিনি এমন গাওয়া—হেন মরমভেদী বাণ।
যে করেছে অবহেলা আমার গানের মালা,
আজি কি পাখির গলায় তার গলার প্রতিদান?

যে দিয়েছে এত ব্যথা, মনে হয় তারি কথা ;
বুঝি গো ভিজেছে আজি তার নিঠুর দু-নয়ান।
বল রে অজানা পাখি, তুই তার দূত নাকি ?
এত দিনে ভাঙিল কি তার গভীর অভিমান ?
মোর প্রাণের গানটি শিখি-বনে যা তুই বনের পাখি ;
বুঝায়ে কহিস তাহারে, আমি তার লাগি ধরি প্রাণ।"

নতুন বাংলো, সুগন্ধ ফুলের গন্ধ হেমকুসুমের মনকে উদাস করে, তাঁর চোখে কতও স্বপ্ন জাগে। সারাজীবন ধরে তিনি তো স্বপ্নই দেখে এলেন। স্বপ্ন দেখলেন ছবির মত একটি নীড়, প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোর মত শান্তি সেখানে বিরাজমান ; তাঁর স্বামী সন্তান সংসার। আশ্চর্য, সবই তিনি পেয়েছেন, শুধু শান্তির অভাব। আর ঐ একটি জিনিসের অভাবে তাঁর স্বপ্ন দেখাই ব্যর্থ হয়ে গেল।

আবার তো এলেন, লোভ সামলাতে পারলেন কই ; এই লোভের বশে কতই তো যুদ্ধ করলেন, সংসারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, নিজের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ। দেখা যাক জীবনের দিনান্তে এসে যদি শান্তি পাওয়া যায়।

হেমকুসুম যখন লখনৌয়ে অতুলপ্রসাদের আউট্রাম রোডের বাসভবনে এলেন তখন প্রভা তার সন্তানসন্ততি নিয়ে ওখানেই আছেন। তাঁর স্বামী শেষাদ্রি আয়েংগারের কর্মস্থানে তখনো গণ্ডগোল চলছে, তিনি বেকার।

লখনৌয়ে সংগীত মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেই উপলক্ষে অতুলপ্রসাদের মাতুলকন্যা সাহানা এলেন। সুগায়িকা সাহানাকে কাছে পেয়ে অতুলপ্রসাদের মনে গানের ঝর্ণা ধারা যেন উজিয়ে উঠল। সকাল সন্ধে কেবল গান আর গান। সে গানের আসরে সন্ধেবেলায় প্রোফেসররা ও অনুরাগীরাও উপস্থিত থাকেন। আবার কখনো কজন মিলে চিত্রলেখা সিদ্ধান্তর গান শুনতে যান। অপূর্ব গান করে শ্রীমতী সিদ্ধান্ত, বাংলার নাইটিংগেল।

আনন্দের মধ্যে দিনগুলো কেমন হু হু করে কেটে গেল। কিন্তু হেমকুসুমের জীবনে আনন্দ কোথায়। ডাক্তারেরা অনেক চেষ্টা করলেন ; অতুলপ্রসাদ প্রচুর অর্থ ব্যয় করলেন, কিন্তু তাঁর পা আর ভাল হল না, ক্রমশই তাঁর চলার শক্তি লোপ পেতে লাগল।

হেমকুসুম নিজের অক্ষমতার কথা ভাবেন আর নিরাশ হন। কিন্তু সে বেশী-ক্ষণের জন্য নয়, কত রকমের লোকজন তাঁর কাছে আসে অনুরোধ, অনুযোগ দাবি নিয়ে, তাঁদের সংগে তাঁর সময় কেটে যায়। আবার তাঁর অনুরাগী, অনুগত, দিলীপের বন্ধুরা আসেন, তিনি তাঁদের মাতৃস্নেহে কাছে টেনে নেন, আদর করে এটা ওটা খাওয়ান। প্রায়ই মোটর বা ফিটনে করে বেড়াতে বেরিয়ে যান। তিনি গাড়ি থেকে নামতে পারেন না কিন্তু যাঁদের কাছে যান তাঁরা গাড়ি বা ফিটনের ভেতর এসে বসেন, গল্প হয়; কত গান গেয়ে শোনান, তাঁর ব্যবহারে পরিবেশ যেন সজীব হয়ে ওঠে।

॥ আটচল্লিশ ॥

"১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে পর পর দুবছর লখনৌয়ে নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলন হয়।"[১]

লখনৌয়ে যখন সংগীত সম্মেলন হতে চলেছে তখন অতুলপ্রসাদের মনের অবস্থা বর্ণনা করতে যাওয়া বাহুল্যমাত্র। তিনি হিন্দুস্থানী সংগীতের ভক্ত। এখানে এসে হিন্দুস্থানী সংগীতে ওস্তাদ এমন একাধিক গায়কের গান শুনেছেন। মুন্নে খাঁ, আহম্মদ খলীফ খাঁর গান তিনি তো নিজের বাড়ি বসেই শুনেছেন। আহা, অচ্ছন বাঈ কি অপূর্ব গান করতেন। তাঁর গান শোনার সুযোগ অতুলপ্রসাদের প্রথম হয় বন্ধুবর বিশ্বেশ্বরনাথের বাড়িতে।

বছর চার পাঁচ আগের কথা, বন্ধুপুত্রের তিলক উৎসব। সেন সাহেবের আসা চাই। তাঁরও আপত্তি নেই। তারপর যখন শুনলেন তিলক-উৎসব উপলক্ষে গানের আসরে বিখ্যাত গায়িকা কোকিলকণ্ঠী অচ্ছন বাঈ-র গান শুনতে পাবেন তখন তিনি অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন।

সেন সাহেব এলে বিশ্বেশ্বরনাথ দুই জুহরীকে নিকট সান্নিধ্যে নিয়ে এলেন। অতুলপ্রসাদ বাঈ সাহেবার মধুর কণ্ঠের গান শুনে আনন্দে মাতোয়ারা, উচ্ছল হয়ে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বাহবা বাহবা করতে লাগলেন। শেষে নিজের বাংলোয় গানের আসরে বাঈ সাহেবাকে স্বাগতও জানালেন।

তিনি কুর্নিশ করে তা গ্রহণ করলেন।

১—শ্রীকৃষ্ণ রতনঝঙ্কার—চিঠি।

এবার একটি নয় এক ঝাঁক আসছেন লখনৌ শহরে। অতুলপ্রসাদ পুলকে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং সংগীত সম্মেলনের আয়োজনে উৎসাহী সহযোগীর স্থান নিলেন।

রায় রাজেশ্বর বলি অত্যন্ত সংগীতানুরাগী ছিলেন। ইনি স্যার ম্যারীসের সময় মন্ত্রী হয়েছিলেন। লখনৌয়ে সংগীত সম্মেলন আয়োজনের জন্য তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন। রাজেশ্বর বলির সহোদর উমানাথ বলি হলেন অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক আর রাজা নবাব আলি এবং সেন সাহেব হলেন তার সদস্য।

বিপুল সে আয়োজন, বিরাট গুণী সমাগম, ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রায় তিনশো জন ওস্তাদ এলেন যাঁদের মধ্যে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, সপরিবার নাসিরউদ্দিন ও আল্লাবন্দে, মথুরার চন্দন চোবে, রাধিকামোহন গোস্বামী ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ আর ভাতখণ্ডেজী,—সংগে গুণী শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ রতনঝংকারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯২৫-এ সংগীত সম্মেলন উদ্বোধন করতে রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন। এবার তিনি মামুদাবাদের রাজপ্রাসাদে নবাবের অতিথি।

"দুটি নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে অতুলপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন; দিনে রাতে একবারও আদলতমুখো হন নি। এই তিন দিনে তাঁর হাজার দুই তিন টাকা ক্ষতি হল। আমি সত্যই তাঁকে দেখেছি তাঁর বাড়িতে যে কোন গান শোনার জন্য মক্কেলদের কাছ থেকে দৌড়ে পালাতেন।···রবীন্দ্রনাথের সমজদারী ছিল সাচ্চা। তিনি চোখ বুঝে একেবারে মত্ত হয়ে যেতেন। অতুলপ্রসাদ হতেন উন্মত্ত"।[২]

অতুলপ্রসাদের ইচ্ছে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেকে সাহানার গান শোনাবেন, তাই তাঁকে নিয়ে এত গান গাওয়া, আবার নিজের গান শেখানও আছে।

সাহানার কত ইচ্ছে ছিল ভাইদাদার কাছে গান শেখেন। সে সুযোগ বার বার এসেছে। প্রথম সুযোগে প্রথম যে গানটি অতুলপ্রসাদের কাছে শিখেছিলেন তা হল—"ভব পারে কেমনে যাব হরি।" "বধু, ধর ধর মালা" গানটিও সেবার শিখেছিলেন। তখন অতুলপ্রসাদ দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

সাহানা দেবী লিখেছেন, "সেবার 'গ্লেন ইডেন' দু নম্বরের বাড়িতে স্যর

২—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—"গানের স্মৃতি: লখনৌ পর্ব", 'কালান্তর' শারদীয়া ১৩৭০।

নীলরতন ও তাঁর মেয়েরা, অতুলদা ও আমি—আমরা সবাই একসঙ্গে বেড়াতে যেতাম। অতুলদা নানা গল্প করে আমাদের হাসাতেন। নিজেও হাসতেন প্রাণখোলা। এমনিতে তিনি ছিলেন শান্ত, ধীর, স্থির, খানিকটা লাজুক মিষ্টভাষী মোলায়েম প্রকৃতির। মানুষটি ছিলেন মজলিশী মেজাজের। কত গল্পের পুঁজিই যে ওঁর ছিল! একবার আমরা অনেকে ক্যালকাটা রোড বলে রাস্তাটি দিয়ে চলেছিলাম। এই রাস্তা ধরে সোজা গেলে দার্জিলিং-এর আগের স্টেশন ঘুম। ঘুম দার্জিলিং-এর চাইতে আরো উঁচুতে। সর্বদাই কুয়াশার মত মেঘে ঢাকা। চলতে চলতে হঠাৎ কানে ভেসে এলো মৃদু সুরে গান। চেয়ে দেখি সামনে পাহাড়ের দিকে উদাস নয়নে তাকিয়ে অতুলদা গুন গুন করে গান গাইছেন—'কে হে তুমি সুন্দর, অতি সুন্দর'। মন যেন কোথায় ভেসে গেছে। স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলুম, আমার মনও ডানা মেলল, কিছুক্ষণ পর আমার দিকে একবার তাকিয়ে বলেছিলেন—গা না ঝুনু, গা না রে একটা গান। খানিক দূরে গিয়ে পাকা রাস্তা পাকডণ্ডী দিয়ে একটু উপরে উঠে সুন্দর জায়গা দেখে বসলাম।···সকলের মধ্যে একটা স্তব্ধ ভাব যেন জমাট বেঁধে আছে, সেই সময় অতুলদা ধীরে ধীরে গান ধরলেন, "পাগলা মনটারে তুই বাঁধ," প্রাণ ঢেলে তিনি গাইলেন। অদ্ভুত একটা পরিবেশ সৃষ্টি হল। অতুলদা আমায় গাইতে বললেন। আমি গাইলাম তাঁর কাছে শেখা তাঁরই গান—"কী আর চাহিব বল, হে মোর প্রিয়"। চারিদিকে গগনচুম্বী সব দৃশ্য, তার ওপর অতুলদার গাওয়া ওই গান মনকে বেঁধে দিয়েছিল এমন সুন্দর সুরে যে গান গাইতে গিয়ে দেখি গান আমার আসছে যেন অন্য কোন জগৎ থেকে। সে অভিজ্ঞতা কোনদিন ভুলবার নয়।

সেবার রবীন্দ্রনাথও দার্জিলিং-এ উপস্থিত ছিলেন। দুই কবির মিলনে তাঁদের সংগীতঝংকারে শৈলাবাসের পর্বতমালা ধ্বনিত হতে থাকে।

তিনদিন পর সংগীত মহাসভা শেষ হল তো চারদিনের দিন সংগীত সভা হল।

অতুলপ্রসাদ সাহানা দেবীকে সংগীত সভায় সঙ্গে করে নিয়ে যান এবং ভাতখণ্ডেজী, চন্দন চৌবে, রতনঝঙ্কার ও অন্যান্য ওস্তাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। অতুলপ্রসাদের অনুরোধে সে সভায় সাহানা দেবীকে গানও গাইতে হয়।

মহাসভা শেষ হলেও তার রেশ রয়েই গেল। যে সব ওস্তাদরা লখনৌয়ে কদিন থেকে গেলেন তাঁদের নিয়ে তখন ভদ্রজনেদের সংগীতাসর চলতে থাকল। অতুলপ্রসাদের আবাস তখন সংগীতানন্দে মুখরিত। সে আসরে ভাতখণ্ডেজীও উপস্থিত ছিলেন···"অতুলদার বাড়িতে একদিন তিনি (পঃ ভাতখণ্ডে) এসেছিলেন। অতুলদা তাঁকে আমার গান না শুনিয়ে ছাড়েন নি।"[৩] 'ভাতখণ্ডেজীর শিষ্য রতনঝংকারজী অতুলপ্রসাদের অনুরোধে তাঁর বাংলোয় গিয়ে প্রায়ই গান শুনিয়ে আসতেন'।[৪] অতুলপ্রসাদের ভৈরবী ঝাঁপতাল রাগের খুব পছন্দ ছিল। উক্ত রাগে রতনঝংকারজীর কণ্ঠে 'ভবানী দয়ানী' গানটি তিনি খুবই পছন্দ করতেন এবং পরে ঐ গানের সুরে 'সে ডাকে আমারে' এই বিখ্যাত গানটি রচনা করেন।

ভাতখণ্ডেজী চলে গেলেন। রয়ে গেলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য রতনঝংকার। তাঁর সংগে অতুলপ্রসাদের গভীর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। লখনৌয়ে ম্যারীস মিউজিক কলেজে রতনঝংকারজী দ্বিতীয় অধ্যক্ষ মনোনীত হন। এই মনোনয়নের পেছনে অতুলপ্রসাদের চেষ্টা ছিল।

শুধু গান নয় বাজনাও হত। যেদিন অতুলপ্রসাদের বাংলোয় গানের আসরের আয়োজন হল সুবিখ্যাত যন্ত্রশিল্পী আলাউদ্দীন খাঁ-সাহেব বেহালা বাজালেন। তাঁর সংগে সংগত করলেন বিখ্যাত তবলাবাদক বীরু মিশ্র। দুজনের বাজনা যেন নৃত্যপরা ঝর্ণার তরংগায়িত নদীর বুকে লুটিয়ে পড়া, মিলিয়ে যাওয়া। বীরু মিশ্র সেদিন এত ভাল সংগত করছিলেন যে খুশিতে অতুলপ্রসাদ বাজনার মাঝেই পাহাড়ী সান্যালের কানে চুপি চুপি বললেন দেখছ পাহাড়ী, বীরু কেমন বাজাচ্ছে। মনে হয় ও তবলার ভেতর দুটো পায়রা লুকিয়ে রেখেছে।

সংগীত মহাসভা ও সংগীতসভা শেষ হয়ে গেল; কিন্তু যাবার আগে তা লখনৌবাসীর মনে রসলিপ্সার ঝরোকা খুলে দিয়ে গেল। ফলে সংগীত প্রেমীদের গান শুনে মন আর শান্ত হয় না। তাঁরা যেন সংগীত পাগল হয়ে উঠলেন।

সভা শেষ হয়েছে কিন্তু সুধাকণ্ঠী অচ্ছন বাঈয়ের মোহিনীমধুর সংগীত শোনার সুযোগ তো শেষ হয়ে যায় নি। চল তাঁর গান শোনা যাক।

৩—সাহানা দেবী—"স্মৃতির খেয়া" / "সুরে-ভরা দিনগুলি" : "দেশ"।

৪—শ্রীকৃষ্ণ রতনঝঙ্কার—চিঠি।

যে কথা সেই কাজ, সংগীত সাধিকা বাঈসাহেবার গানের আসরে দলবলে পেঁৗছে গেলেন অতুলপ্রসাদ, ধূর্জটিপ্রসাদ, দিলীপ রায় এবং আরো অনেকে।

ডাক্তার শিবসাধন বোসসহ বিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও সে আসরে তাঁদের সংগে যোগ দিলেন।

অতুলপ্রসাদ বহুবার বাঈসাহেবার গান শুনে বিমোহিত হয়েছেন, গানের তারিফ করেছেন।

অন্যান্য স্বনামধন্য বাঈজীদের গান শোনার যখনি সুযোগ হয়েছে অতুলপ্রসাদ তাঁদের আসরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। বাঈজীরাও তাঁর গভীর সংগীতানুরাগের কথা জানতেন এবং তাঁকে খুবই সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন।

॥ ঊনপঞ্চাশ ॥

১৯২৬-এ কানপুরে সাহিত্য সম্মেলন আহ্বান করা হয়। মূল সভাপতি অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সাহিত্য সম্মেলন অতুলপ্রসাদের মানস-সন্তান, যেখানেই অনুষ্ঠিত হোক তিনি সময় করে যাবেনই। ১৯২৪ সালে তিনি এলাহাবাদে সাহিত্য সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেন নি সেজন্য কী আফসোস। অবশ্য ইচ্ছে করে থাকেন নি তা নয়, রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগে অসুস্থ হয়ে ঠিক ঐ সময়ে বন্ধুবর ডাক্তার ওদেদারের পরামর্শে চেঞ্জে চলে গিয়েছিলেন। ডাক্তার ওদেদার ওঁর চিকিৎসা করতেন। বেশি অসুস্থ হলে অন্য ডাক্তারও আসতেন।

খবর এলো—শরৎচন্দ্র খুবই অসুস্থ, সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে পারবেন না।

সম্মেলনের বিব্রত কর্মকর্তারা অতুলপ্রসাদের ওপর সে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু আমন্ত্রণ পেয়ে অতুলপ্রসাদ চিন্তিত হয়ে উঠলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর ভাষণ লিখবেন কখন? তাঁর অবসর কাজে কাজে ঠাসা, কত দায়িত্ব, কত লোকসমাগম তাঁর কাছে। দু'দিনের নোটিসে কিছু লেখা বিশেষ করে সাহিত্যের ওপর ভাষণ তো লেখাই যায় না। সাহিত্য তাঁর আরাধ্য দেবতা। দীর্ঘ সময় নিয়ে হৃদয়ের অতলে ডুব দিয়ে গভীর চিন্তার পরই সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু লেখা যায়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণের পর ছোটখাট কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করা হল যার মধ্যে অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় নিজে আসতে পারেন নি। রাধাকমল তাঁর প্রবন্ধটি পাঠ করলেন ;— বিষয়বস্তু হল অতুলপ্রসাদের গান।

সভাপতির আসনে অতুলপ্রসাদ সচকিত হলেন, তাঁর উপস্থিতিতে তাঁরই গানের ওপর প্রবন্ধ পড়া হবে ! যেন বিব্রত বোধ করলেন।

রাধাকমল একপাতা পড়েছেন কিনা সন্দেহ—অতুলপ্রসাদ চঞ্চল হয়ে উঠলেন ; বসে বসে নিজের সুখ্যাতি শোনা তাঁর পক্ষে যেন বড়ই বিড়ম্বনাদায়ক। তিনি ঘন ঘন বেল্ টিপে রাধাকমলকে থামাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু রাধাকমল যেন দমকা হাওয়া, তাঁর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, অরুণপ্রকাশের সুলিখিত প্রবন্ধটি তিনি শেষ না করে ছাড়বেন না, শ্রোতাদেরও সে সম্বন্ধে আগ্রহের সীমা নেই। নিরুপায় অতুলপ্রসাদ সলজ্জে নতশিরে বসে রইলেন।

রাধাকমলের পাঠ শেষ হতেই শ্রোতৃবর্গ অতুলপ্রসাদকে অনুরোধ করলেন প্রথমে আপনার গান শোনান।

গান শুনতে বা শোনাতে তাঁর সমান উৎসাহ। শুরু হল তাঁর গান। গান শেষ হতে না হতেই আবার গানের অনুরোধ আসে। তিনিও সানন্দে গান শুনিয়ে যান। সেদিন সভাপতির ভাষণ নয়, গান দিয়েই রাত দুটোর সময় সভা শেষ হল।

॥ পঞ্চাশ ॥

সদস্যদের মধ্যে আদর্শগত সংঘাতে গুডউইল ক্লাবের অপমৃত্যু ঘটল। এরই কয়েকজন উৎসাহী সদস্য—নলিনীবিহারী হালদার, শিবচন্দ্র প্রামাণিক, ডাক্তার রামদাস প্রামাণিক এবং শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৯-১০ সালে গোলাপ নিকেতনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের গোড়াপত্তন করেন। তাঁদের সেবাকার্য যথারীতি পূর্বের মত চলতে থাকে।

১৯২১-২২-এ বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বীরেশ চৈতন্য মহারাজকে পাঠান হয়। তিনি এসে সেবাশ্রমটির ভার নেন। পরে উহা গোলাপ নিকেতন

থেকে আমিনাবাদে স্থানান্তরিত করেন এবং জমি কিনে আশ্রমের জন্য গৃহ নির্মাণ আরম্ভ করেন।

১৯২৬-এ বেলুড় মিশন থেকে নতুন স্বামীজী এলেন—স্বামী দেবেশানন্দ মহারাজ ; এবং ইনি দীর্ঘ আঠারো বছর লখনৌয়ে ছিলেন। স্বামীজী লিখছেন, "সেই সময়ে অতুলপ্রসাদ সেনের সংগে আমার আলাপ হয় এবং পরে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পাইয়াছিলাম"।[১]

আমিনাবাদে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য জমি নেওয়া সম্বন্ধে অতুলপ্রসাদ ও তৎকালীন মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনীয়ার শ্রীসরকারের হাত ছিল। সেবাশ্রম আমিনাবাদে স্থানান্তরিত হলে অতুলপ্রসাদকে সেবাশ্রমের সভাপতি এবং নলিনীবিহারী হালদারকে অনারারী সেক্রেটারী মনোনীত করা হয়। অতুলপ্রসাদ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেবাশ্রমের সভাপতি ছিলেন।

"সেবাশ্রমের মাঝের বড় হল ঘরটি অতুলপ্রসাদের সম্পূর্ণ ব্যয়ভারে নির্মাণ হয়েছিল এবং এটি তিনি তাঁর স্বর্গত পিতৃদেবের নামে উৎসর্গ করেছিলেন"।[২]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সংগে অতুলপ্রসাদের গভীর সংযোগ এবং স্বামী দেবেশানন্দ মহারাজের সংগে তাঁর হৃদ্যতার যে ছবি মহারাজজী দিয়েছেন তাঁর নিজের ভাষাতেই এখানে তা তুলে দিলুম :

"প্রতি রবিবার তিনি আশ্রমে আসতেন বৈকালের দিকে—কিছু ধর্মপ্রসংগ আলোচনা হতো এবং সংগে সংগে তাঁর সুমধুর কণ্ঠের গান শোনাতেন। এই হলঘরে বসিয়া কতদিন যে তাঁর স্বরচিত হৃদয়ের দরদভরা গান শুনিয়াছি তাহা বলিতে পারি না, তিনি কোন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গাইতেন না, এমনি খোলা গলায় হৃদয়ের আবেগে গাইতেন। সে যে কত মধুর তা যে শুনত সেই-ই মুগ্ধ হয়ে যেতো। তাঁর গলায় গান শুনিবার জন্য অনেক যুবক আসিত।

১—স্বামী দেবেশানন্দ মহারাজজীর—চিঠি।

২—স্বামী দেবেশানন্দ মহারাজের চিঠিতে জানা যায় অতুলপ্রসাদ লখনৌ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের হল ঘরটি নিজ ব্যয়ে করে দিয়েছিলেন এবং সেটি তাঁর পিতৃদেবের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। এ ঘটনা ঘটে বীরেশ চৈতন্য মহারাজের সময়। তিনি ১৯২১-২২ থেকে ২৫ সাল পর্যন্ত লখনৌয়ে ছিলেন। দেবেশানন্দ মহারাজজী আসেন ১৯২৬-এ, তখন হলঘর হয়ে গেছে। উপরোক্ত চিঠিতে (22.6.25) অতুলপ্রসাদ লিখেছেন—"মার নামে সেবাশ্রমে একটি শুশ্রূষালয়"...। মনে হয় অতুলপ্রসাদ পরে মত পরিবর্তন করে প্রথমে পিতৃদেবের নামে ঘর উৎসর্গ করেন। পরে দেবেশানন্দ মহারাজের আমলে মার নামে শুশ্রূষালয় করিয়ে দেন।

"পরে যখন হলঘর বারাণ্ডায় রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন একদিন ঐ বারাণ্ডায় বসিয়া কথা প্রসঙ্গে আমি বলিলাম, সেন মশায়, আজকাল রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং এই বারাণ্ডাতেই সব দেখাশুনা করতে হয় এবং আপনারাও এসে এখানে বসেন সেটা ঠিক হচ্ছে না, infection ইত্যাদি আমাদের হতে পারে, তাই কি করা যায় ভাবছি। তাতে একটু ভেবে সেন মশায় বললেন, একটা out-door dispensary with two beds করে ফেলুন সামনে শেষের দিকের জায়গায়। একটা estimate করান তবে স্বামীজী আমি একসঙ্গে টাকাটা দিতে পারব না। আপনি কষ্ট করে প্রত্যেক মাসে কিছু কিছু করে নিয়ে আসবেন নচেৎ আমার হাতে টাকা থাকলেই খরচ হয়ে যাবে। আমি তাই করিতে লাগিলাম এবং কয়েক মাসের মধ্যেই estimate cost জমা হইয়া গেল (খুব সম্ভব about 5 thousand লেগেছিল) এবং কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। কিছুদিনের মধ্যেই তিনখানা ঘর বারাণ্ডা সমেত তৈয়ার হইয়া গেল with all equipments···যে ঘরে দুটি বেড রাখা হইয়াছিল রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিলে, তখন ঘরটি operation ও dressing room হিসাবে ব্যবহার করা হইতে লাগিল। ঐ ঘরটি তাঁর স্বর্গতা মার নামে দিয়াছিলেন এবং একটি বড় পাথরে ঐ বিষয়ে লিখিয়া দেওয়ালে লাগান হয়। যেদিন ঐ বাড়িটি opening হয় সেদিন সন্ধ্যার পর তিনি নিজে এসে খোল করতাল সহযোগে কীর্তন করিয়া উহার উদ্বোধন করিয়াছিলেন এবং কিছু ফল ও মিষ্টি সমবেত ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল।

"কোর্টে যাবার রাস্তায়, কখনো কখনো out-door-এ আর্তনারায়ণের সেবা দেখিয়া খুবই আনন্দ অনুভব করিতেন। পরে কোন সময়ে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন ঔষধের জন্য প্রতিমাসে কতটাকা প্রয়োজন হবে। তখন হোমিওপ্যাথি ঔষধ দেওয়া হইত এবং আমিই উহা ব্যবহার করিতাম, কোন ডাক্তারের খরচ ছিল না কাজেই আমি বলিলাম ২৫৲ টাকার ঔষধ হইলেই চলিয়া যাইবে। তখন ঔষধও সস্তা ছিল। তাই তিনি উইলে ঐ ২৫৲ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা অদ্যাবধি বোধ হয় সেবাশ্রম পাইয়া আসিতেছে। ঐ সঙ্গে কিছু অ্যালোপ্যাথি ঔষধের জন্য আচার্য পি. সি. রায়কে তিনি নিজে এক পত্র লেখেন তাহাতে Bengal Chemical থেকে প্রায় যতদূর মনে আছে ৩।৪ শত টাকার ঔষধ প্রতি বৎসরের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন বিনামূল্যে। উহাও প্রতি বৎসর পাওয়া যাইত বহুদিন যাবৎ।"

অতুলপ্রসাদের উদারতা দয়াদাক্ষিণ্য সম্বন্ধে স্বামী দেবেশানন্দ মহারাজজী লিখেছেন :—"প্রতি রবিবারে তাঁর আবাসে সকালবেলা প্রায় ২০।৩০টি গরীব আসিত। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কোন দিন পয়সা, কোন দিন চাল, কোন দিন আটা ইত্যাদি দান করিতেন এবং গরীবেরা খুব আনন্দ করিতে করিতে আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া যাইত ইহাতে তাঁহার মুখে যে কি আনন্দের ঝলক দিত তাহা দেখিলেই বোঝা যাইত।

"একবার বলেছিলেন যে, আমি কোলকাতায় গিয়াছি, একজন এসে বলিল যে আপনার গানের রেকর্ডিং থেকে ৫০০ টাকার Royalty পাওয়া গিয়াছে তাহা আপনাকে দিতে আসিয়াছি। আমি কিন্তু ঐ বিষয়ে কিছুই জানি না। যাহা হউক তখনই মনে পড়ে আমার এক দুঃস্থ আত্মীয়া আমার নিকট কিছু সাহায্য চাহিয়াছিল। তখনই ঐ টাকাটি মনি অর্ডার করিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিলাম।

"আর একবার বলেছিলেন আমাদের বাড়ীতে একটি মুন্সী ৺পিতার সময় সময় থেকে ছিল। সে-ই টাকা পয়সার হিসাব রাখিত। একদিন সে মার নিকট আমার নামে নালিশ করিতেছে যে, মাজী, বাবুজীর তো ব্যাংকে টাকা একেবারেই নেই, কেবলই চেক কেটে যাচ্ছেন, কিছুই ভাবেন না ব্যাংকে টাকা আছে কিনা, কেউ এসে কিছু চাইলেই চেক লিখতে বসে গেলেন। তাই আমার মা ঐ কথা শুনে আমায় বললেন, হ্যাঁরে ব্যাংকে যে টাকা নেই, আর তুই কেবল চেক সই করে যাচ্ছিস, আজ মুন্সী আমায় বলিল। একটু বুঝে সুঝে চল্। আমি চুপ করে থেকে কেবল বললাম যে, মা যদি কেহ দুঃখী আমার নিকট এসে কিছু চায় আমি চুপ করে থাকতে পারি না। তা তুমি যখন বলছ আমি একটু বুঝে সুঝে চলতে চেষ্টা করব।"

কিন্তু ঐরূপ বুঝে চলা তাঁর পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হয় নি। তিনি দুহাতে টাকা উপায় করে তা যেন চার হাতে খরচ করেছেন। কতবার এমন বলেছেন, অমুক লোকটা বড় ঠকিয়েছে হে, ওকে আর টাকা দেব না। তার মানেই আরো পাঁচ টাকা গেল।

অতুলপ্রসাদ একদিন অরুণপ্রকাশকে বললেন, 'চল, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে যাই।' অতুলদাদার কথা অবজ্ঞা করতে পারেন না অরুণপ্রকাশ, যেতে যেতে শুধু ভাবতে থাকেন, এই অসময়ে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে অতুলদাদা হঠাৎ রামকৃষ্ণ মিশনে চলেছেন কেন?

তাঁর সে কেন-র উত্তর তিনি কিছুক্ষণ পরেই পেলেন। অতুলপ্রসাদ মিশনে পৌঁছবার একটু পরেই মিশনের তরফ থেকে দরিদ্রনারায়ণের সেবা শুরু হল। কাঙালীরা খেতে বসেছে। অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে অতুলপ্রসাদও তাদের পরিবেশন করতে লাগলেন, খিচুড়ী, তরকারী, পায়েস নিয়ে মধুর স্বরে তাদের অনুরোধ করতে লাগলেন, 'আর একটু দিই,' 'আর একটু কিছু নাও'।

অরুণপ্রকাশ স্তম্ভিত হয়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগলেন। এমন ঘটনা তিনি পরে বহুবার দেখেছেন। এ নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলে জবাব পেয়েছেন, 'আহা, ওদের পরিবেশন করে খাইয়ে যে কী আনন্দ পাই তোমায় বলে বোঝাতে পারব না'।

যেখানে অতুলপ্রসাদ সেখানেই নবীনতা, সজীবতা; নবীনদের, তরুণদের তিনি বড় ভালবাসতেন। তাদের সাহচর্যে আনন্দ পেতেন।

"তরুণ কিশোরদেরও তিনি বড় প্রিয় ছিলেন। তাঁকে তরুণরা এত সম্মান করত, ভালবাসত যে তিনি কোন সভায় ভাষণ দিতে গেলে তরুণরা অবশ্যই সেখানে উপস্থিত থাকত, শান্ত হয়ে বসে তাঁর ভাষণ শুনত এবং সব শেষে অনুরোধ থাকত, তাঁর মধুর কণ্ঠের একটি গান শোনান চাই। প্রায় সময়েই তিনি তাদের সে অনুরোধ রাখতেন এমনিই ছিল তাঁর স্নেহ ভালবাসা"।[৩]

তরুণ কিশোররা কোনও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করবে, বৈশাখী উৎসব করবে, সরস্বতী পুজো করবে, সভাপতি হবেন সেন সাহেব। তাঁর মত উৎসাহ দিতে আব্দার সহ্য করতে আর কে আছেন।

সেবার মডেল হাউসের বাঙালী তরুণ কিশোররা স্থির করল সরস্বতী পুজো করবে। তারা পৌঁছে গেল সেন সাহেবের বাংলোয়। সব শুনে তিনি খুশি হলেন, উৎসাহ দিলেন, টাকাও দিলেন।

সকালবেলা তরুণদের সঙ্গে পুজো মণ্ডপে কাটালেন।[৪] সন্ধেবেলা তাঁর

৩—স্বামী দেবেশানন্দ মহারাজ—চিঠি।

৪—অতুলপ্রসাদ নানা প্রতিমা পুজোয় যোগ দেওয়ায় এখানকার ব্রাহ্মবাদীদের কেউ কেউ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। উত্তরে অতুলপ্রসাদ বলেছিলেন, ছেলেরা যদি উৎসাহ করে কিছু করে এবং আমায় ডাকে তবে সে আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মধ্যে আমি তো কোন অন্যায় দেখি না।

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান হয়। সে অনুষ্ঠানে স্বামী দেবেশানন্দ মহারাজও উপস্থিত ছিলেন।

প্রোগ্রামসূচীর একটি ছিল যে দেবেশানন্দ মহারাজজী স্বামী বিবেকানন্দের একটি কবিতার চারটি লাইন বলবেন। সেটি শুনে সেই সভাতেই যে আবৃত্তি করে শোনাতে পারবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে।

একটি কিশোর চার লাইন ও দুটি কিশোর দু লাইন উক্ত কবিতার আবৃত্তি করতে সফল হয়।

দেবেশানন্দ মহারাজ প্রথমকে পুরস্কৃত করেন এবং দ্বিতয়ি ও তৃতীযকে অতুলপ্রসাদ নিজের তরফ থেকে পুরস্কৃত করেন।

॥ একাত্ম ॥

ডেরাদুন থেকে এসে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে আউট্রাম রোডের বাংলোয় হেমকুসুম প্রায় মাস তিনেক ছিলেন। তার মধ্যেই তিনি আবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। স্বামীর ঘর যেন তাঁর ঘর নয়, এ সংসারে যেন তিনি একজন অতিথি বা অনেক দূরের মানুষ, অনধিকার প্রবেশ করেছেন। পুরনো অশান্তি ধূমায়িত হয়ে ওঠে, আত্মীয়দের সঙ্গে সংঘাত লাগে, ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে বাতাস অশান্ত হয়ে ওঠে। সুবিধাবাদীরা এ সুযোগের সদব্যবহার করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। অতুলপ্রসাদের কান ভারি করা হয়। তিনি ক্ষুব্ধ, বিরক্ত হন।

হেমকুসুমের মনে আশা আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, দু চোখে সুমধুর স্বপ্নের অঞ্জন, কিন্তু শক্তি সামর্থ্যে তিনি যেন দেউলিয়া হয়ে গেছেন। তবু তাঁর উন্নত শিরকে অবনত করা যাবে না। যেখানে তাঁর পরিপূর্ণ অধিকার সেখানে তিনি কৃপার পাত্রী হয়ে থাকতে নারাজ। হেমকুসুম আবার দিলীপকুমারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

ক্যানটনমেণ্ট রোডে, টিকারা হাউসের এক অংশ ভাড়া নিয়ে তাঁর আবার একক জীবন শুরু হল। এই বাড়িতেই তাঁর জীবনান্ত হয়। এই বিচ্ছেদের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সদভাব থাকলেও অতুলপ্রসাদের আবাসে বা অন্যত্র কোথাও দুজনে মিলিত হয়ে আর কখনো একসঙ্গে থাকেন নি।

অতুলপ্রসাদ দুঃখপ্রকাশ করে দাদাকে চিঠি লিখলেন :

18 Outram Road
Lucknow
19.3.26

দাদা,

বহুদিন তোমায় পত্র লিখি না, অপরাধ ক্ষমা করিও। আমার ইতিমধ্যে খুব অসুখ গিয়াছে। এখন অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল আছি, জ্বর হইয়াছিল, ম্যালেরিয়া কাশি ইত্যাদি। আরো উপসর্গ ছিল। এখন নাই। হেমকুসুমের শরীরের জন্য অনেক সেবাশুশ্রূষা করা গেল, খরচও করা গেল, কিন্তু হাড় যে ভাঙিয়াছিল তাহা সারিযাছে বটে, শরীর পূর্বাপেক্ষা ভাল, কিন্তু মনের পরিবর্তন হইল না।

সেদিন রাগ করিয়া আবার বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, লক্ষ্ণৌতেই অন্যত্র ছিল। স্যর কে. জি. গুপ্তর সংকটপূর্ণ ব্যারাম হওয়ায কলিকাতায সম্প্রতি গিয়াছে। আবার এখানেই ফিরিয়া আসিবে।...আবার পুরাতন ইতিহাস।... ছুটকি ও তাহার একটি মেয়ে ও ছেলে এখানেই আছে। তাহারা শারীরিক ভাল।

তাহার স্বামীর এখনও কাজ হয় নাই। কিরণ কলকাতায় তাহার নিজের বাড়িতে, সেও ভালই আছে, হিরণ ও তাহার মেয়ে বাংগালোরে। হেমকুসুমের জন্য তাহাদের এখানে আনিবার জো নাই।

আমার বাড়ি সম্পূর্ণ তৈয়ার হইয়াছে। আর দু মাসের মধ্যেই নতুন বাড়িতে যাইব। প্রায় ৩৩ হাজার টাকা খরচ হইল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় ধার করিতে হইবে না। শীতকালে পার তো একবার নিশ্চয়ই আসিও।

আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। জেঠীমা ঠাকুরাণীকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিও, তোমরা আমার ভালবাসা নিও।

তোমার ভাই
অতুল

॥ বাহান্ন ॥

মার বড় সাধ ছিল অতুলপ্রসাদের একটি বাড়ি হোক। কতবার বলেছেন যে দু'হাতে পয়সা রোজগার করছ খুব ভাল কথা, কিন্তু তার থেকে কিছু সঞ্চয় কর, নিজের থাকার জন্য একটি বাড়ি কর।

কিন্তু অতুলপ্রসাদের হাতে পয়সা থাকে কোথায়। তাঁর টাকায় বিধবাশ্রম হচ্ছে, সেবাশ্রম হচ্ছে, সেবাশ্রমের নতুন তিনখানি ঘর বারান্দা তৈরীর প্রস্তাব নিজেই তিনি স্বামী দেবেশানন্দ মহারাজজীকে দিলেন; খরচ হবে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। প্রস্তাব দেওয়ার সংগে অনুরোধও জানালেন, "স্বামীজী, প্রতিমাসে আমার নিকট হতে কিছু কিছু (টাকা) জোর করে কেড়ে নিয়ে আসবেন নচেৎ একসংগে আর আমার দেওয়া হবে না।" তাঁর দানের ক্ষেত্র এতই বিশাল।

সত্যদাদা মাঝে মাঝে খুড়িমা হেমন্তশশীর কাছে আসিতেন। তিনিও পরামর্শ দিতেন, বাজে খরচ কমিয়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ কর। হেমন্তশশী তাঁর সংগে যোগ দিয়ে বলতেন, তুই দেখ বাবা বলে কয়ে যদি কিছু করতে পারিস।

কিন্তু অতুলপ্রসাদ বুঝতে পারতেন না তাঁর বাজে খরচটা কোথায়। সত্য দাদাকেই বলতেন, তুমি দাদা আমার খাতা দেখে বল-কোনটা আমার বাজে খরচ। তুমি যে ভাবে বলবে আমি সেইভাবেই খরচ করব। মুন্সী জানকীপ্রসাদের ওপর হুকুম করতেন দাদাকে সব খাতা দেবার।

ভবিষ্যৎ সংস্থার কথা বললে অতুলপ্রসাদ হেসে বলতেন, "আমি শেষ জীবনে রামকৃষ্ণ মিশনে থাকব। পঞ্চাশ টাকায় বেশ চলে যাবে।"[১]

কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তিনি আগের মতই দু'হাতে উপায় করে যেন দশ হাতে তা বিতরণ করতেন।

হেমন্তশশী সত্যপ্রসাদের কাছে আক্ষেপ করতেন যে ওর (অতুলপ্রসাদের) মুন্সী বাড়ি তৈরী করছে আর ওর নিজের কিছুই হল না।

শেষ পর্যন্ত অতুলপ্রসাদ হেমন্তশশীর জীবিতকালেই স্টেশনের কাছাকাছি মিউনিসিপ্যালিটির খালের ধারে পাঁচ বিঘা জমি ক্রয় করেন। ওখানে তখন

১—সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।

অনেকেই জমি কিনেছেন ; ডাক্তার সেন, বিরাজ গুপ্ত, মিস্টার আগরওয়ালা, যতীনবাবু প্রভৃতি। অতুলপ্রসাদ যে স্থানে জমি নিয়েছেন সেখানে তাঁর নামানুসারে একটি নতুন রাস্তা তৈরী হয়। রাস্তাটি সম্বন্ধে অতুলপ্রসাদ তাঁর দাদা সত্যপ্রসাদকে বলেছিলেন, "তাঁর অনুপস্থিতি কালে লখনৌয়ের পুরজনেরা অতুলপ্রসাদের অজ্ঞাতসারেই একটি নূতন রাস্তা বাহির করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন A. P. Sen Road."[২] প্রিয় সেন সাহেবের প্রতি লখনৌবাসীর এ হল ভালবাসার একটি নিদর্শন।

এ. পি. সেন রোডে অতুলপ্রসাদের নতুন বাড়ি তৈরী হয়ে গেল। ভবন না বলে প্রাসাদ বললেই ভাল হয়। অতুলপ্রসাদ নিজের প্লানে এই বাড়ি তৈরী করিয়েছেন ; যেখানে যেটি করলে সুন্দর দেখায় সেইভাবে করিয়েছেন। বাড়িটিকে ঘিরে সুন্দর বাগান। তেত্রিশ হাজার টাকার মধ্যে সব ভালভাবে হয়ে গেল। মার নামানুসারে নাম দিলেন "হেমন্তনিবাস"। বাড়ি যখন তৈরী হল মা নেই, ভাবতে গিয়ে অতুলপ্রসাদের মন বেদনায় ভরে ওঠে, সব শূন্য ব্যর্থ মনে হয়।

মে মাসের এক শুভদিনে গৃহপ্রবেশ, কিন্তু সে শুভদিনে গৃহিণী হেমকুসুম নেই। তিনি তখন কলকাতায় অসুস্থ পিতার শয্যাপার্শ্বে স্থান নিয়েছেন। স্যর কে. জি. গুপ্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় একেবারে শয্যাশায়ী।

অতুলপ্রসাদ তাঁর এই আনন্দের দিনে অন্য দুই ভগ্নিদের আসতে লিখলেন, সত্যদাদাকেও লিখলেন, সত্যপ্রসাদ ঠিক গৃহপ্রবেশের সময় আসতে পারলেন না। পরে শীতকালে এলেন। গৃহপ্রবেশের দিন সুসজ্জিত গৃহ আনন্দ কোলাহলে মুখরিত ; তারার মত আলোর মালা পরে রাতের আকাশের মতই সে মনোরম হয়ে উঠল। আত্মীয়, বন্ধু, অনুরাগী ভক্তলোকে লোকারণ্য, গান বাজনা হাসি-গল্পের সীমা নেই। ভূরিভোজনের এলাহি ব্যাপার।

অতুলভবনে খাওয়া দাওয়ার এলাহি ব্যাপার সব সময়েই। নিজেও খেতে ভালবাসতেন কিন্তু রক্তচাপ বৃদ্ধির জন্য ডাক্তারের পরামর্শে তাঁর খাওয়া দাওয়া এখন খুবই সীমাবদ্ধ। সবার সংগে খেতে বসে মাঝে মাঝে অবশ্য লুকিয়ে একটু আধটু খেয়ে ফেলেন ; মোগলাই খানা তাঁর খুব প্রিয়। কিন্তু অচিরেই ধরা পড়ে যান, অন্তরংগ বন্ধুরা হাঁ হাঁ করে ওঠেন, অতুলদা, একি হচ্ছে, আপনার

২—সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।

এসব খাওয়া একেবারে বারণ! লজ্জায় পড়ে অতুলপ্রসাদ জানান, খাচ্ছি না, একটু চেখে দেখছিলাম, সংগে সংগে একটা হাসির রোল পড়ে যায়।

॥ তিপ্পান্ন ॥

এবার গরমের ছুটিতে অতুলপ্রসাদ ব্যাংগালোরে হিরণের কাছে বেড়াতে গেলেন। হিরণ অনেকবার তাঁকে যাবার জন্য বলেছেন ইতিমধ্যে। ভগ্নীপতি ডাক্তার আয়েংগার তাঁকে পেয়ে খুব খুশি। অতুলপ্রসাদ দিন কতক ওঁদের কাছে আনন্দে কাটালেন; গানে-গল্পে সময় যেন কোথা দিয়ে শেষ হয়ে-গেল।

এরপর অতুলপ্রসাদ দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থান দর্শন করে বেড়ালেন। অমনি মনে পড়ল 'উত্তরা'র কথা, সুরেশ চক্রবর্তী প্রায়ই আব্দার করেন ধারাবাহিক কিছু লেখা দিতে; শুধু গান প্রকাশ করে মন ভরে না। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করে ব্যাংগালোরে ফিরে এসে তিনি সুরেশ চক্রবর্তীকে 'উত্তরা'র প্রাপ্তি সংবাদ দিলেন এবং লিখে জানালেন :

Bangalore
9. 7. 26

স্নেহাস্পদেষু

সুরেশ, তোমার পত্র দুখানাই যথাসময়ে পাইয়াছি। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা 'উত্তরা' পাইযাছি। তোমার উদ্যোগ ও পরিশ্রমের উপর 'উত্তরা'র ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করে। আশা করি এতাবৎকাল 'উত্তরা'র উন্নতিকল্পে যেরূপ যত্ন করিয়াছ তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

এখানে দুএকজন গ্রাহক যোগাড় করিয়াছি। দু একদিনের মধ্যেই তাহাদের নাম পাঠাইব, তাহাদিগকে উত্তরা পাঠাইয়া দিও।

তোমার অনুরোধমত একটি গান পাঠাইতেছি, কথাতেই বুঝিতে পারিবে সেটি ইদানিং লেখা। উত্তরার জন্য আরো কিছু সংগ্রহ করিয়াছি। সেগুলি এখনও লেখনীতে আসে নাই তবে সরঞ্জাম মজুত। এবার ধারাবাহিক কিছু লিখিতে চেষ্টা করিব। দক্ষিণ ভারতে অনেক দেশে ঘুরিয়াছি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

১৯২৬-এর আগস্ট মাসেই আউধ বার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির ইলেকশন হল। প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন মিস্টার জ্যাকসন আর ভাইস প্রেসিডেণ্ট অতুলপ্রসাদ। অতুলপ্রসাদের অমায়িক ব্যবহার ও নানা সদ্‌গুণের জন্য সবাই তাঁকে সম্মান করতেন। নির্বাচনে তাঁকে সমর্থন করে অনুরাগীরা তাঁদের যথার্থ অনুরাগের পরিচয় দিলেন।

॥ চুয়ান্ন ॥

অমল হোম তখন নববিবাহিত; পত্নীসহ শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গেছেন। ভোরবেলা পাশের ঘর থেকে কবিগুরুর কণ্ঠস্বর শুনে উঠে পড়লেন, কি ব্যাপার!

বেরিয়ে এসে দেখেন কবিগুরু স্বয়ং উপস্থিত থেকে পাশের ঘরটি লোকজন দিয়ে ঠিকঠাক করাচ্ছেন। 'রাত্রে অতুলের টেলিগ্রাম এসেছে সে আর একটু পরেই এসে পৌঁছবে'—অমল হোমকে দেখেই হাসিমুখে কবি এ সংবাদ দিলেন।

স্তম্ভিত অমল হোম, অতুলপ্রসাদের জন্য কবির মনে কি গভীর ভালবাসা!

বড়দিনের ছুটিতে অতুলপ্রসাদ শিমুলতলায় ক'দিন থেকে দিলীপকুমার রায়সহ শান্তিনিকেতনে আসছেন।

সকালবেলা অতুলপ্রসাদ কবির কাছে পৌঁছতেই স্নেহের পাত্রটিকে পেয়ে তাঁর সৌম্য, সুন্দর মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হল। অতুলপ্রসাদও আনন্দে উচ্ছল হয়ে কবিকে বললেন, 'আপনার শরীরটা খুব ফিরেছে দেখছি।'

কবি সহাস্যে বললেন, 'চুপ চুপ, ও কথা বলো না। কালকেই এক ভদ্রলোকের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকী সভায় আমাকে সভাপতি করতে কোমর বেঁধে মরিয়া হয়ে এসেছেন। তাঁকে বহু কষ্টে বিশ্বাস করিয়েছি যে আমি মরণাপন্ন। আচমকা আমি ভাল আছি জানলে তিনি দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে উঠবেন, যাবেন আমাকে টেনে নিয়ে। তখন তাঁর স্ত্রীর জন্য প্রকাশ্য সভায় চোখের জল না ফেলে আমার আর উপায় থাকবে না।'

অতুলপ্রসাদ হেসে বললেন, তাঁকে বিশ্বাস করালেন কি করে?'

কবি সকৌতুকে হেসে বললেন, 'জানা চাই হে, জানা চাই। আঁটঘাট বেঁধেছি কি কম! পাছে ফস্কে যায় এই ভয়ে ওঁকে ঘটা করে বুঝিয়েছি যে এরূপ ক্ষেত্রে যিনি পতি তাঁরই সভাপতি হওয়া উচিত।'

এরপর গানের আসর।

কবি শ্রীমতী রমা মজুমদারের সঙ্গে গাইলেন :

"তোমার বীণা আমার মন মাঝে"।...

অতুলপ্রসাদ তাঁর গান গাইলেন :

"আমারে এ আঁধারে
এমন করে চালায় কে গো?
আমি দেখতে নারি, ধরতে নারি
বুঝতে নারি কিছুই যে গো"!...

পরের দিন ২রা জানুয়ারী, ১৯২৭ সাল।

কথায় কথায় সেদিন এলো মৃত্যুর প্রসঙ্গ। কবি বললেন, 'ইচ্ছা অপূর্ণ রেখে মরলে ফের জন্মাতে হয়...মৃত্যুর পরে আমাদের চৈতন্য লোপ পায়। তারপর চিন্তিতভাবে বললেন, তবে আমাদের সে চৈতন্য এ চৈতন্যের জের টেনে চলে না।'

অতুলপ্রসাদ বললেন, 'পরিষ্কার করে বলুন কথাটা।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'কি রকম জান, আমাদের জীবনে কি অনেক সময়েই অদল বদল হয়ে যায় না কোন অভাবনীয় কিছু একটা ঘটলে। একটা নড়চড় ভাঙচুর হয়ে যেমন সমস্ত দৃশ্যটা থাকে অথচ আগাগোড়া বদলে যায় অনেকটা তেমনি। অর্থাৎ হয়ত আমাদের মনোভাব, প্রাণের সাড়া দেওয়ার ভঙ্গি, হৃদয়ের ক্ষুধাতৃষ্ণা আশা-আকাঙ্ক্ষা— সব কিছুর মধ্যেই একটা বড় রকমের রূপান্তর ঘটে। এ যদি জীবনের ভূমিকম্পই ঘটে তাহলে মৃত্যুর ভূমিকম্পে আরো ঘটবে। এই তো মনে হয় বেশি করে...যেমন ধরো এটা শুধু একটা দৃষ্টান্ত মনে রেখ—ধরো এমনও হতে পারে যে মৃত্যুর পরে 'আমাদের পক্ষে প্রিয়জনের দূরে থাকা ও কাছে আসার মধ্যে আর কোন তফাত থাকবে না'। তাই মৃত্যুর পরে চৈতন্য রইল বলতে আমি বুঝি না যে সেটা হল এই চৈতন্যেরই সম্প্রসারণ। আমার মনে হয় যে খুব সম্ভব সে চৈতন্যের মধ্যে একটা মূল ছন্দ যায় বদলে'।

আরো বললেন, 'প্রতি মানুষকেই বিধাতা আলাদা আলাদা রূপে গড়েছেন

আলাদা আলাদা অভিজ্ঞতার ছাঁচে ঢালাই করে। কিন্তু কয়েকটা আধার বেশি উতরে গেল। এদের চরিত্রে একটু অভিনিবেশ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে তাদের অভিজ্ঞতার গঠন প্রকৃতি, গুণ-সমাবেশ ঘটনার যোগাযোগ সবেরই পেছনে রয়েছে একজন অদৃশ্য কারিগরের, কি বলব, **design**—মতলব। তবে আমি এ ধরনের কথা বলতে অহংকার করতে চাইনি বিশ্বাস কর। বরং উল্টো। কেননা আমি একথা বলছি আমার আমিত্বকে ফাঁপিয়ে তুলতে নয়—এই সব যোগাযোগকে বড় করে ধরতে।

অতুলপ্রসাদ বললেন, "আপনি এত সংকুচিত হচ্ছেন কেন এসব কথা বলতে? আপনি আরো পাঁচজনার সংগে কাঁধ মিলিয়ে চললেও যে কাঁধ আপনার সমান নয় একথা কি চোখে ধরা না পড়ে পারে"?[১]

অতুলপ্রসাদকে কাছে পেয়ে রবীন্দ্রনাথের মুখ খুলে গিয়েছিল। অতুলপ্রসাদেরও তিনটি দিন কবির সংগে আহারে, বিহারে, গানে, গল্পে, পরমানন্দের মধ্যে কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছিল জানতেই পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের অপরূপ বাক-নৈপুণ্য সকলকেই অভিভূত করত; সে সব শুনতে শুনতে অতুলপ্রসাদ ও দিলীপকুমার রায় দুজনেই অভিভূত হয়ে পড়তেন।

অতুলপ্রসাদ একদিন বলেছিলেন: "কবি কেমন অনায়াসে আমাদের মনের তারকে উঁচু নিচু সুরে বাঁধতে পারেন দেখেছ, দিলীপ? তরল থেকে গম্ভীর, গম্ভীর থেকে করুণ, করুণ থেকে উদাস—কবিত্ব থেকে গবেষণা, গবেষণা থেকে সমালোচনা—কোন রসটি না ফোটাতে পারেন তিনি? কেবল দুঃখ এই যে আমাদের মনের তার যে উঁচু পর্দায় তিনি এত সহজে বাঁধেন তার কথার মোচড়ে, সে উঁচু আলোর পর্দা ঢিলে হয়ে আসে তাঁর কাছ থেকে আসতে না আসতে। তখন আমরা পাড়ি যে তিমিরে সেই তিমিরে"।[২]

লোকেরা রবীন্দ্রনাথের সংগে দেখা করে তাঁর সংগে দিব্যি গল্প করে আসতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ আবার কবির নিন্দে করতেন এই বলে যে তিনি মিশুক নন। অতুলপ্রসাদ শুনে খুব আশ্চর্য হতেন যখন কবি বলতেন লোকে তাঁকে স্নেহহীন মানুষ মনে করে। এ নিয়ে অনেক আলোচনার পর একদিন কারণ আবিষ্কার করে অতুলপ্রসাদ বললেন: "কি জান দিলীপ, কবি অত্যন্ত

১—দিলীপকুমার রায়—"তীর্থঙ্কর"।

২—দিলীপকুমার রায়—স্মৃতিচারণ: দ্বিতীয় খণ্ড।

স্পর্শকাতর তো, তাই কে কবে কি বলেছে মনে রেখে ভেবে বসে আছেন যে সবাই তাঁকে ভাবে বে-দরদী, স্নেহহীন। কিন্তু আমি অকুতোভয়ে এজাহার দেবই দেব আমরা যা দেখেছি। যে এমন স্নেহশীল দরদী মানুষ খুব কমই দেখা যায়। বলেই ধরলেন তাঁর স্বরচিত রবি-স্তব : জয়তু জয়তু জয়তু কবি, জয়তু পূরব-উজল রবি" ।[৩]

তিন চারদিন কবি সংগসুখে কি আনন্দেই না সময় কেটে গেল, কখন যে কেটে গেল জানাই গেল না।

দুই প্রিয় অনুরাগীর সংগ পেয়ে কবিরও খুব আনন্দ। তাঁদের বিদায়ের বেলায় তাই উতলা হন। স্নেহের পাত্র অতুলপ্রসাদকে আগ্রহের সংগে জিজ্ঞাসা করেন, 'আবার কবে দেখা হবে অতুল' ?

শান্ত হেসে অতুলপ্রসাদ উত্তর দেন, 'হবে হবে'।

॥ পঞ্চান্ন ॥

১৯২৭ সালের ১২ই জানুয়ারী শীতের সকালে সত্যদাদা এলেন। স্টেশনে কাউকে দেখতে না পেয়ে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। হেমন্ত নিবাসে এসে জানলেন অতুলপ্রসাদ তাঁর চিঠি পান নি। চিঠি এলো তাঁর আসার পরে।

'হেমন্ত নিবাস' দেখে সত্যপ্রসাদ খুব খুশি হলেন, কিন্তু আজ খুড়িমা নেই ভেবে মনে ব্যথা পেলেন।

হেমন্তশশীর স্থান নিয়েছেন সুবালামাসী। তিনি সত্যপ্রসাদের আগেই এসেছেন। আর এসেছেন চিন্তামণি, তিনি সেই দিনই বিদায় নিলেন। সুবালা এই প্রথম লখনৌয়ে এলেন। সংগে রয়েছেন কন্যা ঊষা। তাঁর শরীর ভাল থাকছে না। পশ্চিমের জল হাওয়ায় যদি স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। এখানে এসেই সুবালা অতুলপ্রসাদের সংসার যেন মাথায় তুলে নিয়েছেন। অতুলপ্রসাদের তদারক করছেন। সুবালা লক্ষ্য করলেন উদয়অস্ত অতুলপ্রসাদের খাটুনির সীমা নেই। একদিন অতুলপ্রসাদকে বললেন, 'তুমি যখন এত খাটছ নিশ্চয়ই অনেক টাকা উপার্জন কর, কিন্তু এত টাকা তুমি কি কর' ?

৩—দিলীপকুমার রায়—স্মৃতিচারণ : দ্বিতীয় খণ্ড।

উত্তরে অতুলপ্রসাদ জানালেন, "আমি খাটি এবং যথেষ্ট উপার্জন করি সত্যি, কিন্তু সব খাটুনীই তো টাকা উপার্জনের জন্য করি না। আমার কত রকম কাজ আছে। লোকে সব কাজেই আমাকে ডাকে ; ডাকলে তো না যেয়ে পারি না।"[১]

অতুল ভবন যেন আনন্দ ভবন, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কেউ না কেউ তাঁর কাছে এসে থাকতেনই। কারুর কোন দিকে যাতে অসুবিধা না হয় সে দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। সকলকে নিয়ে তিনি যেন আনন্দে মশগুল হয়ে থাকতেন যদিও তাঁর মনে সুখ শান্তি ছিল না। স্ত্রী অন্যত্র থাকেন এজন্য তাঁর কুণ্ঠার সীমা ছিল না। ভগ্নীদের দুঃখেও তিনি দুঃখিত, কিন্তু তাঁর স্বভাব এত ধীর স্থির ও চাপা প্রকৃতির ছিল এবং এত আনন্দের সঙ্গে হৈ হৈ, গান গল্প করে কাটাতেন যে তাঁর মনের যথার্থ অবস্থার কথা কেউ জানতে পারতেন না।

১৪ই জানুয়ারী কলকাতা থেকে দিলীপকুমার একা ফিরে এলেন। মাতামহ স্যার কে, জি, গুপ্ত দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করার পর পরলোক যাত্রা করেছেন। হেমকুসুম তখন ওখানেই আছেন। কে, জি, গুপ্ত মৃত্যুকালে তাঁর প্রিয়তমা কন্যাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন।

দাদা এসেছেন। দাদাকে গান বাজনা শোনাবার জন্য অতুলপ্রসাদ বাড়িতে গানের আসরের আয়োজন করেছেন। সেদিন ১৫ই জানুয়ারী। প্রসিদ্ধ হারমোনীয়াম বাদক ঠাকুর নবাব আলী খাঁ ও প্রসিদ্ধ সরোদ বাদক সাখায়েৎ খাঁ এলেন এবং অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে নিজের নিজের বাজনা শুনিয়ে শ্রোতাদের যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে দিলেন।

দিলীপকুমার তখনো কাজকর্ম কিছুই করেন না। তাঁর খুব ইচ্ছে যে 'পোলট্রি'র কাজ শুরু করেন। সত্যপ্রসাদ শুনে বললেন, তুমি বরং পূর্ববঙ্গে চল, আমার বিশ্বাস ওখানে ও ব্যবসা খুব লাভজনক হবে। কিন্তু দিলীপকুমার অতদূর যেতে রাজী নন, সে কথা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলেন। যদি করতেই হয় এদেশেই কোথাও করবেন।

ফিরে যাবার আগে একদিন সত্যপ্রসাদ অতুলপ্রসাদকে গ্রামে স্কুল করার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। অতুলপ্রসাদকে তিনি আগেই জানিয়েছিলেন যে পঞ্চপল্লীর লোকেরা জোট বেঁধে তাঁর কাছে এসেছিলেন। গ্রামের লোকেরা

১—সুবালা দেবী—"অতুল" : "উত্তরা"।

একটি হাইস্কুল স্থাপনের কথা ভাবছেন। শুনে অতুলপ্রসাদ বলেছিলেন যদি ওঁরা স্কুলের নাম "গুরুপ্রসাদ রামপ্রসাদ হাইস্কুল" রাখতে রাজী হন তবে আমরা তিন হাজার টাকা দেব। গ্রামের লোকেরা তাইতেই রাজী। তাঁরা নিজেদের ঘর থেকে টাকা দিতে নারাজ। 'গুরুপ্রসাদ রামপ্রসাদ' নাম দিলে যদি তিন হাজার টাকা পাওয়া যায়, গ্রামে একটি হাইস্কুল হয় আপত্তির কি! সত্যপ্রসাদ সেই কথাই অতুলপ্রসাদকে জানালেন। অতুলপ্রসাদ কথা দিলেন শীঘ্রই তাঁর নামে উক্ত পরিমাণ টাকা পাঠিয়ে দেবেন।

সত্যপ্রসাদ কদিন খুব আনন্দে কাটিয়ে ২০শে জানুয়ারী বিদায় নিলেন কিন্তু মনে সুখ পেলেন না। 'হেমন্ত নিবাস' অতুলের আনন্দ নিকেতনকে তাঁর মনে হল যেন একটা পান্থশালা।

অতুলপ্রসাদ গ্রামে স্কুল করার জন্য দাদাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মনে রেখেছিলেন। কিছুদিন পরে দাদাকে চিঠি লিখলেন :

Hemanta Nibas
Charbagh, Lucknow

দাদা,

আজ তোমার নামে স্কুলের জন্য ১০০২ টাকার একখানি চেক পাঠাইতেছি। স্কুলের নামের যে প্রস্তাব করিয়াছ "ভস্ত, তামটা, নিগুন, কাঞ্চনপাড়া, গুরুপ্রসাদ রামপ্রসাদ ইনস্টিটিউশন, মগর" তাহা একেবারেই পছন্দ করি না। এতবড় নাম কখনই হয় না। নামটা একেবারেই শ্রুতিমধুর নয়। বরং হাস্যকর। আমি এ নামে রাজী নই।

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে নামটি দিতে চাহেন সেটি বেশ। পঞ্চপল্লী গুরুরাম হাইস্কুল। আশা করি এ নামটি সকলের মনঃপূত হইবে। টাকা পাঠাইতে দেরী হইল। ছেলেরা যে চিঠি আমাকে দিয়াছিল সেটি এখনও পাইতেছি না। কাহাকে লিখিতে হইবে জানাইও। উত্তর দিব।

আশা করি তোমরা ভাল আছ। আমি একরকম আছি। ব্লাড প্রেসারটা এখনো বেশ আছে বলিয়া মনে হয়। তোমরা আমার ভালবাসা নাও।

তোমার অতুল

॥ ছাপান্ন ॥

দিলীপকুমার জ্যেঠামহাশয়ের সংগে যাবেন না জানিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হলেন কিন্তু অতুলপ্রসাদ নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারলেন না। দিলীপের জন্য স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চিন্তিত, এবার তো তাঁর কিছু করা দরকার, নিজেকে ব্যস্ত রাখতে কোন কিছু নিয়ে থাকা প্রয়োজন।

দিলীপকুমারের পোলট্রি ব্যবসা করার প্রবল ইচ্ছায় ছেদ পড়ল। লাভক্ষতি তাঁকে খতিয়ে দেখানর পর তিনি সে সংকল্প ত্যাগ করেন। এরপর অতুল-প্রসাদের প্রশ্নে তিনি কি করবেন তা ঠিক করে উঠতে পারেন না। অতুলপ্রসাদই তখন অনেক চিন্তা করে তাঁকে কোন প্রেসে শিক্ষানবিসী করে পাঠাবেন স্থির করলেন এবং এ বিষয়ে সুরেশ চক্রবর্তীকে জানালেন। নির্দিষ্ট দিনে দিলীপ-কুমার কাশী না যাওয়ায় সুরেশ চক্রবর্তীকে একটি চিঠি দিলেন :—

Charbagh
Lucknow

স্নেহের সুরেশ

দিলীপকুমার এখনো গেল না। যদি পরে যায় জানাব। তুমি হয়ত অনেক অসুবিধায় পড়লে ; কিছু মনে কর না।[১]

শুভাকাঙ্ক্ষী অতুলদা

প্রেস সম্বন্ধে দিলীপকুমারের অনীহা অতুলপ্রসাদকে খুবই চিন্তিত করল। ধনীর একমাত্র দুলাল, প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ, মায়ের মমতাভরা দৃষ্টির বেড়া-জালে অতি আদরে তিনি প্রতিপালিত। মোটর ছাড়া দিলীপকুমার এক পাও চলেন না, পোশাক পরিচ্ছদে ফিটফাট, খরচের জন্য টাকা চাওয়ার আগেই তা পকেটে এসে যায়। তাঁর বন্ধুর অভাব ছিল না, তবে এক দল সুবিধাবাদী তরুণ সর্বদা তাঁকে ঘিরে থাকত, তাঁর সংগে ঘুরেফিরে বেড়াত। এরা সব

১—সুরেশবাবু বলেছেন যে, দিলীপবাবুর পড়াশোনায় মন নেই জেনে অতুলবাবু স্থির করেছিলেন দিলীপবাবুকে দশ হাজার টাকা দিয়ে একটা প্রেস করে দেবেন। তার আগে দিলীপবাবু যাতে সুরেশবাবুর কাছে থেকে প্রেসের কাজ শিখতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁকে কাশী পাঠাতে চেয়েছিলেন—লেখিকা

অতুলপ্রসাদের বন্ধু-পুত্র ; অতুলপ্রসাদ তাদের ভাল রকম জানতেন তাই সরল-মতি পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন হতেন, কোন কাজে নিয়োজিত করে তাঁকে সফলকাম করে তুলতে চাইতেন।

শেষে 'ভারত স্টোর' নাম দিয়ে তিনি দিলীপকুমারের জন্য একটি জেনারেল মার্চেণ্টস্ স্টোর করে দেন। সে দোকান দেখাশোনা করার জন্য দিলীপকুমারের সংগে ছিলেন জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক সহোদর।

উত্তরা-র জন্য অতুলপ্রসাদকে বিব্রতে পড়তে হয়েছে। পত্রিকার জন্য প্রতিশ্রুতিমত টাকা সামান্যই পাওয়া গেল। সুরেশ চক্রবর্তী চেনেন তাঁর প্রিয় 'অতুলদা'কে। তাঁর উদ্যমে উত্তরার কাজ ভালই চলছে কিন্তু পত্রিকা পরিচালনা করতে টাকার দরকার। দরকার হলেই সুরেশ চক্রবর্তী 'অতুলদা'র কাছে পেঁাছে যান, নয় চিঠি দিয়ে প্রয়োজন জানান। কয়েকবার 'উত্তরা'-র জন্য টাকা দেবার পর অতুলপ্রসাদ লিখলেন :

Hemanta Nibas
Charbagh
Lucknow
1.5.27

প্রিয় সুরেশ,

'উত্তরা'র জন্য আমাকে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে ; যদি জানিতাম আমার উপরেই সমস্ত দায়িত্ব ফেলবে তাহলে একাজে হস্তক্ষেপ করতাম না। যাহা হউক আমি আর একখানা ৫০০ টাকার চেক Indian Press এর নামে দিচ্ছি যদিও এ জন্য আমি নিজে দায়ী নই। তুমি এ চেকখানা দেবে না যদি Indian Press আমাকে তাদের টাকার জন্য Personally দায়ী করতে চান। আমি Indian Press-কেও একখানা চিঠি দিলাম। ভবিষ্যতে তুমি যে সর্তে কাগজখানি আগামী আশ্বিন পর্যন্ত চালাইতে প্রতিশ্রুত হয়েছ ঠিক সেরূপভাবে কাজ করিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

পুঃ সবশুদ্ধ আমি উত্তরা-র জন্য প্রায় ১৫০০ টাকা দিলাম।

গরমের ছুটিতে অতুলপ্রসাদ প্রথমে কলকাতায় গেলেন। বার বার ইন-ফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছেন, তার ওপর রক্তচাপ বৃদ্ধিতেও কষ্ট পাচ্ছেন।

কিন্তু উত্তরার প্রতি কর্তব্যকে অবহেলা করা যায় না। সুরেশ চক্রবর্তীর চিঠি পেয়ে তাঁকে লিখলেন :

Federation Rd.
Calcutta
13. 5. 27

প্রিয় সুরেশ,

তোমার চিঠি পেযে সুখী হলাম। আমার এখানে এসে আবার জ্বর হয়েছিল ; আজ তিনদিন ভাল আছি ; কিন্তু বড় দুর্বল। কাল পুরী যাচ্ছি। সেখানে আমার ঠিকানা—

A. P. Sen.
C/o Dr P. Das.
Puri.

রবিবাবু এখন শিলং-এ। সুতরাং তাঁকে বলতে পারলাম না : পুরী থেকে চিঠি লিখতে চেষ্টা করব। রথীবাবুকেও লিখব।

আর যেন 'উত্তরা' ছাপাতে গোল না হয়। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

পুরী পেঁাছে ওখানে কিছুদিন থাকার পর সুরেশ চক্রবর্তীকে অতুলপ্রসাদ আরো একটি চিঠি লিখলেন :

পুরী
১৬. ৬. ২৭

স্নেহের সুরেশ,

তোমার চিঠি পেয়েছি।······কয়েকটি গান ও একটি কবিতা পাঠাচ্ছি। উত্তরায় ছাপিও।···

এখানেও উত্তরার বেশ সুনাম আছে দেখলাম। আমার বোধ হয় রীতিমত চেষ্টা করলে কাগজখানা চালান যেতে পারে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

॥ সাতান্ন ॥

আউধ জুডিশিয়্যাল কোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গেল, স্থাপিত হল চীফ কোর্ট। চীফ কোর্টের প্রথম চীফ জাস্টিস্ ছিলেন একজন ইউরোপীয়ান। তা ছাড়া ছিলেন একাধিক ভারতীয় জজ।

ভারতীয় জজেদের আত্মীয়দের মধ্যে অনেক উকিল, ব্যারিস্টার ছিলেন। এই সব উকিল ব্যারিস্টাররা যখন তাঁদের আত্মীয় জজেদের এজলাসে মোকদ্দমা নিয়ে জেরা বা সওয়াল করতেন তখন এই সব জজেদের কেউ কেউ এজলাসে বসেই তাঁদের আত্মীয় উকিল ব্যারিস্টারদের ভুল ভ্রান্তি ইংগিতে বুঝিয়ে দিতেন এবং সওয়ালে এমন ভাবে সাহায্য করতেন যাতে মামলার সুফল পাওয়া যায়। এঁদের মক্কেলরা প্রায়ই জয়ী হত। তাই দেখে মক্কেলরাও এই সব উকিল ব্যারিস্টারদের কেস দিতে লাগলেন। অবশ্য এই সংগে বড় ব্যারিস্টারও নিযুক্ত করতেন তবে শর্ত থাকত যে কোর্টে তাদের মোকদ্দমার প্রথম শুভারম্ভ করবেন জজেদের কোন আত্মীয় উকিল বা ব্যারিস্টার।

এর দ্বারা জজেদের আত্মীয় নন এমন সব ব্যবহারজীবীরা খুবই অসুবিধায় পড়লেন এবং অপমানিত বোধ করতে লাগলেন। অতুলপ্রসাদ তখন আউধ বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। প্রতিকারের জন্য আইনজীবীরা তাঁর কাছে এলেন। কানাঘুষোয় অতুলপ্রসাদ সবই জেনেছিলেন। ঠিক এমনি সময়ে একজন ভদ্রলোক তাঁর কাছে একটি বড় কেস নিয়ে এলেন। তখনকার দিনে এমন কোন বড় কেস ছিল না যার এক দিকে অতুলপ্রসাদ থাকতেন না। ভদ্রলোকটির কাছ থেকে সব জেনে অতুলপ্রসাদ তাঁর কেস পরিচালনা করতে সম্মত হলেন। তখন মক্কেল তাঁকে অনুরোধ জানালেন যে, প্রথম দিনে জজ-সাহেবের নিকটতম এক আত্মীয় ব্যারিস্টারকে দিয়ে কেসটির শুভারম্ভ করাতে হবে।

স্বাধীনচেতা অতুলপ্রসাদ তখুনি মক্কেলের কাগজপত্তর সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এমন অন্যায় কাজ তাঁকে দিয়ে হতে পারে না, অসম্ভব।

এ ঘটনার পর সহকর্মীদের কাছ থেকে আবার প্রতিকারের অনুরোধ এলে তিনি নিজের নেতৃত্বে ডেপুটেশন নিয়ে তৎকালীন চীফ্ জাস্টিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সব জানালেন।

কিন্তু তখনকার রাজনীতি বা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এমনিই ছিল যে এ অভিযোগের কোন সুফল পাওয়া যায় নি।

॥ আটাশ ॥

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭ সালে জাভায় ভ্রমণ করে ফিরে আসেন। তার পরের বছর তাঁর ঐ ভ্রমণ কাহিনী 'জাভাযাত্রীর ডায়েরী' নাম দিয়ে 'উত্তরা'য় প্রকাশের জন্য দেন। ঐ বছরই রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য ধর্ম' নামক প্রবন্ধে আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনা করেন এবং সেটি 'বিচিত্রায়' প্রকাশের জন্য দেন। এরপর তিনি মালয়দেশ ভ্রমণে চলে যান"।[১]

'সাহিত্য ধর্ম' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে; শরৎচন্দ্র, নরেশ সেনগুপ্ত ইত্যাদি লেখকরা প্রতিবাদ জানান। 'উত্তরা'-ও আধুনিক লেখকদের সমর্থন করত। সে জন্য উক্ত মাসিকপত্রে একাধিক প্রতিবাদ রচনা প্রকাশিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন মালয়দেশ ভ্রমণে রত।

কিন্তু তিনি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কয়েকজন অনুরাগী তাঁকে খবর দেন যে 'উত্তরা'য় তাঁর 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধের বিরুদ্ধে গরম গরম প্রতিবাদ রচনা প্রকাশিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ শুনে ক্ষুন্ন হলেন এবং তখুনি অতুলপ্রসাদ ও সুরেশ চক্রবর্তীকে চিঠি লিখে 'উত্তরা'-য় তাঁর 'জাভাযাত্রীর ডায়েরী' প্রকাশ করতে নিষেধ করে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি অতুলপ্রসাদের গভীর শ্রদ্ধা এবং হৃদয়ের নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও এ ব্যাপারে তিনি একেবারে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন। সম্পাদকের অধিকার নিয়ে তিনি 'উত্তরা'-র কাজে কখনো হস্তক্ষেপ করেন নি। এর কারণ

১—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-জীবনী : ৩য় খণ্ড।

দুটি। একটি হল—তিনি একক ক্ষমতার জোরে কাজ করার চেয়ে সমষ্টিগত ভাবে কাজ করা পছন্দ করতেন। দ্বিতীয় হল—'উত্তরা'-র নিজস্ব আদর্শের প্রতি তিনি কোন রকম বিঘ্ন ঘটান সমীচীন বোধ করতেন না। তাই 'উত্তরা'-কে কেন্দ্র করে সে অসন্তোষ ধূমায়িত হয় তিনি সে বিষয়ে নিঃশব্দ থেকে সময়ের হাতে সমাধানের ভার ছেড়ে দেন।

অতুলপ্রসাদ এই ধাক্কা সামলে নেবার পর আবার এক ধাক্কা এলো। রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু তখন কলকাতায় পাবলিক প্রসিকিউটর। তিনি আধুনিক সাহিত্যের ওপর বিরূপ ছিলেন। যখন কয়েকজন আধুনিক লেখক ও তাঁদের সমর্থক 'উত্তরা'-র নামে সাহিত্যে অশ্লীলতার জন্য কোর্টে নালিশ করেন। তখন রায় বাহাদুর তাঁদের পক্ষ নেন। এই মামলায় অতুলপ্রসাদ, রাধাকমল ও সুরেশ চক্রবর্তী জড়িয়ে পড়েন। অবশ্য সময়ের স্রোতে ক্রমে সব ঠিক হয়ে যায়। 'উত্তরা'-ও আবার রবীন্দ্রনাথের ভ্রূকুটি মুক্ত হয়ে তাঁর স্নেহলাভ করে ধন্য হয়। সুরেশ চক্রবর্তীর চিঠিতে সে খবর পেয়ে খুশি হয়ে অতুলপ্রসাদ লিখলেন :

Hemanta Nibas
Charbagh
Lucknow
24. 9. 29

প্রিয় সুরেশ,

গান পাঠাতে দেরী হয়ে গেল। আশা করি এখনও সময় আছে। বড় কাজে ব্যস্ত ছিলাম।.........

শুনে সুখী হলাম রবিবাবু কবিতা পাঠিয়েছেন এবং পূজার সংখ্যা ভাল হবে। তুমি কৃতকার্য্য হও এই প্রার্থনা।

শুভাকাঙ্ক্ষী
তোমার অতুলদা

১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লখনৌ শহরে আবার রবীন্দ্রনাথের আগমন হল। স্নেহের পাত্র অতুলপ্রসাদের হেমন্ত নিবাসে তিনি অতিথি হলেন।

অতুলপ্রসাদের আনন্দের সীমাপরিসীমা নেই। খোলা জানলা দিয়ে উন্মুক্ত আকাশ দৃষ্টিগোচর না হলে কবি-প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে। অতুলপ্রসাদ

দোতলায় পূবদিকের ছোট ঘরটিতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। এ ঘরে বসে কবি আকাশ দেখতে পাবেন, আবার নিচের দিকে তাকালেই অতুলপ্রসাদের প্রিয় গোলাপ বাগান দেখতে পাবেন। এ সময়ে তাদের রঙের বৈচিত্র্য ও মধুর গন্ধ মনে মাদকতা আনে।

তবু অতুলপ্রসাদ বিব্রত বোধ করলেন। তাঁর বিরাট প্রাসাদ সঙ্গিনী-বিহীন; হেমকুসুম লখনৌতেই আছেন কিন্তু তিনি অসুস্থ, অক্ষম; কবির পরিচর্যা কে করবে? সমাধান হল, ভ্রাতৃজায়া ললিতা দাস তাঁর অনুরোধে সে ভার নিয়ে তাঁর উৎকণ্ঠার নিরসন ঘটালেন।

দুজনেই কবি এবং সুরসিক। একদিন প্রাতঃরাশে অতুলপ্রসাদকে 'ওটের পরিজ' খেতে দেখে রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "ওহে অতুলপ্রসাদ, এসব ঘোড়ার খাদ্য খাও কেন?" আবার নিজে যখন পরমান্ন খাচ্ছেন তখন অতুপ্রসাদকে শোনালেন, "যে পরমান্ন ফেলে ঘোড়ার খাদ্য খায় তাকে কি বুদ্ধিমান বলা চলে।"[২] শুনে অতুলপ্রসাদ প্রাণখোলা হাসি হাসলেন।

অতুলপ্রসাদ প্রতিবছর রবীন্দ্রনাথকে লখনৌয়ের বিখ্যাত আম পার্শেল করে পাঠাতেন। সেই বছরও আম পাঠিয়েছিলেন। পার্শেল পেঁছিলে তার ভেতর থেকে আমের বদলে পাওয়া গিয়েছিল ঝুড়ি ভর্তি ইট পাটকেল। অতুল-প্রসাদের সঙ্গে গল্প করার সময় কবি এ ঘটনা খুব রসিয়ে বলে শেষে মন্তব্য করলেন, "অতুল, মনে হচ্ছে এবার তুমি পার্শেলটি ভাল মনে পাঠাওনি।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ এসেছেন এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হেমন্ত নিবাস যেন জনারণ্যে পরিণত হল। অতুলপ্রসাদ ছোট বড় গণ্যমান্য সকলকেই আনন্দে স্বাগতম্ জানালেন।

যেখানে রবীন্দ্রনাথ এবং অতুলপ্রসাদ সেখানেই সঙ্গীতের মধুর সংগম। চলল রবীন্দ্র-সংগীত ও অতুল-সংগীতের আসর। গান গাওয়া ও গান নিয়ে চর্চা দুই-ই হল, ধূর্জটিপ্রসাদের গান সম্বন্ধে কতও প্রশ্ন, পাহাড়ী সান্ন্যাল তাঁর সুমধুর কণ্ঠে কত গান শোনালেন; অতুলপ্রসাদ স্বয়ং তো আছেনই।

এই সময়ে অতুলপ্রসাদের নিমন্ত্রণে সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লখনৌ আসেন এবং কবি-সঙ্গসুখ লাভ করে আনন্দিত হন।

সেই আনন্দের 'দিনগুলির ফাঁকে ফাঁকে অতুলপ্রসাদ বলে মানুষটিকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মুন্সী, চাকর, ড্রাইভার, খানসামা সবাই

২, ৩—ললিতা দাস—"অতুলপ্রসাদ স্মরণে" : "আমাদের কথা"।

পরিবারভুক্ত, স্বজন। তাঁর সামান্য অসুখে, সবাই চঞ্চল, সবাই বিমর্ষ। তাদের কাছে শুনলুম—'ধমকাতে জানেন না—এত দরদ, এত দয়া; মা বাপের কাছে পাই নি। কারুর দুঃখ দেখতে পারেন না, দু চারটাকার কম দিতে দেখিনি।'—আর সব বড় বড় ত্যাগ ও গোপন সাহায্যের কথা গল্পের মতই ঠেকবে।

"কয়দিন সকল দিক বজায় রেখে, একটু একান্ত হলেই তাঁকে নির্লিপ্ত বৈরাগীর মতই পেয়েছি। সে কি উদার আত্মহারা নিবিষ্টতা"।[৪] কেদারনাথ তাঁর একটি রচনায় অতুলপ্রসাদকে আদর্শ পুরুষ বলে উল্লেখ করেছেন।

পাঁচদিন গানে গানে লখনৌ শহরকে প্লাবিত করে রবীন্দ্রনাথ বিদায় নিয়ে বরোদায় যাত্রা করলেন।

॥ ঊনষাট ॥

লখনৌয়ে 'বেঙ্গলী-ক্লাব' স্থাপনের কৃতিত্ব ৺অতুলকৃষ্ণ সিংহের। ১৯০১ সালে তিনি রেলওয়ে বিভাগে চাকরি নিয়ে লখনৌয়ে আসেন। সারাদিন খাটুনির পর ক্লাবে সময় কাটে ভাল। সেই উদ্দেশ্যে কজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে একটি ক্লাব তৈরী করেন; নাম দেন 'বেঙ্গলী-ক্লাব'। বেঙ্গলী-ক্লাব ভবনটি তাঁর সময়েই তৈরী হয়।

অতুল সিংহের অকালমৃত্যুতে ক্লাবের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। তার চেয়েও বড় কথা ক্লাবের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে। স্থানীয় বাঙালী-দের পক্ষে তখন দুটি বাঙালী সংস্থা—'বেঙ্গলী ক্লাব' ও 'বঙ্গীয় যুবক সমিতি' আলাদা আলাদা ভাবে পরিচালনা করা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। সংস্থা দুটিকে বাঁচাতে দুপক্ষের কর্মকর্তারা ১৯২৭-এ একত্র হয়ে আলাপ আলোচনা করলেন।

১৯২৮-এ দু পক্ষই স্থির করলেন যে দুটি সংস্থাকে সংযুক্ত করা হোক।

১৯২৯-এ অতুলপ্রসাদের চেষ্টায় দুটি সংস্থা সুচারুভাবে সংযুক্ত হল এবং যুগ্ম সংস্থার নাম দেওয়া হল 'বেঙ্গলী ক্লাব ও ইয়ংম্যান অ্যাসোসিয়েশান'। প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হলেন অতুলপ্রসাদ সেন।

৪—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—"তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে" : "উত্তরা"।

তারপর আমৃত্যু অতুলপ্রসাদ এই সংস্থার সভাপতি ও কর্ণধার ছিলেন এবং তাকে সকল রকমে সাহায্য করেছেন।

হেমকুসুম নিঃসংগ হলেও নিষ্কর্মা নন, ছবি আঁকেন, সেলাইয়ের কাজ করেন। কুরুশে বুনে নিজের একটি প্রমাণ সাইজের সেমিজ তৈরী করে ফেললেন। ছাঁটকাটেও তিনি নিপুণা, এতটুকু কাপড় নষ্ট না করে কেমন সুন্দর ব্লাউজ কাটতে পারেন। গান—সে তো আছেই, অনুরাগী বা ভক্তরা এলে গান শুনতে চাইলে তাঁর আপত্তি নেই, অতুলপ্রসাদের রচিত গান গেয়ে শোনান। দিলীপকুমারের তরুণ বন্ধুদের সংগে গল্প করেন, তাঁদের যত্ন করে খাওয়ান। তারপর বিকেলবেলা বেড়াতে বেরিয়ে যান। আই, টি, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিস প্রেমনাথ দাস, ব্যারিস্টার সিংয়ের পত্নী তাঁর প্রিয় বান্ধবী।

বেড়াতে বেরিয়ে ব্যারিস্টার সিংহের বাড়ি পেঁৗছে যান। সুস্থ অবস্থায় তিনি এ বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। বড় ও ছোট মিসেস সিংহকে নিয়ে বেড়াতে চলে যেতেন। প্রথম প্রথম তাঁরা বাইরে বেরুতে সংকোচ বোধ করতেন। ব্যারিস্টার সিংহের মা রক্ষণশীলা ছিলেন। একদিন হেমকুসুম যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ব্যারিস্টার সিংহের মাকে বললেন, আপনার ছেলেরা বিলেত-ফেরত, আপনি শিক্ষিত পরিবার থেকে আসছেন আর আপনার পুত্রবধূদের এমন করে ঘরে বন্ধ করে রাখেন কেন, বাইরে ছেড়ে দিন ওদের, আপনিও চলুন। আজই চলুন আমাদের ক্লাবে ইংরেজী নাটক দেখিয়ে আনি।

হেমকুসুমের যে কথা সেই কাজ। ব্যারিস্টার সিংহের মা এবং বাড়ির সব মহিলাদের নিজের গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে ক্লাবে ইংরেজী নাটক দেখিয়ে আনলেন।

আজো এলেন কিন্তু আর হাঁটাহাঁটি করার শক্তি নেই। আয়া (পরিচারিকা) মেরী তাঁকে ধরে গাড়িতে বসিয়ে দেয় এবং সর্বক্ষণ তাঁর সংগে থাকে। গাড়িতে বসে থাকলে তিনি যে চলৎশক্তিহীনা তা বোঝাই যেত না।

হরিমতী গার্লস স্কুল-এর অধ্যাপিকাদের সংগে তাঁর প্রীতিময় হৃদ্যতা। রবিবার হলেই অধ্যাপিকা স্নেহ চৌধুরীর ফ্ল্যাটে পেঁৗছে যেতেন। তারপর ফরমাশ করতেন,'গান কর তো শুনি, এ. পি. সেনের গান।' সে গান মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, শেষ হলে মন্তব্য করতেন, 'গান এ. পি. সেন ভালই লেখে তবে বড় কুইপারা সুর (করুণ সুর)।'

স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ মধ্যে মধ্যে হয়। হেমকুসুম কিন্তু অতুলপ্রসাদের প্রতিদিনের সব খবর রাখেন। খবর সংগ্রহ করেন অন্যের মারফত, যাদের মধ্যে সুবিধাবাদী ব্যক্তি কিছু ছিল। ফলে সত্য খবরের সংগে সংগে অনেক মিথ্যে খবরও পেতে লাগলেন, সুবিধা বুঝে সুবিধাবাদীরা তাতে ডালপালা যোগ করে তাঁকে পরিবেশন করতে লাগল। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দারুণ ভুল বোঝা-বুঝির সৃষ্টি হল; হেমকুসুম অভিমানে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। অবস্থা এমন হয়ে উঠল যে স্বামী-স্ত্রী স্থায়ীভাবে আলাদা থাকার সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন। অবশ্য অচিরেই তাঁদের লখনৌস্থিত আত্মীয়ের চেষ্টায় স্বামী-স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝির নিরসন হয় এবং দুজনের মাঝে শান্তি এবং সন্তোষ ফিরে আসে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি যখন প্রবল তখনই অতুলপ্রসাদ তাঁর উইলটি রচনা করেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে অতুলপ্রসাদ ১৯৩০-এ চতুর্থবার বিলেত যাত্রা করেন। গেণ্ডারা তালুকের কেস নিয়ে তাঁকে প্রিভি কাউন্সিলে যেতে হয়।

অতুলপ্রসাদের শরীর এ সময়ে খুবই অসুস্থ ছিল। রক্তচাপ বৃদ্ধি তো আছেই, তার ওপর বার বার ইনফ্লুয়েঞ্জাতে ভুগে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। বাতের অসুখেও কষ্ট পান।

কিন্তু কর্তব্যের আহ্বান তাঁর কাছে শরীরের চেয়েও বড়। বিলেতের আহ্বানের আকর্ষণ তো আছেই। সুহৃদ-বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন যে এই স্থান পরিবর্তনে হয়তো শারীরিক উন্নতি হতে পারে।

অতুলপ্রসাদ উৎসাহিত হয়েই প্রথমে কলকাতায় রওনা হলেন। বিলেত যাবার আগে দাদাকে চিঠি লিখলেন:

দাদা, বন্ধু আমার,

আজ বিলেত যাবার পথে বম্বে যাচ্ছি। বিলেত পেঁৗছে তোমাকে চিঠি লিখব। আমায় নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠি লিখ:

A. P. Sen
C/O. Messrs. Thomas Cook & Son
Berkely Street
Piccadilly
London.

আমি সেপ্টেম্বরের শেষে দেশে ফিরব। দেশেরও এখন যা অবস্থা। বিধাতার কি অভিপ্রায় জানি না। আজ তাড়াতাড়ি।

তোমার ভাই অতুল

১৯৩০-এ গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারত জুড়ে অসহযোগ আন্দোলনে জনতা মেতে উঠেছে। নেতারা রাজশক্তির রোষবহ্নিতে পড়ে একে একে জেলে যাচ্ছেন; জনতার ওপর পুলিসের অকথ্য অত্যাচার চলছে। দেশভক্ত অতুলপ্রসাদ এই সময়ে দেশ ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে এবং দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

॥ ষাট ॥

বিলেতে অতুলপ্রসাদ মিসেস পালিতের[১] অতিথি হন। মিসেস পালিত তখন 'গোলডার্স গ্রীন' অঞ্চলে বাস করতেন। অতুলপ্রসাদ আসছেন খবর পেয়ে নিজের কটেজের একটি ঘর সুসজ্জিত করে রাখেন।

কতদিন পরে অতুলপ্রসাদ মিসেস পালিতকে দেখলেন, অভিভূত হলেন।

অতুলপ্রসাদ বিলেতে থাকাকালীন ঘটনাচক্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কী সে আনন্দের দিন! রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাশিয়া-সফর শেষ করে মে মাসে লণ্ডনে আসেন; উঠলেন লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত বিড়লা-প্রতিষ্ঠান আর্যভবনে।

খবর পেয়ে অতুলপ্রসাদ বিস্মিত, উৎফুল্ল। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য রওনা হলেন।

তিনি যখন এলেন তখন রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে বসেছিলেন চারজন তরুণ চিত্রশিল্পী…ললিতমোহন সেন, সুধাংশু রায়চৌধুরী, রণদা উকিল এবং ধীরেন দেববর্মা। কবিগুরু অতুলপ্রসাদের সঙ্গে চার শিল্পীর পরিচয় করিয়ে

১—লোকেন পালিতের পত্নী।

দিলেন। বিশ্বকবির সঙ্গে সঙ্গে গীতকার অতুলপ্রসাদকে পেয়ে চার শিল্পী মহা খুশি। তাঁরা অতুলপ্রসাদের গান শুনতে উৎসুক হলেন। অতুলপ্রসাদের কাছে অনুরোধ জানালেন, আমরা আপনার গান শুনব।

যেখানে অতুলপ্রসাদ সেখানেই গান। প্রবাসী ভারতীয়রাও অতুলপ্রসাদের আগমন সংবাদ পেয়ে মিসেস পালিতের কটেজে এসে উপস্থিত হলেন। মিসেস পালিতের কটেজে গানের আসর বসে গেল।

লণ্ডন শহরে যখন অতুলপ্রসাদ যান তখন ওখানে রণজিৎ সেন ছিলেন। তিনি কলকাতায় নানা অনুষ্ঠানে একাধিকবার অতুলপ্রসাদের গান করেছেন। এখানে গানের আসরে গান রচয়িতাকে তিনি দেখলেন, আলাপ হল। এরপর রণজিৎ সেন অতুলপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর গান নিয়ে আলোচনা করেন।

রণজিৎ সেন জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা, আপনি যখন গান রচনা করতেন তখন কি বিশেষ কোন পরিবেশের প্রয়োজন হত? কোন বিশেষ ঘটনা বা অভিজ্ঞতা আপনার গান লেখার প্রেরণা হত কি?"

মৃদু হেসে অতুলপ্রসাদ বলেছিলেন, "সব সময়ে নয়। ভাব (expression) অনেক সময়েই আত্মবাদী (Subjective) পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সব সময়ে তার যোগাযোগ থাকে না।" উদাহরণ-স্বরূপ বলেছিলেন, "কোর্টে recess. চারদিকে উকিল, আরদালী, পেয়াদা, পুলিস, সাক্ষীরা ঘোরাফেরা করছে। নিজের চেম্বারে এসে বসেছি। এই হট্টগোলের মধ্যেও গান মনে এলো। লিখলাম—"ওগো আমার নবীন শাখী, ছিলে তুমি কোন বিমানে"। জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"আপনার 'জল বলে, চল মোর সাথে চল' গানটি পড়ে মনে হয়েছিল আপনি যেন কোন এক জ্যোৎস্না রাতে নৌকা করে নদী দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ঐ গানটি মনে এসেছিল।" এবারেও হেসে বলেছিলেন, "মোটেই না। কোর্টে যাবার তাড়া, বাথরুমে স্নান করছি, ঘটি দিয়ে বার বার মাথায় জল ঢালছি, তখন ঐ গানটি মনে এলো। কাজেই বুঝতে পারছ গান লিখতে সব সময় কোন বিশেষ পরিবেশের দরকার হয় না। তবে আমার 'বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখি পাতে' গানটি লিখেছিলাম মফস্বলের এক ডাকবাংলোতে। কোন একটি কেসে গিয়েছিলাম। ডাকবাংলোর বারাণ্ডায় রাতে ডিনারের পর ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে একা বিশ্রাম করছি। বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। চোখে ঘুম আসছে না। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ও ব্যাঙের ঐকতান শুনছি। মনটা হঠাৎ উদাস হয়ে গেল। এই গানটি তখন লিখেছিলাম"।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল ওঁর গানের স্বরলিপি সম্বন্ধে।...অতুলপ্রসাদ বলেছিলেন, "স্বরলিপি হল সুরের ও তালের কাঠামো। সেই নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যেই যে সুরকে আটকে রাখতে হবে তা তো নয়। অবিশ্যি কয়েকটি গান ছাড়া, যেমন আমার জাতীয় সংগীতগুলো। সেগুলো সমবেত কণ্ঠে ভাল শোনায়, তাই সেগুলো নির্দিষ্ট সুরে একভাবে গাইতে হবে যাতে কারো অসুবিধা না হয়। কিন্তু অন্য গানের বেলায়, যেমন খেয়াল, ঠুংরী, গজল ইত্যাদি যেখানে গায়ক একা গাইছেন, সে বন্ধন থাকতে পারে না। শিল্পী গাইবার সময় গানের ভাবধারাটিকে সম্পূর্ণ বজায় রেখে যদি তান বিস্তার করেন, সুরের কোনরকম অংগহানি না করে যদি সুরবিহার করেন, তাহলে সেটা দূষণীয় মনে করি না। শিল্পীর স্বাধীনতা আমি মানি, তবে যথেচ্ছাচার নয় : আমার গানে কালোয়াতী নয়, উচ্ছ্বাস থাকলেও সংযম থাকবে। শিল্পী যদি পারদর্শী হন, তিনি যদি গলার সূক্ষ্ম কাজ বার করতে পারেন তাতে ক্ষতি নেই, বরং তাতে গানের সৌষ্ঠব আরো বাড়বে। শুধু স্বরলিপির ওপর চোখ বুলিয়ে গাইলে সে গান মেকানিক্যাল, প্রাণশূন্য হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর অনুভূতি আলাদা রকমের ; তাদের প্রকাশভংগী তাই আলাদা হতে বাধ্য। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি ? After all আর্টের বেলাতেও variety is the spices of life, এটা তো মান ?"[২]

নিজের সুর সম্বন্ধে তাঁর উদার দৃষ্টিভংগি এবং শিল্পীর অধিকার সম্বন্ধে তাঁর মতামত মনকে অভিভূত করে এবং শ্রদ্ধায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর নিজের গান সম্বন্ধে, বিশেষ করে সুর সম্বন্ধে যে কতও মমত্ব ছিল তা শ্রীযুক্তা রেণুকা দাসগুপ্তকে বলা তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায় ; "জানো আমার এই গানগুলি আমি চলে যাওয়ার পর যা তা সুরে গাওয়া হবে ভাবলে আমার অসহ্য মনে হয়। হিমাংশু (হিমাংশু দত্ত) খুব সুন্দর স্বরলিপি তোলে। ভাবছি তাকে দিয়ে স্বরলিপি করিয়ে রাখব।"[৩] এতও উদ্বেগ ও মমত্ব সত্ত্বেও কিন্তু শিল্পীর অধিকারকে স্বীকার করতে তাঁর আপত্তি হয় নি।

বিদেশের জলবায়ুর গুণে এবং একটি শান্ত, আনন্দঘন পরিবেশে থাকার

২—রণজিৎ সেন—'অতুলপ্রসাদ ও তাঁর গান' : "আমাদের কথা"।
৩—রেণুকা দাসগুপ্ত—'গীতকার অতুলপ্রসাদ সেন' : "আমাদের কথা"।

দরুন অতুলপ্রসাদ বিলেত থেকে বেশ খানিক সুস্থ ও প্রফুল্ল মনে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তিনি সোজা তাঁর কর্মস্থান লখনৌয়ে ফিরে এলেন এবং দুঃসংবাদ শুনলেন —ছোট ভগ্নীপতি শেষাদ্রি আয়েংগার মারা গেছেন। শোকার্ত প্রভা যখন হাহাকার করে তাঁর বুকে লুটিয়ে পড়লেন তখন অতুলপ্রসাদের বুক বেদনায় উদ্বেল হয়ে উঠল। কিন্তু তিনি সংযত কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমি তো আছি, ভাবনা কি।

শেষের কয়েক বছর অতুলপ্রসাদ প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। ডাক্তারদের পরামর্শে খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে খুব নিয়ম মেনে চলতেন। প্রতিবেশী বন্ধুবর বিরাজ গুপ্ত, জজ সাহেব যতীন বসু পরামর্শ দিলেন কাজের ভার কমিয়ে দাও, বিশ্রাম নাও। বিরাজ গুপ্ত ছিলেন তাঁর শেষ জীবনের বিশেষ বন্ধু। 'হেমন্ত নিবাসে' আসার পর দুই বন্ধুর প্রতিদিন সাক্ষাৎ হত এবং অতুলপ্রসাদ তাঁর পারিবারিক ও প্রাণের সব কথা তাঁকে বলে মন হালকা করতেন।

বন্ধুর কথায় অতুলপ্রসাদ কাজের ভার কমিয়ে দিলেন। তাঁর জুনিয়রের অভাব নেই। হেমন্তকুমার ঘোষ এবং মাসতুতো ভ্রাতা সুধীর দাস তো আছেনই, আরো আছেন কিরণ ঘোষাল, গোলাপ চাঁদ শ্রীমল, মিস্টার টমাস, বীরেন্দ্রনাথ রায়, মুবাশীর হোসেন ও আরো অনেকে ছিলেন, যাঁদের কেউ কেউ পরবর্তী কালে অন্য ক্ষেত্রে চাকরি নিয়ে চলে গেছেন।

কিন্তু বিশ্রাম নিতে চেষ্টা করেও বিশ্রাম হয় না। অতুলপ্রসাদ সেন— সেন সাহেব, ভাই দাদা সকলের প্রিয়, তাই চারিদিক থেকে ডাক আসে, তাঁকে বাদ দিয়ে যে আবার কোন কাজই হতে পারে না। সভা সমিতি, বিশ্ববিদ্যালয়, বেংগলী ক্লাব, সেবাশ্রম নানা প্রতিষ্ঠান, স্কুল কলেজ সবাই তাঁকে ডাকেন আর উৎসাহী অতুলপ্রসাদ সে সব ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন না। আবার অনেক কাজে নিজেই এগিয়ে যান, দৌড়ঝাঁপ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় মতিলাল নেহরু, জহরলাল নেহরু ও আরো বিশিষ্ট নেতারা লখনৌ জেলে

বন্দী ছিলেন। অতুলপ্রসাদ নিজে গিয়ে তাঁদের সুখ সুবিধা দেখতেন, বাড়ি থেকে কার্পেট, বিছানা, কাঁচের বাসনের সেট পৌঁছে দিয়ে আসতেন।

বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি অসুস্থ, তিনি নিজের অসুস্থতা উপেক্ষা করে তাঁদের দেখতে যেতেন। আবার পথের ধারে কোন অসুস্থ মানুষ পড়ে থাকতে দেখলে ব্যবস্থা করে নিয়ে গিয়ে তাকে হাসপাতালে না দেওয়া পর্যন্ত তিনি শান্তি পেতেন না। এমন ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। ফলে শরীর আরো খারাপ হতে থাকে। ভগ্নীরা, আত্মীয়স্বজনরা তাঁকে তাদের কাছে যেতে লেখেন। কলকাতা থেকে কিরণ লিখলেন, দাদা, তুমি আমার কাছে এসো, ভাল ভাবে নিজের চিকিৎসা করাও। আমি তোমার সেবা করব।

চিকিৎসার জন্য তাঁকে প্রায়ই কলকাতা যেতে হয়। এবারও কলকাতা যাওয়াই স্থির করলেন। দ্বিতীয় মুন্সী জানকীপ্রসাদকে[১] সব বুঝিয়ে দিয়ে আত্মীয়, বন্ধু, অনুরক্ত, ভক্ত সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অতুলপ্রসাদ এবার কলকাতায় রওনা হলেন।

কলকাতায় কিরণের বাড়িতে উঠলেন। তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে সবাই চিন্তিত হলেন। কিরণ তাঁকে খুব যত্ন ও সাবধানতার সংগে দেখাশোনা করতে লাগলেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার এসে পরীক্ষা করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন এবং বলে দিলেন সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে। গান, গাওয়াও চলবে না।

এ কী বিড়ম্বনা! অতুলপ্রসাদ বিব্রত বোধ করলেন, চুপচাপ শুয়ে বসে থাকা যায় নাকি!

তাঁকে থাকতে দিচ্ছেই বা কে। অতুলপ্রসাদ কলকাতায় এসেছেন, গান-পিপাসু অনুরাগীরা ছুটে এলেন। কিরণ তাঁদের অতুলপ্রসাদের অসুস্থ শরীরের কথা বলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিদায় করেন।

কিন্তু কখনো কখনো এমন হয় যে কিরণ কাজে ব্যস্ত থাকেন। অতুলপ্রসাদ আগন্তুকের প্রার্থনা শুনে নিয়ে বলেন দরজা ভেজিয়ে দাও আর দেখ, পাশে কলঘরে কলটা খুলে রেখে এসো। এবার নিশ্চিন্ত, অতুলপ্রসাদ তাঁর সংগীত-পিপাসুকে নিম্নস্বরে গান গেয়ে শোনান। অবশ্য এমনিতেই তিনি উঁচু সুরে গাইতেন না।

১—দিলীপকুমার সেন বলেছেন যে জানকীপ্রসাদ অতুলপ্রসাদের দ্বিতীয় মুন্সী ছিলেন।

তাঁর কাছে একদিন অমল হোম এলেন। জানালেন, অতুলদা, সামনেই রবীন্দ্রজয়ন্তী, আপনি এ সময়ে এখানে আছেন ভালই হয়েছে ; রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে আপনাকে কিছু বলতে হবে।

অতুলপ্রসাদ ফিস ফিস করে বললেন, চুপ চুপ, কিরণ শুনতে পেলে এখনি হৈ হৈ শুরু করে দেবে। ডাক্তার আমায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন, গান গাওয়াও চলবে না।

তবে থাক অতুলদা—

তা কখনো হয়, রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে আমি যাব না, কলকাতায় থেকেও ! সেদিন আমি নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকব সভায়, দেখ।

সত্যিই অতুলপ্রসাদ সবার আপত্তি উপেক্ষা করে ১৩ই মে রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভায় হাজির হলেন, কী আনন্দ তাঁর ! সে সভায় তিনি একটি সুন্দর ভাষণ দিলেন এবং রবি-বন্দনা করে গাইলেন।

গাহো রবীন্দ্রজয়ন্তী-বন্দন,
ভকত জনে আনো পুষ্প চন্দন।
বরো বরেণ্যে জগতমান্যে,
মুখর যাঁর গানে কাব্যকানন।
সাহিত্য-আকাশে ভাতে যত রবি,
ইন্দ্র সবাকার, তুমি ওহে কবি,
গৌড় গৌরবে তোমার সৌরভে,
বিশ্ব বিমোহিত, মুগ্ধ গুণীজন।
হে অমর কবি, থাক মরলোকে
বর্ষ বহু আরো মোদের সম্মুখে ;
বঙ্গবীণা আরো বাজাও গুণী,
মহান্ মোহন বাণী কহো শুনি।
রচো এ ভুবনে 'শান্তিনিকেতন'
পূর্ণ হউক তব পুণ্যসাধন।

৮ই মে ১৯৩১

বাংলা ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৮

Wormest greetings. May you be spared many more years to us, India and world.

Devoted Atul[২]

গরমের ছুটি কলকাতায় কাটিয়ে ঠিক কোর্ট খোলার সময় অতুলপ্রসাদ লখনৌ ফিরে এলেন। তাঁকে কাছে পেয়ে সকলেই মহা খুশি। শুরু হল আবার তাঁর কর্মজীবন, ব্যস্ত চঞ্চল কর্মজীবন।

অতুলপ্রসাদ আউধ বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট আগেই ছিলেন। এই বছরে তিনি আউধ বার কাউন্সিলেরও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। তিনিই লখনৌয়ে প্রথম ভারতীয় এই পদ অলংকৃত করলেন। এতদিন এ পদে রাজপুরুষেরাই নির্বাচিত হতেন। এই পদের সম্মান তিনি আমৃত্যু বহন করে গেছেন।

তাঁর এই সম্মানে বন্ধুবর জগৎনারায়ণ, বিশ্বেশ্বর নাথ, মহম্মদ নসীম উল্লাস প্রকাশ করে অভিনন্দন জানালেন এবং বাঙালী অবাঙালী বন্ধু, সহকর্মী অনুরক্তরাও এই শুভ সংবাদ শুনে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন।

॥ বাষট্টি ॥

মহাসমারোহে এলাহাবাদ ও দিল্লীতে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব প্রতিপালিত হয়। সেই উপলক্ষে অতুলপ্রসাদ এলাহাবাদ উৎসবের সভাপতিরূপে নিম্নোক্ত ভাষণটি দেন :

রবীন্দ্রনাথের ভক্তবৃন্দ,

অদ্যকার রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের সভাপতির উচ্চাসনে বসাইয়া আপনারা যে অভাবনীয় ভাবে আমাকে সম্মানিত করিলেন তজ্জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আজ প্রাতে এলাহাবাদ আসার পর বন্ধুবর জাস্টিস্ লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে জানাইলেন যে আমাকে এই পদ গ্রহণ

২—রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্মজয়ন্তীতে অতুলপ্রসাদ উপরোক্ত তারবার্তা পাঠান।

করিতে হইবে। পূর্ব হইতে তাই প্রস্তুত হইয়া আসিতে পারি নাই। ক্ষমা করিবেন।

আপনারা সকলেই জানেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অসামান্য ও বহুমুখী। তিনি বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠতম কবি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গদ্য-সাহিত্যেও তাঁহার স্থান কাহারও নিম্নে নহে। প্রবন্ধ, সমালোচনা, ছোট-গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। বৈচিত্র্যে তাঁহার সমকক্ষ বোধ হয় আজকাল জগতে কেহই নাই! তিনি অশ্রান্ত কর্মী, জননেতা, চিন্তানায়ক, বিশ্বের মহান বার্তাবাহক। বিধাতা যেন অন্যমনস্ক হইয়া তাঁহার বিচিত্র-দান-সম্ভার রবীন্দ্রনাথকে নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন, মনে হয় যেন তাঁর সম্বন্ধে বিধাতা একটু পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন। বাহিরে এবং ভিতরে কোন দিক দিয়াই তিনি বঞ্চিত হন নাই। বাল্যে, যৌবনে, প্রৌঢ়াবস্থায়, এমন কি বার্দ্ধক্যেও তাঁর মত সুদর্শন পুরুষ খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁর চেহারা দেখিলেই লোক আকৃষ্ট হয়। তাঁর হস্তলিপি এত সুন্দর যে আজ শিক্ষিত বাঙালীরা অনেকেই তাঁর হস্তাক্ষর অনুকরণ করেন দেখিতে পাই।

আমি আজকার সভায় কবির এমন দু একটি কুশলতার কথা বলিতে চাই যা হয়ত সাধারণের কাছে বিদিত নয়। আমি তাঁর আলাপ-কুশলতার কথা কিছু বলিব। আমি তাঁর মত সুনিপুণ কথা-কুশলী পুরুষ জীবনে দেখি নাই। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর কথোপকথন জগতে বিরল। তাঁর আলাপ তাঁর গানের চেয়ে কোনও অংশে কম চিত্তাকর্ষক নয়।

প্রথমে তাঁর আলাপ মাধুর্যের নজিরের দিকটার কথা বলি।

তিনি সুকণ্ঠ। তাঁর আলাপের কণ্ঠস্বরেই শ্রবণ তৃপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন তাঁর কণ্ঠস্বর একটু মেয়েলী, কেননা তা গুরু-গম্ভীর নয়। কিন্তু গুরু-গম্ভীর না হইলেও বড় শ্রুতিমধুর।

তাঁর শব্দোচ্চারণ অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট। তিনি যখন দ্রুত কিম্বা অনর্গল কথা কহেন তখনও প্রত্যেকটি কথা খুব স্পষ্ট শোনা যায় ও বোঝা যায়। তাঁর কথা কহিবার ভঙ্গীও বড় চমৎকার। ইংরাজিতে যাকে modulation বলে তাঁর কণ্ঠস্বরে ও উচ্চারণে তা যথেষ্ট থাকাতে তাঁর আলাপ বড় শোভন ও শ্রুতিমিষ্ট হয়।

কথা কহিতে কহিতে তাঁর মুখসৌষ্ঠব যেন আরও উজ্জ্বল ভাব ধারণ

করে, তাই নয়ন ও কর্ণ দুই একসংগে মুগ্ধ হয়। নয়ন ও কান দুই দিয়াই তাঁর কথা শুনিতে হয়। তাঁর আলাপ শ্রবণ মন ও হৃদয়েরও পরম সম্ভোগের বস্তু।

তাঁর কথোপকথনের ভাষা, উৎকৃষ্ট সাহিত্য। সে ভাষা সহজ ও সরল হইলেও খুব মার্জিত ও উপযোগী যেমন লিখিত সাহিত্যে তেমনি আলাপের ভাষায় এমন শোভন ও উপযোগী শব্দ ব্যবহার করেন, মনে হয় যেন পূর্বে কেহ বাংগলা ভাষায় এমন সুন্দর করিয়া মনোভাব প্রকাশ করেন নাই। কেহ কেহ মনে করেন তাঁর পূর্বেকার কবিতার তুলনায় তাঁর আজকালকার কবিতা বুঝিতে পারা তত সহজ নয়, তা যেন মনোজগতের বড় উচ্চস্তরের ভাষা, সাধারণের ততটা বোধগম্য নহে।

কিন্তু আলাপাদিতে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করিবার ভাষা ও ভংগী সরল ও সহজবোধ্য।

তিনি কখনও বাংগলা ভাষায় আলাপ করিবার সময় বিদেশী ভাষা ব্যবহার করেন না।

আমাদের "খামখেয়ালী" নামে একটি সভা ছিল। খেয়ালী সভার একটি নিয়ম ছিল—প্রত্যেক বিদেশী শব্দের জন্য এক আনা জরিমানা। শুধু রবিবাবু জরিমানা দেন নাই। সামান্য কথাবার্তাতেই চিন্তাশক্তি প্রকাশ পায় ও মৌলিকতারও পরিচয় দেয়।

সামান্য আলাপেও তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, চিন্তাশীলতা ও মনস্বীতার পরিচয় পাই। এমন কোনও বিষয় নাই যে সম্বন্ধে লোক তাঁর সংগে আলাপ করিয়া নূতন কিছু শিখিতে না পারে বা আনন্দ না পায়। আমি অনেক সময় অবাক হইয়াছি তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধির শক্তির বৈচিত্র্য দেখিয়া এবং সাধারণ আলাপেও তাঁর অদ্ভুত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা দেখিয়া। রাষ্ট্রনীতি, সমাজ-নীতি, শিক্ষানীতি, ধর্মনীতি এমন কি দৈনন্দিন জীবনের খণ্ড খণ্ড ঘটনা-সমূহেও তাঁর আলাপে তাঁর বুদ্ধিশক্তির বিচক্ষণতা ও মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর আলাপের এক প্রধান আকর্ষণ হাস্যরস। সে হাস্যরস নির্দোষ, সূক্ষ্ম ও মনোজ্ঞ। অথচ সামান্য কথাও এমন গুছাইয়া এবং রস-সংযোগ করিয়া বলেন যে তাতে যেমন আনন্দ পাওয়া যায় তেমনি তাঁর বচনকুশলতায় মুগ্ধ হইতে হয়।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এমন সর্বাংগসুন্দর, সর্বগুণসম্পন্ন, এমন প্রতিভাশালী মহাত্মার জন্ম আমাদের বাঙালী জাতির মধ্যে হইয়াছে। আজ তাঁর গরবে আমরা গরবী। তিনি বিশ্বসাহিত্যে বাংগলা ভাষাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। আজ তাঁরই জয়ন্তী-উৎসবে আমরা আনন্দ প্রকাশ করি এবং তাঁকে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানাই। তিনি এখন সত্তর বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন; বিশ্বনিয়ন্তা তাঁকে আরও দীর্ঘায়ু করুন। দীর্ঘকাল বাঁচিয়া রবীন্দ্রনাথ বাংগালীর, ভারতবাসীর, বিশ্বমানবের গৌরব-বর্দ্ধন করুন।[১]

নিম্নলিখিত স্বরচিত গানটি গাহিয়া সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা শেষ করেন :—

"জয়তু জয়তু জয়তু কবি,
জয়তু পুবর-উজল রবি।
জয় জগত-বিজয়ী কবি, জয় ভারত গৌরব রবি
বংগমাতার বংগে দুলাল 'রবি'
জয় হে কবি।"………

দিল্লীর রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে অতুলপ্রসাদের ভাষণ :—

রবীন্দ্রনাথের জীবনের আলোচনা এবং তাঁর কাব্যের সমালোচনা হয়ত অনেকেই করিবেন। আমি তাহা করিব না। তাঁর সম্বন্ধে আমার নিজের কয়েকটি স্মৃতির কথা বলিব।

অল্প বয়সে যখন স্কুলে পড়িতাম তখন তরুণ বন্ধুদের মধ্যে তর্ক হইত বাংগালার কবিদের মধ্যে কে বড়। রবীন্দ্রনাথ তখন তরুণ কবি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠত্ব তখন সর্ববাদীসম্মত ছিল। ঝগড়া হইত হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে লইয়া। হেমচন্দ্রের শিঙা তখনও খুব সজোরে বাজিতেছে; পলাশী যুদ্ধের কামান কর্ণকুহর কম্পিত করিতেছে; রবীন্দ্রনাথ তখন বেণু বাজাইতেছেন। সে বেণু একটু আদিরসাত্মক, গুরুগম্ভীর নয়, সেজন্য প্রবীণদের মনঃপূত হইতেছিল না। তাই তরুণরাও অনেকে না বুঝিয়া সে মতে সায় দিত। আমি তখন অজাতশ্মশ্রু, আমাদের দল ছোট তবু আমি রবীন্দ্রনাথের পক্ষ লইয়া অভিমন্যুর মত তাদের সংগে লড়িতাম। তারা বলিত

১—৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১ সালে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উপলক্ষে সভাপতি অতুলপ্রসাদ সেনের ভাষণ। "উত্তরা" তৃতীয় সংখ্যা ষষ্ঠ বর্ষ—কার্তিক, ১৩৩৮।

রবিবাবুর কবিতার ভাষা নিতান্ত সহজ কোমল ও মেয়েলী—সংস্কৃত শব্দের পাণ্ডিত্য নেই; জোর নেই ইত্যাদি। উত্তরে আমি নানাপ্রকার পশুপক্ষীদের রবের উপমা দিয়া তাদের মতের সমীচীনতার প্রতিবাদ করিতাম। তখন কোন দলের জয় পরাজয় হইয়াছিল ঠিক স্মরণ নাই, আমি কিন্তু মনে করিতাম আমাদেরই জয়; বিপক্ষ তা স্বীকার করিত না। তারা তখন 'ভারত-ভিক্ষার' দোহাই দিত। আমি গান ধরিয়া দিতাম—'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, জগতজনের শ্রবণ জুড়াক। হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্—মুখ তুলে আজি চাহরে।'

আজ বহু বৎসর পরে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বাল্যবন্ধুদের মধ্যে যাঁরা জীবিত আছেন তাঁরাও স্বীকার করিবেন যে আমার রাজারই জিত। এখনও হেম ও নবীনচন্দ্রের কোনও কোনও কবিতা আমার বেশ ভাল লাগে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ? —অতুলনীয়! আজ একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে রবীন্দ্রনাথ বাংলার শ্রেষ্ঠতম কবি।

রবীন্দ্রনাথের সংগে আমার প্রথম পরিচয় হয়, যখন আমি ১৮৯৫ সালে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসি। তখন আমার বয়ঃক্রম প্রায় ২১।২২। শ্রীমতী সরলা-দেবী আমাকে লইয়া গিয়া তাঁর সংগে আলাপ করাইয়া দেন। প্রথম দর্শনেই প্রেম।

ইতিপূর্বে তাঁকে ছবিতে দেখিয়াছিলাম এবং তাঁর কবিতার অনুরাগী ছিলাম। নয়নের সম্মুখে যখন তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর স্নিগ্ধ কান্তি দেখিলাম, মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ছেলেবয়সেই গোপনে একটু আধটু কবিতা লিখিতাম, দু একটি গানও রচনা করিয়াছিলাম। নিতান্ত অন্তরংগ বন্ধু বা আত্মীয় ছাড়া আর কাহাকেও তাহা শোনাই নাই তাও আমার কবিতার খাতা ধরা পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া। আমার মনে আছে কোন এক চায়ের নিমন্ত্রণে কবি উপস্থিত ছিলেন, আমিও একজন নিমন্ত্রিত। সেখানে তাঁর গান হয়। মনে আছে বড় ভাল লাগিয়াছিল তাঁর গান। সেই সময় আমার একজন দুষ্ট বন্ধু তাঁকে বলিয়াছিল—'দেখুন, অতুল গান করে আর কিছু কিছু গান রচনা করে।' আমার তো তখন লজ্জায় ও সংকোচে পৃথিবী দ্বিধা হও ভাব! আমি প্রতিবাদ করিলাম, কবি শুনিলেন না, বলিলেন—'সে তো খুব ভাল কথা, আপনি নিজের রচিত একটি গান করুন।' তখন ছিলাম 'আপনি' ও 'অতুলবাবু' এখন সৌভাগ্যক্রমে হয়েছি 'তুমি' ও 'অতুল'। আমি এড়াইবার অনেক চেষ্টা

করিলাম, পারিলাম না। বুঝিতেই পারেন, তখন আমার শরীরের ও মনের কি দুরবস্থা। ভারতের শ্রেষ্ঠতম গীতিকবি ও একজন সুগায়কের নিকট আমাকে নিজরচিত গান গাহিতে হইবে। তিনি বুঝিলেন আমি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি, তিনি আমায় খুব আশ্বাস দিয়া গাহিতে বলিলেন। আমি কম্পান্বিত কলেবরে ও কম্পিত কণ্ঠে গাহিলাম। আমার অবস্থা সকলেই লক্ষ্য করিল। শিষ্টতার প্রতিমূর্তি রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিলেন তাহাতে আমি অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম, যদিও আমার মুখের উষ্ণ ও রক্তিম ভাব কাটিতে-বেশ সময় লাগিয়াছিল। যাহা হউক, তিনি যাহা বলিলেন তাহাতে আশ্বস্ত হইলাম তো বটেই উৎসাহিতও হইলাম। সে সহৃদয় উৎসাহটুকু আমার গান রচনার জীবনীশক্তি।

আনন্দ ও উৎসবের মধ্য দিয়া সাহিত্য ও সংগীতের প্রচার রবীন্দ্রনাথের এক বিশেষ কৃতিত্ব। তিনি সাহিত্য কবিতা ও গানকে আনন্দের বিকাশ বলিয়া মনে করেন। তাঁহার অনেক রচনাতে ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তাঁহার এই বৈশিষ্ট্যের একটি দৃষ্টান্ত দিই।

১৮৯৬ সালে তাঁহার নেতৃত্বে "খামখেয়ালী" সভানামে একটি সাহিত্য ও সংগীতমণ্ডলী স্থাপিত হয়। আমি এ সভার সর্বকনিষ্ঠ সভ্য ছিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মহারাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকেন পালিত প্রমুখ অনেক সাহিত্যিক ও সুরসিক "খামখেয়ালী"র সদস্য ছিলেন। এ সভার কার্যপ্রণালী ছিল একটু খামখেয়ালী, নিয়মের কোন বাঁধাবাঁধি ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল—হাস্যরসের উদ্দীপনা করা, সাহিত্যকে আনন্দে সরস করা, নানাবিধ সংগীতের দ্বারা সভ্যদের চিত্ত আকৃষ্ট করা এবং সভান্তে জঠরের সম্যক তুষ্টিসাধন করা। এ "খামখেয়ালী"র মজলিসকে মশগুল রাখতেন পরম হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনি আমাদিগকে হাসির বন্যায় ভাসাইতেন তাঁহার হাসির গান গাহিয়া। আমরা সকলে তাঁর হাসির গানের কোরাসে যোগ দিতাম, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কোরাসের নেতা। সকলের মুখে হাসি, কণ্ঠে গান, হাসির উচ্চরোলে সভাস্থল কম্পান্বিত হইত। D. L. রায় গাইতেন—'হতে পাত্তেম আমি একজন মস্ত বড় বীর'। আর রবীন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া কোরাস ধরিতেন—'তা বটেই তো তা বটেই তো'। দ্বিজেন্দ্র গাহিতেন—'নন্দলাল একদা করিল ভীষণ পণ'। রবীন্দ্র গাহিলেন—'বাহারে নন্দ বাহারে নন্দলাল'। দ্বিজেন্দ্র আমাদের নাচাইতেন হাসির উদ্বেল তরঙ্গে, রবীন্দ্র আমাদের মুগ্ধ করিতেন তাঁর

অনুপম সূক্ষ্ম হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়া। খামখেয়ালীর আসরে বিখ্যাত গায়ক রাধিকা গোস্বামী তাঁর উচ্চাঙ্গের তান লয় মণ্ডিত গান গাহিয়া আমাদের মনোরঞ্জন করিতেন। রবীন্দ্রনাথের সংগীতপ্রতিভা এমন সর্বমুখী যে গোস্বামী মশায়ের উপাদেয় সুরে তিনি গান বাঁধিতেন এবং কবির সে নব রচিত গানগুলি রাধিকা খামখেয়ালীর আসরে গাহিয়া শুনাইতেন। তন্মধ্যে একটি গান মনে আছে—'মহারাজ একি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে, চরণতলে কোটি শশী চন্দ্রমার লাজে'। খামখেয়ালীর মজলিসে রবীন্দ্র ছিলেন অধিকারী। আমরা ছিলাম তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ। সেই আসরে কবি কত যে নূতন ও অনুপম স্বরচিত গান গাহিয়া আমাদের মনোরঞ্জন করিতেন তাহা জনমে ভুলিতে পারিব না। সেই সময়কার বিখ্যাত গানের কয়েকটি মনে আছে—'মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী, সখি জাগো জাগো।' 'বধু হে ফিরে এসো ; মম সজল জলদ স্নিগ্ধ কান্ত অন্তরে ফিরে এসো'। 'জাগি—পোহাল বিভাবরী' ইত্যাদি গান ছাড়াও খাম-খেয়ালীর মজলিসের জন্য বিবিধ অপরূপ কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদের শুনাইতেন, আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহা শুনিতাম। তাঁর আবৃত্তি করিবার ক্ষমতা অসাধারণ। সে আসরে নাটোরের মহারাজা বাঁয়া তবলা বাজাইতেন। এ বাদ্যে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্র তাঁহাকে 'রাজন' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এস্রাজ বাজাইতেন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ। রচনা পাঠ করিতেন আরো অনেক সাহিত্যিক। তন্মধ্যে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আমাদিগকে সর্বাপেক্ষা চমৎকৃত করিত। বলেন্দ্র অল্প বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করেন কিন্তু সে বয়সেই তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে অনেকেই মনে করেন যে ঠাকুর পরিবারে তিনি সাহিত্য-সম্বন্ধে একমাত্র রবীন্দ্রের উত্তরাধিকারী।

খামখেয়ালীর অধিবেশন এক একজন সদস্যের বাড়িতে হইত। তিনি সকলকেই নিমন্ত্রণ করিতেন এবং ভোজের সুব্যবস্থা করিতেন। সে ব্যবস্থাতেও কলাশিল্পীর আবির্ভাব দেখিতাম। একটি দিনের কথা আমার শুধু মনে আছে। সেবারে বলেন্দ্রর পালা, কবিবরের কবিতা ও অন্যান্যের রচনা পাঠ, সংগীত, হাসির গান ইত্যাদি খামখেয়ালীর উৎসবানন্দ সম্ভোগের পর স্বল্পভাষী ও বিনয়ী বলেন্দ্র আমাদিগকে আহারের জন্য অন্য একটি ঘরে লইয়া গেলেন। সে ঘরটি এমনভাবে পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত ছিল যে মনে হইতেছিল যে নন্দনের ফুলকুঞ্জে প্রবেশ করিলাম। মাঝখানে দেখিলাম একটি জলাশয়, তার মাঝে

মাঝে দু একটি বনস্পতি ; জলে রাজহংস, জলপদ্ম, সরসীর তটের চারিপাশে নব দূর্বাদল সকলই প্রকৃতির অনুকারী। কিন্তু হংস তরুলতা দূর্বাদল সকলই কৃত্রিম! সেই কাচনির্মিত সরোবরের চারিপাশে নিমন্ত্রিতের বসিবার স্থান, প্রত্যেকটি আসনের সম্মুখে নানাপ্রকার খাদ্যসম্ভার, তাহাতেও বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাস। আমরা যেই খাইতে বসিলাম অমনি কোন এক প্রচ্ছন্ন স্থান হইতে মৃদুমধুর সানাই বাজিতে লাগিল। আমাদিগের উচ্চ হাসির ও আহার্য গ্রহণের পূর্বকালীন মুখব্যদন সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া আমাদের হাসির মাত্রা আরো বাড়াইতে লাগিল। আর বাক্যশিল্পী, আলাপ কুশলী, হাস্যরসিক রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্র, জগদীশ্চন্দ্র, অর্ধেন্দু মুস্তফী আমাদিগকে তখন এমন হাসাইতে লাগিলেন যে, সে আলোড়নে সুখ-খাদ্য কোথায় যে তলাইয়া যাইতে লাগিল বুঝিতে পারিতেছিলাম না। এরূপ আনন্দের বিচিত্র সমাবেশ আমি সম্ভোগ করি নাই। এই প্রণালীতে আমাদের সাহিত্যামোদের ক্ষুধা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মনে আছে যে দিন আমার বাড়িতে খামখেয়ালীর অধিবেশন হয় সেদিন কবি বাড়ি গেলেন রাত্রি বারোটার পরে, মহারাজা নাটোর গেলেন ১।২ টার সময়, আর দ্বিজেন্দ্র ও আমরা সারারাত কীর্তন ও তাঁহার হাসির গান শুনিয়া কাটাইলাম। তার পরদিন প্রাতে হাস্যরাজকে আমি বাড়ি পৌঁছাইয়া আসি। মনে আছে তাঁর স্ত্রী বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁর শিশু পুত্র মণ্টু (দিলীপকুমার রায়) বাবার কোল ধরিয়া ভাঙা ভাঙা সুরে ওগ ওগ করিতে লাগিল ; দ্বিজেন্দ্র বলিলেন—'বেটা বোধ হয় গাইতে পারবে না। এই রস ও উৎসবের স্রষ্টা ও অধিনায়ক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র।

রবীন্দ্র বিশ্বপ্রেমিক হইলেও তাঁর স্বদেশীয়তা ও দেশভক্তি সর্বজনবিদিত। বিশ্বের ভাষার ভাণ্ডারে তাঁর রচিত জাতীয় সঙ্গীতের তুলনা আর নাই। আগ্রা-বাসী বাঙালী কবি গোবিন্দ চন্দ্র রায় দুইটি জাতীয় সংগীত রচনা করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন—"কত কাল পরে বল ভারত রে দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে"··· "পর দীপ মালা নগরে নগরে তুমি যে তিমিরে তুমি যে তিমিরে" এবং 'নির্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও'। আমার মনে হয় রবীন্দ্র যদি তাঁর কয়েকটি স্বদেশী সংগীত লিখিয়া কবিতা লিখিতে বিরত হইতেন তাহা হইলেও তিনি গীত রচনায় ভারতের শ্রেষ্ঠতম কবি বলিয়া গণ্য হইতেন। তাঁহার একটি স্বদেশী সংগীতের ইতিহাস বলি। প্রায় তিরিশ বৎসর পূর্বে কলিকাতায় একবার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে

বহু সংখ্যক গণ্যমান্য প্রতিনিধিরা আসিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রবাসীরা বাংগালা জানেন না, অন্তত প্রাঞ্জল প্রচলিত বাংগালা বোঝেন না অথচ অনেকেই সংস্কৃত জানেন, তাই সংস্কৃতবহুল একটি অপূর্ব ভারত-সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে আমাদের অনেককে সেই গান শিখাইয়াছিলেন। মনে আছে বহুকণ্ঠে ও বহু বাদ্যযন্ত্রের সংগে আমরা সেই গানটি গাহিয়াছিলাম। আমাদের সকলকেই পুরুষ ও মহিলা—শুভ্রবসন পরিধান করিতে হইয়াছিল। রবীন্দ্র নিজে আমাদের নেতা।

গাহিয়াছিলেন—"অয়ি ভুবন-মন মোহিনী......"

রবীন্দ্রর স্বদেশ-সংগীত উল্লেখ করিতে গিয়া মনে হইতেছে বংগ-বিভক্তি ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁহার জাতীয় সংগীতের প্রভাব। সে সময়কার গানগুলি বংগ ভাষায় ও বাঙালীর প্রাণে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমার বোধ হয় সে সময় বংগদেশে যে দেশপ্রীতির স্রোত বহিয়াছিল তাহার উৎস রবীন্দ্রের গান। বাংলার ঘরে ঘরে শুনা যাইত—'আমার সোনার বাংলা'। পথে পথে শুনা যাইত—'বাংলার মাটি বাংলার জল...'। আর একটি চিত্র আমার মনে পড়িতেছে। আমি সে সময় কলিকাতায় গিয়াছিলাম। গংগার ধারে গিয়া দেখিলাম দেশপ্রেমিকরা গান গাহিতে গাহিতে গংগাস্নান করিতে যাইতেছেন—বংগ বিচ্ছেদের অভিশাপ ক্ষালন করিবার জন্য; শোভাযাত্রার সর্ব প্রথমে একটি অল্প বয়স্ক বালক একটি স্থূলকায় ভদ্রলোকের স্কন্ধে চড়িয়া হাত তুলিয়া সুললিত কণ্ঠে গাহিতেছে—'বাংলার মাটি...'। আর সকলে সহস্র কণ্ঠে সে গানের পুনরাবৃত্তি করিতেছে। সে বালকটি মহারাজ জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়ের শিশুপুত্র—অধুনা মহারাজ। সে দৃশ্য এত হৃদয়স্পর্শী যে আমার চোখে জল আসিল। রবীন্দ্রও নতশিরে সে স্নানযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন। যুবকরা তখন স্ফীতবক্ষে গাহিত—'যদি তোর ডাক শুনে...'। ভারতকে উদ্দেশ্য করিয়া কবি যে অপূর্ব দেশ সংগীত রচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ গান—

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে।...
কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ,
এমন হাসি হেসে।

জগতের গীতি সাহিত্যে এমন হৃদয়স্পর্শী গান আর আছে কিনা জানি না। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি বাংলার প্রাণকে যেমন করিয়া আন্দোলিত করিয়াছিল, বিপুল জনসভায় ওজস্বী বক্তারা তেমন করিতে পারেন নাই। এমন কি বিপ্লববাদীরাও তাঁহার গান গাহিয়া আত্মোৎসর্গের পথে অগ্রসর হইত। তাঁহার জাতীয় সংগীতে প্রতিহিংসা বা সংকীর্ণতার লেশমাত্র নাই। অথচ তাঁহার গানে লোকের মনে আসিত দেশপ্রেম, সাহস ও শক্তি। তাঁহার স্বদেশগীতির মন্ত্রশক্তি অবর্ণনীয়।

তাঁহার গীতিসম্ভারের একটি পরম সম্পদ তাঁর বর্ষার গান। চিরদিনই বর্ষা ঋতু ভারতের কাব্য সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কালিদাসের মেঘদূতের 'আষাঢস্য প্রথম দিবসে' হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতির 'এভরা বাদর মাহ ভাদর' ইহার প্রমাণ দিয়াছে। তৎপরে রবীন্দ্রর বর্ষা কবিতা ও বর্ষা সংগীত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম উপাদান যোগাইয়াছে। আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি, কোন কালে বা কোন দেশে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ বর্ষা কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁর তরুণ বয়সের 'রিম্ ঝিম ঘন ঘন রে' এবং পরিপক বয়সে 'ওই আসিছে বরষা······নিখিল চিত্ত ভরসা' ইত্যাদি অপূর্ব বরষা সংগীত বাংলা ভাষার পরম সম্পদ। আমার মনে আছে বহুকাল পূর্বে রবীন্দ্রর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বর্ষাকালে যাতায়াত করিতাম। তিনি আমাকে সে সময় দ্বিপ্রহরের পরে আসিতে বলিতেন। এবং সেখানেই চা-পান করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ি ফিরিতাম। জোড়াসাঁকোতে একটি ছোট ঘর ছিল। সেখান হইতে মেঘ ও বর্ষা দেখা যাইত, প্রায়ই আমরা তিনজন সেখানে বসিতাম। রবীন্দ্র তাঁর বর্ষার কবিতা আবৃত্তি করিতেন এবং বর্ষার গান গাহিতেন আর লোকেন্দ্র পালিত (তাঁহার অন্তরংগ বন্ধু) ইংরাজী, ফরাসী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় সেই কবিতাগুলির সমভাবাপন্ন কবিতা আবৃত্তি করিতেন এবং বুঝাইয়া দিতেন। আমি মুগ্ধের ন্যায় তন্ময় হইয়া শুনিতাম। লোকেন্দ্র বলিতেন—জগতের কোন ভাষায় রবীন্দ্রর বর্ষার কবিতা ও বর্ষা সংগীতের তুলনা নেই।

আর একটি ঘটনা বলি। প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্র একবার কুমায়ুন প্রদেশে রামগড় পর্বতের উচ্চদেশে একটি বাড়ি ক্রয় করিয়া কয়েকমাস সেখানে থাকেন। আমাকে তিনি কয়েকদিন তাঁর সংগে রামগড়ে থাকিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি লক্ষ্ণৌ হইতে রামগড়ে ছুটিলাম। একদিন বৈকালে বেগে বর্ষা নামিল এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টি হইল। সেদিন আমাদের

বর্ষার আসর বসিল। বৈকাল হইতে আরম্ভ রাত্রি প্রায় ১০টা পর্যন্ত কবি একাধারে বর্ষার কবিতা পাঠ করিলেন আর বর্ষার গান গাহিলেন। সে দিনটি আমি কখনও ভুলিব না। রাত্রি ৮টার সময় খাবার প্রস্তুত। কবির কন্যা ও পুত্রবধূ দ্বারে দাঁড়াইয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। কবির কিম্বা আমাদের কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। বর্ষাগীতির মাদকতা আমাদের বাহ্যজ্ঞান-রহিত করিয়াছে, ক্ষুৎপিপাসা তিরোহিত হইয়াছে, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কবির বর্ষার গান ও কবিতা শুনিতেছি, অফুরন্ত তাঁর বর্ষার ভাণ্ডার। আকাশ অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ করিতেছে আর কবি অবিশ্রান্ত সুধা বর্ষণ করিতেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে হইতেছে। সে আসরে একবার রবীন্দ্র আমাকে আদেশ করিলেন—'অতুল তোমাদের দেশের একটা হিন্দী গান গাও হে।' আমি গাহিলাম—'মহারাজা, কেওরিয়া খোল, রসকি বুঁদ পড়ে।' সময়োপযোগী বলিয়া সকলের সে গানটি ভাল লাগিল। কবি সে গানটি আমার সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন। আমাদের সকলেরই বর্ষার মোহ আচ্ছন্ন করিয়াছে। এমন কি সংগীতে অজ্ঞ Rev. Andrews সাহেবকেও এই গানের ছোঁয়াচ ধরিল, তিনি আমার সঙ্গে অদ্ভুত উচ্চারণ করিয়া বেসুরো কন্ঠে গাহিতে লাগিলেন—'মহারাজ কেওডিয়া খোল……'

সেবার রামগড়ে কবির গান রচনার একটি স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিলাম। তিনি যে ঘরে শুইতেন, আমার শয্যা সেই ঘরেই ছিল। আমি লক্ষ্য করিতাম, তিনি প্রত্যহ ভোর না হইতেই, জাগিতেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই তিনি বাটীর বাহির হইয়া যাইতেন। একদিন আমার কৌতূহল হইল। আমিও তাঁহার অলক্ষিতে তাঁহার পিছু পিছু গেলাম। আমি একটি বৃহৎ প্রস্তরের অন্তরালে নিজেকে লুকাইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তিনি একটি সমতল শিলার উপর উপবেশন করিলেন। যেখানে বসিলেন তার দুদিকে প্রস্ফুটিত সুন্দর শৈল কুসুম। তাঁর সম্মুখে অনন্ত আকাশ এবং হিমালয়ের তুঙ্গ গিরিশ্রেণী। তুষার-মালা বাল-রবি-কিরণে লোহিতাভ। কবি আকাশ ও হিমগিরির পানে অনিমেষ তাকাইয়া আছেন। তাঁর প্রশান্ত ও সুন্দর মুখমণ্ডল উষার মৃদু আভায় শান্তোজ্জ্বল। তিনি গুন গুন করিয়া তন্ময়চিত্তে গান রচনা করিতেছেন—'এই লভিনু সংগ তোমার……'। আমি সে স্বর্গীয় দৃশ্য মুগ্ধ নয়নে দেখিতে লাগিলাম এবং তাঁর সেই অনুপম গানটির সদ্য রচনা ও সুরবিন্যাস শুনিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ তাহা দেখিলাম ও শুনিলাম এবং তিনি নামিয়া

আসিবার পূর্বেই পলাইয়া আসিলাম। একদিন প্রাতে শুনিলাম তিনি তেমনি করিয়া গান রচনা করিতেছেন—"ফুল ফুটেছে মোর আসনের ডাইনে বাঁয়ে…"

এরকম করিয়া প্রায় প্রতি প্রাতে লুকাইয়া তাঁর গান রচনা শুনিতাম আর বাণীর বরপুত্রের সেই দেবমূর্তি হিমালয়ের কোলে উপবিষ্ট দেখিতাম। একদিন ধরা পড়িয়া গেলাম। পলাইয়া আসিবার সময় তিনি আমাকে দেখিয়া ফেলিলেন। সুচতুর কবি বুঝিলেন যে গোপনে আমি তাঁর গান শুনিতেছিলাম। তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'অতুল, এখানে এত ভোরে যে? কোথায় ছুটে যাচ্ছ?' আমি দেখিলাম ধরা পড়িয়াছি আর উপায় নাই। বলিলাম, 'লুকিয়ে আপনার গান শুনছিলুম'! তার দু তিন দিন পরে তিনি যখন আমাদের শুনাইলেন—'এই লভিনু সঙ্গ তোমার……'। আমি বলিলাম —'ওই গানটি আমি পূর্বেও শুনেছি।' তিনি বলিলেন—'পূর্বে কি করে শুনলে? আমি তো মাত্র দু তিন দিন হল ওই গানটি রচনা করেছি।'—'রচনা করবার সময়েই শুনেছিলাম।' 'তুমি তো ভারি দুষ্টু, এই রকম করে রোজ শুনতে বুঝি?' আমরা সকলেই খুব হাসিলাম।

রবীন্দ্রের হৃদয়ের আবেগ অন্তঃসলিলা। বাহিরে সচরাচর প্রকাশ হয় না। সে কয়দিন রামগড়ে তাঁহার অন্তর্নিহিত আবেগের বহিঃপ্রকাশ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। তাঁর শিশুর মত হাসি, দ্রুতগতি ও আনন্দোচ্ছ্বাস বড়ই মনোরম বোধ হইতেছিল। একদিন বৈকালে বাহিরে বসিয়া আমরা চা খাইতে ব্যস্ত ছিলাম। কবি হঠাৎ পিছন হইতে আসিয়া 'অতুল এসো' বলে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন।…তাঁহার বালকের মত উৎসাহ আমার বড় মধুর লাগিল। আমি আগ্রহে সঙ্গে চলিলাম। তিনি অনতিদূরে লইয়া গিয়া পরম রমণীয় পত্র-পুষ্প শোভিত একটি সুন্দর নির্জন স্থান আমাকে দেখাইলেন।— 'আমি রোজ এখানে আসি, এখানে বসি, গান গাই এবং গান রচনা করি'। আমি অনুরোধ করিবামাত্র কয়েকটি গান সেখানে বসিয়া আমাকে শুনাইলেন। কি যে ভাল লাগিয়াছিল বলিতে পারি না। ফিরিয়া আসিলে কবিকন্যা বলিলেন—'বাবা, তোমার যে কাণ্ড, অতুলবাবুকে না খাইয়ে কোথায় এতক্ষণ ধরে রেখেছিলে?—'অতুলকে জিজ্ঞাসা কর।' আমি বলিলাম—'আমি সেখানে খুব ভাল ভাল জিনিস খেয়ে এসেছি।' কথাটা প্রকাশ হওয়ায় সকলে খুব হাসিলেন।

কবির অন্তরে একটি নৃত্যশীল শিশু আছে সে ভিতরেই নৃত্য করে। তাঁহার গীতিকবিতা বোধ হয় সেই নৃত্যেরই বিকাশ। জননী প্রকৃতি বোধ হয় সেই গীতনৃত্যশীল শিশুকে সস্নেহে ডাকিয়াছেন। তাই সে বাহির হইয়া আমাদিগকে শৈলমন্দিরের অংগনে দেখা দিল।

রামগড়ের সে দশ দিনের অবিরাম আনন্দ ও গীতোৎসব কখনও ভুলিব না। আমাদের জয়ন্তী উৎসব তেমনি আনন্দে সরস ও সার্থক হোক। তাঁহার ভক্ত-বৃন্দ আমরা তাঁর আরও দীর্ঘায়ু কামনা করি। অমর কবি বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতিকে অমর করিয়াছেন। তিনি জগতের কাব্য সাহিত্যকেও অমর করিয়াছেন। সেই অমর কবিকে আমরা আজ ভক্তির ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হই।[১]

॥ তেষট্টি ॥

চিকিৎসার জন্য অতুলপ্রসাদ কলকাতায় গেলেন। এবার কলকাতায় থাকাকালীন অতুলপ্রসাদ তাঁর প্রথম গানের বই "কয়েকটি গান"-এ আরো কিছু গান সংযোজিত করে "গীতিগুঞ্জ" নামে প্রকাশ করান। গীতিগুঞ্জের প্রথম সংস্করণে অতুলপ্রসাদ তাঁর বক্তব্যে লেখেন :

"কয়েকটি গান" প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। তারপরেও কতকগুলি গান রচিত হয়েছে, সব এক সংগে 'গীতিগুঞ্জে' ছাপান হইল।

আমার যে গানগুলির স্বরলিপি 'কাকলি' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, 'গীতিগুঞ্জে' তার নির্দেশ রহিল।

স্নেহাস্পদ শ্রীমান হরিহর চন্দ্রের সহায়তায় 'গীতিগুঞ্জ' প্রকাশিত হইল, তজ্জন্য আমি তাহার নিকট ঋণী।

২৪শে অক্টোবর — শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

১৯৩১

কলকাতায় চিকিৎসা করিয়ে কিছু সুস্থ হয়ে আবার নিজের কর্মক্ষেত্রে

১—'আমার কয়েকটি রবীন্দ্রস্মৃতি'—দিল্লী রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে সভাপতির ভাষণ—"উত্তরা" ষষ্ঠ বর্ষ, মাঘ ১৩৩৮ (১৯৩১)।

ফিরে এসে কাজ নিয়ে মেতে উঠেছিলেন ; কাজ না করলে তাঁর চলে না। কিন্তু পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক কষ্টও শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এমনি সময়ে তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ করে এবং শিবুর বিবাহের সংবাদ দিয়ে দাদা চিঠি দিলেন। উত্তরে তিনি লিখলেন :

Charbagh
Lucknow
9. 10. 31

দাদা,

আজ বিকেলে তোমার চিঠি পেলাম। প্রায় পাঁচ-ছয় মাস যাবৎ আমি বারে বারে গাউট-এ ভুগছি। আর ইদানীং ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি, কাশিটাও আছে তবে পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল আছি। মোট কথা প্রায় ছয় মাস ধরে ভুগছি, এর ওপর কাজ করতে হচ্ছে, অনেকগুলি প্রাণীর জীবিকা আমার ওপর নির্ভর করে কিনা।

শিবুর বিবাহ ২৫শে নভেম্বর হবে শুনে বড় সুখী হলাম। শরীর নিতান্ত অসুস্থ না থাকলে নিশ্চয়ই যাব। শিবুকে আমার আশীর্বাদ পাঠিও। তুমি ছোট ভাইয়ের ভালবাসা নাও। আশা করি সকলে ভাল আছে।

তোমার স্নেহের ভাই
অতুল

বাংলা ১৩৩৯ সাল। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সত্তর বছর অতিক্রম করলেন। ভাবলেন বোধ হয় যে এবার তো তাঁর জীবনে সাহিত্য সৃষ্টি অস্তগামী। সেজন্য সম্প্রতিকালে লিখিত কবিতাগুলি একত্র করে "পরিশোধ" নাম দিয়ে তা প্রকাশ করলেন। তারপর সে কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করলেন তাঁর পরম স্নেহের পাত্র অতুলপ্রসাদকে। উৎসর্গ পত্রে লিখলেন :—

শ্রীমান অতুলপ্রসাদের

করকমলে—

বঙ্গের দিগন্ত হতে বাণীর বাদল
বহে যায় শত স্রোতে রস-বন্যা-বেগে ;
কভু বজ্রবহ্নি কভু স্নিগ্ধ অশ্রুজল
ধ্বনিছে সঙ্গীত ছন্দে তারি পুঞ্জ মেঘে

বঙ্কিম শশাঙ্ক কলা তারি মেঘ-জটা
চুম্বিয়া মঙ্গল মন্দ্র রচে স্তরে স্তরে—
সুন্দরের ইন্দ্রজাল; কত রশ্মিচ্ছটা
প্রত্যূষে দিনের অন্তে রাখে তারি পরে।
আলোকের স্পর্শমণি! আমি পূর্ব্বায়ে
বঙ্গের অম্বর হতে দিকে দিগন্তরে
সহস্র বর্ষণধারা গিয়াছে ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দ বেগে পশ্চিম উত্তরে;
দিল বঙ্গ বীণাপাণি অতুলপ্রসাদ
তব জাগরণী গানে নিত্য আশীর্ব্বাদ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবির কাছ থেকে এই কাব্য গ্রন্থটি উপহার পেয়ে কবিভক্ত অতুলপ্রসাদের যে আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল না তা সহজেই অনুমান করা যায়।

অতুলপ্রসাদকে কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও তাঁর "ত্র্যহস্পর্শ" গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থের 'উৎসর্গ' পত্রে লেখা আছে:—

উৎসর্গ

সুহৃদ্বর শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন মহোদয় করকমলেষু

ওহে—

তুমি তো একজন কবি ও বুদ্ধিমান্ লোক। এই বইখানি পড়িও। প্রহসনখানিকে উদ্দেশ্যহীন বিবেচনা করাই শ্রেয়ঃ। কারণ তাহাতে গ্রন্থকারের বিশেষ গৌরবের হেতু না থাকিলেও সাধারণের পক্ষে যেটুকু আমোদ সেইটুকুই neett লাভ। তবে যদি তুমি ইহার মধ্যে কোন গূঢ় ও গুরু উদ্দেশ্য দেখ, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় As you like it এর Duke-এর ন্যায় একজন মহাত্মা ব্যক্তি, যিনি

Found tongue in trees,
books in the running brooks,
Sermons in stones and good
in every thing."

তোমার সুহৃদ
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

॥ চৌষট্টি ॥

অতুলপ্রসাদের শরীর বেশ অসুস্থ কিন্তু কর্মে বা কর্তব্যে তাঁর অবহেলা নেই।

১৯৩২-এর জানুয়ারী মাসে অতুলপ্রসাদ ভাগ্নী রমলার বিবাহ বেশ ঘটা করেই দিলেন। ভাগ্নেকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতে পাঠিয়েছেন। ভাগ্নীর বিয়ের খবর দিয়ে দাদাকে চিঠি দিলেন—

Charbagh
Lucknow

দাদা, ২৫. ১. ৩২

আজ ভাগিনেয়ী রমলার বিবাহ। তোমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ চাই। ভেবেছিলাম খুব সংক্ষেপে কাজটা সারব, তা হল না। রমলা তোমার প্রেরিত টাকা পেয়ে খুব খুশি হয়েছে।

তোমরা আমার ভালবাসা নিও। আমি আজ একটু ভাল আছি। কিরণ, সুবালা, টেড, বাবলি ও তার স্বামী প্রফুল্ল এসেছে। পরে জানাব বিবাহ অনুষ্ঠান।

আশা করি ভাল আছ।

তোমার ভাই অতুল

বিয়ে উপলক্ষে হিরণ-কিরণ তো এলেনই, আরো এলেন সুবালামাসী ও অন্যান্য মাসতুতো ভাই বোনেরা, ভ্রাতৃজায়ারাও এলেন। অতুলপ্রসাদের সদানন্দভবনে গানে, গল্পে, আনন্দে কলরোল হতে লাগল।

অতুলপ্রসাদ তাঁদের সংগে হৈ হৈ করছেন, প্রাণ খোলা হাসি হাসছেন কিন্তু শরীর তাঁর রোগে রোগে ক্রমশই ভেঙে পড়ছে। রোগ, পারিবারিক অশান্তি ও কর্মক্ষেত্রে সংঘর্ষে ভেতরে ভেতরে তিনি ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। চীফ্ জাস্টিসের কাছে ডেপুটেশন নিয়ে যাবার পর থেকে তাঁর কর্মজীবনে (আর্থিক ক্ষেত্রে নয়) বেশ অশান্তি দেখা দিয়েছে। এই সব কারণে তিনি চাইছিলেন অন্য কোন ক্ষেত্রে শান্ত পরিবেশে যদি কিছু করা যায়, শান্তি পাওয়া যায়।

দিল্লীতে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে ভাষণ দেবার পর ১৯৩২-এ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে অতুলপ্রসাদ দুটি চিঠি লেখেন :—

Charbagh
Lucknow
12. 2. 32.

স্নেহের সুরেশ,

তোমার পত্রখানি পেয়ে সুখী হলাম। তোমায় আমি এখান থেকেই দু একদিনের মধ্যে একখানা 'গীতিগুঞ্জ' আর দু খানা 'কাকলি' পাঠিয়ে দেব।

আর একটি গান পাঠাচ্ছি। যেখানা সংশোধনের জন্য পাঠিয়েছ সেখানাও পাঠালাম, ঠিক হয়েছে। আর আমার দিল্লীর সভাপতির অভিভাষণও পাঠাচ্ছি (রবীন্দ্র-জয়ন্তীর ভাষণ)। ছাপাও। আর তাতে ছাপার ভুল অনেক আছে তাও সংশোধন করে নিও।

আশা করি···উত্তরার ৭ম বর্ষ বয়স হল। আমি এর মঙ্গল দীর্ঘায়ু কামনা করছি। তোমার ছাপা বেশ ভাল হচ্ছে। যাতে সময়ে ছাপা হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখ। এক কপি গুরুসদয় দত্ত I. C. S-কে পাঠিয়ে দিও। তিনি গ্রাহক হতে চান। এখনও উত্তরার সুনাম যায় নাই। পার তো যাতে তার রক্ষা তাই করো।

আমার স্নেহাশীর্বাদ নিও।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

A. P. Sen Rd.
Lucknow
2. 4. 32

স্নেহের সুরেশ,

'উত্তরা' পেয়েছি, কেউ হয়ত নিয়ে গিয়েছিল পরে দিয়েছে।···

রবিবাবু লিখেছেন যে 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' পড়ে সে দিনগুলো ফিরে পেতে চাইছেন। যাতে উত্তরা সময়মত বাহির হয় তার ব্যবস্থা করো, নইলে বদনাম।

তোমাদের
অতুলদা
(A. P. Sen)

লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভাইস-চ্যান্সেলার মনোনীত হবে। অতুলপ্রসাদ ভাবলেন, কেমন হয় যদি ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ নিয়ে শিক্ষাজগতে তরুণদের মাঝে শিক্ষা নিয়ে থাকা যায়; ছুটোছুটি করতে হয় না, কোর্টের অস্বস্তিকর আবহাওয়া থেকে সরে আসা যায়, ভালই হয়। বিশ্বস্ত বন্ধুবান্ধবদের সনে এ বিষয়ে কথা বললেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম পরিষদের সদস্যদের মধ্যে দু একজন ব্যতীত সকলেই খুশি, তাঁকে ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে পেতে তাঁরা খুবই উৎসুক। অতুলপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপরিষদের একজন এবং প্রধান পরামর্শদাতা; তাঁর অবদানও কম নয়।

দু একজন যাঁরা তাঁর মনোনয়নে আপত্তি করেন তাঁদের সে আপত্তির কারণ হল ঐ চীফ জজের কাছে ডেপুটেশন নিয়ে যাওয়া।

অতুলপ্রসাদ তা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ সরে দাঁড়ালেন। তাঁকে কেন্দ্র করে শিক্ষাক্ষেত্রে দলাদলি হবে এ তিনি কোন মতেই সমর্থন করতে পারেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁর মত পরিবর্তনে দুঃখিত হলেন। অতুল-প্রসাদ তাঁর সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জেনে তাঁরা এবার আর একজন লিবারাল পার্টি মেম্বার—ডাঃ পারাঞ্জপেয়েকে ১৯৩২-এ লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মনোনীত করলেন।

॥ পঁয়ষট্টি ॥

১৯৩৩-এ এলাহাবাদে লিবার‍্যাল পার্টির উত্তর প্রদেশ শাখার অষ্টম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এবারের অধিবেশনে অতুলপ্রসাদকে সভাপতি নির্বাচিত করা হল। এ নির্বাচনে তাঁর বন্ধুরা বিশেষ করে তেজবাহাদুর সপ্রু, চিন্তামণি, জগৎনারায়ণ মোল্লা ও বিশ্বেশ্বরনাথ শ্রীবাস্তব অত্যন্ত খুশি হলেন।

১৯শে অক্টোবর যথাসময়ে এলাহাবাদে পার্টির অধিবেশন আরম্ভ হল। সভাপতির ভাষণে অতুলপ্রসাদ যা বলেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:—

"The constitutional proposal in the White Paper is certainly not Dominion Status nor any real Self-Government. It is a catalogue of safe guards rather than proposal for the real autonomy.

"There has been a dramatic change for the worse since the advent of the Conservative Party and the expression 'Dominion Status' has carefully been avoided". He then criticised the various aspects of the White Paper and said "I deplore separate electorates more than the British dominion has to be maintained no better means could be devised than separate electorates. The scheme makes no provision for self-development. We are not the architects of our own destiny, but suppliants before another nation for favour. No self-respecting Indian can helf feeling humiliation for such an abject position."

Proceeding Mr. Sen pleaded for communal unity and reconstruction of Hindu Society whose number were gradually dwindling. Unless the Hindu Society looked sharp, its majority would before long be reduced to a minority.

Mr. Sen praised Mahatma Gandhi for his Harijan movement and wished him success. Revolutionary violence according to Mr. Sen, was morally sinful and politically indefensible. "It should be our endeavour to reclaim raw and impressionable youths from the path of peril."

Concluding Mr. Sen appealed to the Congressmen to withdraw the Civil Disobedience Movement and urged for a union of the progressive parties. He was not one of those, who held that no good had come out of the British connection with India.[১]

ঐ বছরই বড়দিনের ছুটিতে গোরক্ষপুরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় মূল সভাপতিরূপে অতুলপ্রসাদকে অভিসিক্ত করা হল।

তাঁর শরীর তখন খুবই অসুস্থ। ছুটির শুরুতেই এলাহাবাদ চলে এলেন।

১—The Indian Annual Register—1933 : Mitra

বিশ্রাম পাওয়া যাবে অমনি নিরিবিলিতে সাহিত্য সভার ভাষণটি লিখে ফেলবেন।

কিন্তু বিশ্রাম নিলেও শরীর তাঁর সুস্থ হয়ে উঠল না। ডাক্তার ওদেদার ও ডাক্তার ভিয়াস বারণ করলেন, এখন রেলযাত্রা, সভাসমিতি সব পরিহার করে চলাই ভাল। কিন্তু সাহিত্যের পূজারী অতুলপ্রসাদ সাহিত্যসভার আন্তরিক আহ্বান ও আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলেন না।

অসুস্থ শরীর নিয়ে অতুলপ্রসাদ যথা সময়ে গোরক্ষপুর পৌঁছলেন। শ্রমক্লান্ত অতুলপ্রসাদকে দেখে তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুরা উৎকণ্ঠিত হলেন। কানপুরের ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন শঙ্কিত স্বরে বললেন, এমন শরীর নিয়ে আপনার ঘোরাঘুরি করা ঠিক নয়। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করলেন।

ভগ্ন স্বাস্থ্য কিন্তু অতুলপ্রসাদের মুখে তেমনি অম্লান হাসি।

নির্দিষ্ট সময়ে অধিবেশনের শুভারম্ভ হল। উদ্বোধন সংগীতের পর অতুলপ্রসাদকে মাল্যভূষিত করে স্বাগতম জানান হল। তিনি তাঁর ভাষণে বললেন :

প্রিয় সুহৃদবর্গ,

ডাক্তারের অনুশাসন পালন করলে আমার আসা হত না ; কিন্তু এতবার নানা কারণে এ-সম্মেলনের উৎসবে অনুপস্থিত হয়েছি যে, এবারে লজ্জার খাতিরেও আপনাদের সাদর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলাম না, এসে হাজির হয়েছি। আমার সভাপতিত্বের ও অভিভাষণের ত্রুটি মার্জনা করবেন এ আশা রাখি বলেই আসতে সাহসী হয়েছি।

যদি বলি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, তাহলে একটা মামুলী প্রথার কথা বলা হবে, যদিও কথাটা অতি সত্য। এর চেয়ে সত্যি কথা হবে আমি আমার পাতান ভাইবোনেদের প্রাণের ভালবাসা জানাচ্ছি, আর যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁদের সহস্র সহস্র শ্রদ্ধা অর্পণ করছি। আমি আপনাদের কাছে আসতে পেরে আপনাদের আনন্দে ও সাহিত্যসেবায় যোগ দিতে পেরে বড় সুখী হয়েছি।

যে উচ্চাসন আজ আপনারা আমায় দিলেন, তার যোগ্য আমি নই তা আমি জানি, আপনারাও জানেন। আর যদি তা না মানেন, তাহলে মানতে বেশি বিলম্ব হবে না। আমি যে আসন গ্রহণ করেছি তা সম্মানের উচ্চাসন বলে নয়, স্নেহের আসন বলে। সম্মানের সিংহাসনের চেয়ে স্নেহের কোল উঁচুতে। আজ

আপনারা আমাকে দেশবাসীর কোলে স্থান দিয়েছেন। মাতৃভাষার অঙ্কে বসিয়েছেন, তাই আমার এত গর্ব। বাংলাভাষাকে সম্বোধন করে আমি লিখেছিলাম, 'মা তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি ভালবাসা।' প্রাণের কথাই লিখেছিলাম। যাক, ভূমিকা সংক্ষেপেই শেষ করি।

আমরা যে বাঙলার বাইরে এতগুলি বাঙালী প্রতি বৎসর একত্রিত হই এবং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানের বাঙালীদের এ অনুষ্ঠানে আহ্বান করি এবং তাঁদের নেতৃত্ব কামনা করি, তার এক প্রধান কারণ হচ্ছে আমরা সকলে মাতৃভূমি বাংলাদেশের সংগে মাতৃ-সাহিত্যের যোগসূত্র রাখতে চাই এবং সে বন্ধন আরো দৃঢ়তর করতে চাই। যদিচ আমরা বাংলাদেশের বাইরে বাস করি, তবু নিজেদের প্রবাসী বলতে আমি সংকোচ বোধ করি। ভারতে বাস করে ভারতবাসী নিজেকে পরবাসী কি করে বলব। সেটা বড়ই অশোভন। তাই আমি প্রথম থেকেই 'প্রবাসী' আখ্যার বিরোধী। একবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সংগে আমার এ সম্বন্ধে কথা হয়; তিনিও প্রবাসী নামের পক্ষপাতী নন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'বহির্বংগ সাহিত্য-সম্মেলন' বললে কিরকম হয়; তিনি বলেছিলেন —বেশ ভাল কথা, ও-ও বলতে পার অথবা 'বংগতর সাহিত্য-সম্মেলন' বলতে পার। যদিও আমাদের এ সম্মেলনের একাধিকবার নাম পরিবর্তন হয়েছে তবু আমি এ বিষয়ে পরিচালকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তবে একথা বলতেই হবে 'প্রবাসী' নামটা চলে গেছে, কেমন যেন ছাড়ানো যায় না। প্রবাসী নামের যত কিছু আপত্তি উত্থাপন করি না কেন এ কথা স্বীকার করতেই হবে বাংলাদেশ আমাদের আপন দেশ, আমাদের মাতৃভূমি, বাঙলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। প্রতি বৎসর এ সম্মেলন আমাদের এ-কথাটি নূতন করে মনে করিয়ে দেয়। এ দেশকে আমরা আপন দেশ বলে মনে করব, কিন্তু জন্মভূমি যে সকল দেশের চেয়ে আপন তা ভুললে চলবে কেন? তাতে এ দেশকে একটুও অবজ্ঞা করা হয় না। আমরা অনেক স্ত্রীলোককে 'মা' বলে সম্বোধন করি, তাতে মাতৃত্বের গৌরব বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যে মা পেটে ধরেছে সে মা অন্য মায়ের চেয়ে একটু পৃথক: সে জননী, শুধু মা নয়। বাঙলা দেশ আমাদের জননী এ কথাটি মনে রাখা বড় দরকার। এ সম্মেলনে প্রতি বৎসর আমরা যেন আমাদের সেই সুজলা সুফলা 'মা'-টিকে সম্মিলিতভাবে স্মরণ করি। লক্ষ্ণৌ সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনের জন্য যে উদ্বোধন সংগীত রচনা করেছিলাম তাতে লিখেছিলাম:

"সুজলা সুফলা ওগো শ্যামা।
ওগো বাঙ্গালীর হৃদি-রমা!
ভোলেনি তোমায় ভোলেনি মা
তোমার প্রবাসী সন্ততি"।

আমার দেশের কয়েকটি ভাইবোন তাদের নবজাত পত্রিকার জন্য ১টি কবিতা বা গান লিখে পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছে।......আমার মিষ্টি দেশটি আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল, ভাল করে মনে হল আমি ভুলিনি, ভুলিনি আমার দেশমাতাকে যদিও ৩৫ বৎসর সে গ্রামখানিতে যাই নি। দূর দেশে থাকলে কি হবে, মার টান বড় টান। তাই মনে করে একটি কবিতা অল্পদিন হল সেই দেশের পত্রিকার জন্য লিখে পাঠিয়েছি।..... সে গানটিতে নিজেকে প্রবাসী বলেই উল্লেখ করেছি। ক্ষমা করুন।

প্রবাসী, চল্‌রে দেশে চল্‌,
আর কোথায় পাবি এমন হাওয়া,
এমন গাঙের জল!
যখন ছিলি এতটুক্‌,
সেথাই পেলি মায়ের সুধা
ঘুম-পাড়ান বুক,
সেথাই পেলি সাথির সনে
বাল্য-খেলার সুখ,
যৌবনেতে ফুটল সেথাই হৃদয় শতদল।
—প্রবাসী চল্‌রে দেশে চল্‌।
হরির লুটের বাতাসা, আর পৌষমাসের পিঠা,
পীরের সিন্নি, গাজির গান, আর
করিম ভাইয়ের ভিটা,
আহা মরি সেই স্মৃতি আজ লাগছে কত মিঠা!
শিউলি, বেলি কদম, চাঁপা এমন কোথায় বল।
প্রবাসী, চল্‌রে দেশে চল্‌।
মনে পড়ে দেশের মাঠে খেত-ভরা সব ধান,
মনে পড়ে তরুণ চাষির করুণ বাঁশির তান,
মনে পড়ে পুকুর পাড়ে বকুল গাছের গান,

মনে পড়ে আকাশভরা মেঘ ও পাখীর দল।
—প্রবাসী, চল্‌রে দেশে চল্‌।

যদিও এদেশও আমাদেরই দেশ, এ দেশেই আমরা অনেকে ঘর বেঁধেছি, নানা কাজে এ দেশেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি, এ দেশের লোকদের বড় আপন মনে হয়, তাদের স্নেহ করি, তাদের সেবা করে আনন্দ পাই, কৃতার্থ হই হয়ত এ দেশেই ছাইটুকু রেখে যাব,—তবু—তবু—সেই যে বড় বড় নদীর দেশ, সেই যে ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট আমার ভাই বোনগুলি, সেই ভাটিয়ালী, বাউল ও কীর্তন গান, সেই যে ভাবপ্রবণ জাতিটি, আর সেই যে আমার অতি মিষ্টি বাংগলা কথা, ও বাংগলা ভাষা, সে যে আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি, তাকে ভুলতে পারি না। বহুকাল পূর্বে ছাত্রাবস্থায় বিলাতে অদ্বিতীয়া গায়িকা মাদাম প্যেটির মুখে একটি গান শুনেছিলুম—"Home Sweet Home"—তা এখনও আমার কানে মধুবর্ষণ করে।

তবে একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে যদিও আমরা জন্মভূমি থেকে দূরে রয়েছি, তবু এ দেশও আমাদেরই দেশ, এ আমাদের জন্মভূমি না হলেও কর্মভূমি, অন্ন-ভূমি। এ দেশই আমাদের জীবিকার সংস্থান করে দিচ্ছে। অনেক বাংগালী আছেন যাঁদের এ দেশই জন্মভূমি। এ দেশের অধিবাসীরা আমাদের ভাই বোন; ভাই বোন ভেবেই এদের বুকে টেনে নিতে হবে। এদের অন্তরের ভালবাসা দেওয়া চাই। মনে বা মুখে এ দেশের লোকদের তাচ্ছিল্য করলে নিজেদেরই হীনতা ও অনুদারতা প্রকাশ পাবে। চাণক্য বলে গেছেন—'উদার চারিতানাম্‌ বসুধৈব কুটুম্বকম্‌' মনে রাখার কথা,জীবনে পালন করবার কথা। এই গোরক্ষপুরের সন্নিকটেই দেবদেব বুদ্ধদেবের জন্ম ও মহা-প্রস্থানের স্থান। এই অতি পবিত্র দেশে দাঁড়িয়ে আমি আজ মানব-প্রীতি ও অহিংসার অবতার সেই মহাত্মাকে স্মরণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ করি। আমিও আজ ভক্তিভরে বলি 'বুদ্ধায় নমো।' তাঁর উপদেশ 'জীবে প্রীতি জীবে দয়া' যেন এ দেশবাসী বাংগালীরা কখনও না ভোলেন। সিদ্ধার্থের জন্মভূমি আজ আমাদের এ কথাই বলছে 'বাংগালী, মানব মাত্রকেই প্রীতির চক্ষে দেখিও; অহিংস, বিশ্বপ্রীতি, জীব সেবাই মানবের পরম ধর্ম"। হয়ত অনেকেই জানেন না যে এক সময়ে আমাদের বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তৃত প্রভাব ও প্রসার ছিল। জানি না, আমার মনে হয় বৌদ্ধধর্ম এ দেশ থেকে অপসৃত না হত তা হলে হয়ত এদেশের এত দুর্গতি হত না। বৌদ্ধ-

ধর্মের সাম্য ও একজাতীয়তা ভারতবাসীকে এত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতে দিত না। যে সাধনার উপায়গুলি বুদ্ধদেব নির্দেশ করে গিয়েছেন তা আজ আবার আমাদের মনে করবার দিন এসেছে—'সদ্দৃষ্টি, সৎ সংকল্প, সদ্বাক্য, সদ্ব্যবহার, সদুপায়ে জীবিকা অর্জন, সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি।' আমি আমার বাংগালী ভাই বোনদের বিশেষ করে আজ এ উপদেশ কয়টি মনে রাখতে অনুনয় করি। তাহলে আমরা এদেশীয়দের সংগে সখ্যভাব রক্ষা করে চলতে পারি।

এখন আমাদের নিজেদের কথা দু' একটি বলি।—

প্রথম কথাই হচ্ছে বহির্বংগীয় বাংগালীদের মধ্যে মিত্রতাস্থাপন। এ মিত্রতার অভাব আমরা মাঝে মাঝে বেশ অনুভব করি। এ নিতান্তই আক্ষেপের বিষয়, দলাদলি এ দেশের বাংগালীদের মধ্যেও বিস্তর দেখতে পাই। এই বিজয়ার সাম্বাৎসরিক আলিংগন বাংগালীকে এ অনিষ্টের কবল হতে মুক্তি দিতে পারে নি। বড় দুঃখ হয় দেখলে, যেখানে মুষ্টিমেয় বাংগালী সেখানেও দলাদলির সৃষ্টি। যেখানে দুশ বাংগালী সেখানেও হয়ত দুটি ক্লাব, তিনটি থিয়েটার, পাঁচটি কনসার্ট। এ অত্যন্ত অশোভন, এতে দলক্ষয় তো হয়ই বলক্ষয়ও হয়! আমরা যদি প্রীতিবদ্ধ ও দলবদ্ধ হয়ে মিলেমিশে থাকি তাহলে আমরা বাইরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও প্রতিযোগিতায় আরও ভাল করে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারি এ কথাটি ভুলে যাওয়া আমাদের পক্ষে নিতান্ত হানিকর। আমি আমার বাংগালী ভাইদের বিশেষ করে মিনতি করি, দুর্ভাগ্যের হাত হতে নিষ্কৃতি পেতে সকলেই যেন চেষ্টা করেন।

···বাংগলার বাইরে বাংগালী ছেলেমেয়েদের প্রতি আমাদের ১টি গুরুতর কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে। এদেশে তাদের বাঙগলা শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করতে আমাদের বিশেষ যত্নশীল হতে হবে। বহুকাল এদেশে থেকে এককালে বাংগালী ছেলেমেয়েরা প্রায় অবাংগালী হয়ে যাচ্ছিল। কেহ কেহ হয়ত বাংগলা ভাষা একেবারে বলিতে পারিত না, আর যা বলিত তা এক হাস্যাস্পদ বাংগলা ও হিন্দীর অদ্ভুত সংমিশ্রণ। বড়ই সুখের কথা আজকাল সে ত্রুটি বড় দেখতে পাওয়া যায় না।

আর একটি আমাদের প্রধান প্রয়োজন ও কর্তব্য—বাংগলার বাইরে বাংগলা সাহিত্যের সাধনা ও প্রচার। আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমাদের বাংগালী জাতির সব চেয়ে গর্বের বিষয় কি? আমি কোন দ্বিধা না করে তৎক্ষণাৎ আমার নিজের গানের কথায়ই বলব—'মোদের গরব মোদের আশা,

আ মরি বাঙ্‌লা ভাষা।' ভারতের সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে যে বাংগালা-সাহিত্য সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কি করে করবে। জগৎ যে সে কথা স্বীকার করে বসে আছে। আজও জগতের নানা দেশ বাংগালীর সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথকে সম্মান-মুকুট পরাবার জন্য লালায়িত। তারপর অকস্মাৎ আমাদের শরৎচন্দ্র এসে ভারতের সাহিত্য-সভার প্রথম পংক্তিতে আসন গ্রহণ করেছেন, সকলেই বলছে এ আসন তাঁরই প্রাপ্য। ভারতের অন্যসব কথা-সাহিত্য শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও গল্প অনুবাদ করে সমৃদ্ধ হচ্ছে।

এ প্রসংগে একটা পুরাতন কথা মনে হল। তখন আমি পাঠ্যাবস্থায় বিলাতে ছিলাম। ১৮৯৩ সালের কথা। ছেলেবেলা থেকেই আমার বাংগালা-সাহিত্যে একটু অনুরাগ ছিল। লণ্ডনে British Museum-এর লাইব্রেরী জগদ্বিখ্যাত পুস্তকাগার। একদিন লাইব্রেরীর ক্যাটলগগুলির মধ্যে দেখি একখানা বাংগলা বইয়ের ক্যাটলগ। তাতে একটি জিনিস দেখে আমার বড় গর্ব হল। বাংগলার যত পুস্তক ছাপা হয়েছে এবং জগতের যে যে ভাষায় বাংগালা পুস্তকের তর্জমা হয়েছে তারও তালিকা তাতে দেখলাম। দেখলাম বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের তর্জমা ভারতীয় ও ইউরোপীও ভাষায় তর্জমা হয়েছে। কপালকুণ্ডলার তর্জমা করেছিলেন—H. A. D. Phillips I. C. S. এবং সে ইংরেজী তর্জমা থেকে জার্মন ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় কপালকুণ্ডলা অনুবাদিত হয়েছে। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের কাল থেকেই জগতের সাহিত্যে বাংগলা-সাহিত্যের প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়েছে। যেদিন British Museum-এ এ জিনিসটি আবিষ্কার করলাম সেদিন থেকে মাতৃসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দশগুণ বেড়ে গেল। তারপর রবীন্দ্রনাথের তো কথাই নেই। যদি আপনারা কখনও বোলপুরে যান সেখানকার লাইব্রেরীতে দেখতে পাবেন—জগতের এমন ভাষা নেই যে ভাষায় রবীন্দ্রের পুস্তকাবলী অনূদিত হয় নি। দেখলে গর্বে বক্ষ স্ফীত হয়। এমন যে আমাদের ভাষা—আমাদের অপূর্ব সম্পদ্‌ তা আমরা বংগের বাহিরে বাংগালীরা কি সম্ভোগ করব না? না করিলে যে পাপ হবে। তাই বলি, এদেশীয় বাংগালী ভাইবোনেরা এ দেশেও মাতৃ-ভাষার পূজা সমারোহে করো। এ পূজায় যে আমাদের শুধু আনন্দ তা নয়, এ বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব আছে। বাংগালী ছোট ছোট মেয়েরা যখন বাংগালা অলংকারের সংগে সামঞ্জস্য করে এ দেশীয় অলংকারও পরে, বড় মধুর দেখায়। তেমনি আমরাও এদেশীয় সাহিত্যের ভূষণ-ভাণ্ডার থেকে রত্ন সংগ্রহ করে

বাংগলা সাহিত্য-সুন্দরীকে নূতন ভূষণে অলংকৃত করতে পারি। এদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। এক সময় বাংগালাদেশে কোন কোন সাহিত্যিকেরা ফরাসী সাহিত্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং পারস্য সাহিত্যের সাহায্যে বাংগালা ভাষার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় পারস্য কবিতার অনুবাদ যথেষ্ট পাওয়া যায়। হাফিজের অনেক কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন অথবা তা অবলম্বন করে কবিতা লিখেছেন।

'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত হও
কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখ লাভ
হয় কি মহীতে—'

এটি তর্জমা, অথচ এ কথা দুটি অনেক বাংগালীর কণ্ঠেই শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকেই জানেন বৈষ্ণব পদাবলী বাংগালা সাহিত্যের অতুল সম্পদ। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, ও বিদ্যাপতির পদাবলী হিন্দীবহুল। ব্রজভাষা বাংগালীর ভাষা নয়, কিন্তু বাংগালীর সাহিত্য। আমরা যারা বাংগালার বাইরে থাকি আমাদের কর্তব্য হিন্দী, উর্দু, পারসী, গুরুমুখী ইত্যাদি ভাষার উদ্যান থেকে মধু আহরণ করে আমাদের বাংগালা সাহিত্যকে আরো মধুময় করা। লক্ষ্ণৌ সাহিত্য সম্মেলনে আমি বলেছিলাম—"যাঁরা উর্দু ভাষায় পারদর্শী তাঁরা দাগ, গালিব…… ।"

সাহিত্য সম্বন্ধে আর দু'একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি।……আমার মতে সাহিত্যের উপকরণ প্রধানতঃ তিনটি :—ভাব, ভাষা ও ভংগী।

ভাব :—যদিও আমি ভাবের নিরামতায় পক্ষপাতী, তথাপি আমি কখনও বলি না যে, কতকগুলি হিতোপদেশই সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য। বর্তমান বাংগালা সাহিত্যে দু'একটা জিনিস দেখে একটু দুঃখিত ও শংকিত হই। কয়েকটি আবর্জনা আমাদের সাহিত্য সম্পদকে কিঞ্চিৎ পংকিল করে তুলেছে। কোনও কোনও লেখা অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। আর্টের দোহাই দিয়ে, বাস্তবতার দোহাই দিয়ে সাহিত্যে অশ্লীলতা প্রচলন ও প্রচার করলে অন্যায় করা হবে। উদীয়মান সাহিত্যিকেরা এ বিষয়ে একটু সতর্ক হবেন। বাস্তবতাকে বর্জন করলে সাহিত্য চলে না এ কথা সতঃসিদ্ধ। বংকিম, রবীন্দ্র, শরৎ কেহই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেন নি। সত্যের উপরেই সাহিত্যের আসন। তবে সব মলিন সত্য বা কুৎসিত বাস্তবতাই সাহিত্যের আধার নয়। কতকগুলি বাস্তবতা

সুসাহিত্যে বর্জনীয়। কেন না সাহিত্যের আশ্রয় শুধু সত্য নয়, শিব ও সুন্দরও সাহিত্যের আশ্রয়। যে সাহিত্য অশিব, অসুন্দর সে সাহিত্যের যত বাস্তবতাই থাক না কেন পরিত্যজ্য।

বর্তমান বংগ সাহিত্যের আর একটি ত্রুটি কখনও কখনও লক্ষিত হয়। সেটি হচ্ছে ভাবের অস্পষ্টতা। ভাবের কুজ্ঝটিকার সংগে ভাষারও বাষ্পাকুলতা দেখতে পাই। সাহিত্য যদি এত দুরধিগম্য হয় যে তার অর্থ বুঝবার চেষ্টা পদে পদে প্রতিহত হয় তাহলে সাহিত্য শুধু একটা সমস্যাতে দাঁড়ায়। সাহিত্যের লক্ষ বোধ হয় তা নয়। অবশ্য এ দলের লোকেরা হয়ত বলবেন এ পাঠকের বুঝবার ক্ষমতার অভাব, লেখকের লেখার দোষ নয়। কোনও কোনও স্থলে হয়ত একথা সত্য, কিন্তু আমার মনে হয় না যে এ সম্পূর্ণ সত্য। কোনও কোনও স্থলে হয়ত লেখকরা নিজেরাই ঠিক হৃদয়গম্য করতে পারেন না কি লিখেছেন। তাঁদের কাছে না বুঝতে পারা অথবা না বোঝাতে পারা সাহিত্য-কলার একটা কৃতিত্ব। সেই না বুঝতে পারার আনন্দে লেখক ও পাঠক উভয়েই বিভোর। মাঝে মাঝে দেখতে পাই—ভাব যখন খুব প্রচ্ছন্ন বা আচ্ছন্ন, ভাষার আড়ম্বর ও সাজসজ্জা ততই বেশী। ভাষার আচ্ছাদন ও আভরণ এত বেশী যে ভাবের শুভদৃষ্টির পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। সাহিত্যের উদ্দেশ্য পুরাতনকে নূতন করে দেখান, যে নূতন ভাব-সৌন্দর্য পূর্বে চোখে পড়েনি তা চোখের সামনে, মনের সামনে ধরা—কিন্তু দেখাতে পারা চাই; দেখতে পারা চাই। লেখক যদি শুধু নিজেই বুঝলেন, বা না বুঝলেন, আর যদি পাঠকেরা অন্ধকারে পথ খুঁজে না পায় তবে সাহিত্যের সার্থকতা কি? প্রবাসের নবীন লেখকদের এ বিষয়েও একটু সতর্ক হতে অনুরোধ করি। কালিদাস বলে গেছেন—বাক্য এবং অর্থ দুইয়ের সমাবেশ হলে তবে হরপার্বতীর মিলন হয়। সাহিত্য সম্বন্ধেও তাই।

ভাষা:—সাহিত্যের ভাষাসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা বড় কঠিন। এ বিষয়ে গোঁড়ামী করা ধৃষ্টতা। সাহিত্যের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকবেই। আমার মতে ভাষার বৈচিত্র্য সাহিত্যের সম্পদ। ইহা লেখকের রুচি, শিক্ষা ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। আমি নিজে যদিও সরল ও সুস্পষ্ট ভাষার পক্ষপাতী, তবু আমি মার্জিত ও সংস্কৃত ভাষা খুব সম্ভোগ করি। কাঁচা বয়সে রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের ভাষার বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু তারপরে তিনি সে সমালোচনার ভ্রম নিজেই

স্বীকার করেছিলেন। যে ভাষা শ্রুতিমধুর, যে ভাষা ভাবকে সুন্দররূপে প্রকাশ করতে পারে, যে ভাষা নিতান্ত আড়ষ্ট বা অস্পষ্ট নয় তাই সাহিত্যের সমীচীন ভাষা। আমি নিজে সরল ভাষার পক্ষপাতী, কিন্তু তরল ভাষার বিরোধী। আধুনিক সাহিত্যে কখনও কখনও তরলতা লক্ষ্য করি। আমি নিজে লিখিত ভাষায় প্রাদেশিকতার আতিশয্য অপছন্দ করি। কলিকাতার ভাষা যদিও সাহিত্যের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে তবু তারও আতিশয্য নিরাপদ নয়। ধরুন যদি চট্টগ্রামবাসী কিংবা শ্রীহট্টবাসী এবং বঙ্গের অন্যান্য স্থানের সাহিত্যিকেরা জেদ করেন তাঁদের স্থানীয় ভাষাও বাংগলা সাহিত্যে চালাতে হবে তাহলে বাংগলা সাহিত্যের কি দুর্দশা হবে বুঝতেই পারেন। মনে রাখতে হবে বাংগলা সাহিত্য সমগ্র বাংগলার সাহিত্য, বাংগালী যে যেখানে আছেন তাঁদেরই সাহিত্য। বড়ই গৌরবের বিষয় আমাদের বাংগালী মুসলমান ভাইদের মধ্যে অনেক সু-সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে। অধিক স্থলেই তাঁদের বাংলা ভাষা বড়ই মনোরম। আমি তাঁদের রচনা খুব আনন্দের সংগে পাঠ করি। তাঁরা অনেকেই সাহিত্যের উচ্চস্থান অধিকার করেছেন। তাঁরাও বাংগালী, তাই তাঁদের ভাষাও বাংলা। আমি অন্তরের সহিত কামনা করি হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিকদের ভাষায় যেন কোনরূপ প্রকট পার্থক্য না এসে পড়ে। উভয়ের আদর্শের আদান-প্রদান যেন বাগালী সাহিত্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়।

ভঙ্গী :—ভাষার ভংগী অর্থাৎ style, সাহিত্য-কলার এক প্রধান অংগ। লেখকের ভাষার ভংগীর উপর তাঁর রচনার সম্মোহনতা অনেক নির্ভর করে। রচনার ভাব ও ভাষা যত গুরুগম্ভীর হক না কেন যদি তার প্রকাশভংগি মনোরম না হয় তা হলে সাহিত্য হিসাবে সে রচনা পংগু। রচনাভংগীর কোন বাঁধা নিয়ম নেই। ভংগীর বৈচিত্র্য সাহিত্যের ঐশ্বর্য। বড় বড় সাহিত্যিক যাঁরা তাঁদের রচনাভংগী মনোহারী ও স্বতন্ত্র। যুগ হিসাবে হয়ত সাহিত্যিকের style-এর অনেকটা ঐক্য ও সমতা লক্ষ্য করা যায়; যেমন বৈষ্ণব কবিদের যুগ, মাইকেল, হেম, নবীনের যুগ, বঙ্কিমের যুগ, রবীন্দ্রের যুগ আর এখন শরৎচন্দ্রের যুগ। এঁদের লেখার ছাপ সম-সাময়িক লেখকদের সাহিত্যের উপর পড়ে এবং সেই যুগপ্রবর্তকের style-ই সে যুগের style বলা যেতে পারে। কিন্তু সুলেখক মাত্রেরই একটা নিজস্ব প্রকাশভংগি আছে। যাহা অননুকরণীয়। অনুকরণের চেষ্টা বিস্তর হয়, কিন্তু সফল মনোরথ হওয়া তত সহজ নয়। যদিও বাস্তব অনুকরণ দুঃসাধ্য তবু সাহিত্য-মহারথীদের

প্রভাব এড়ানো সাধারণ লেখকের পক্ষে তত দূরেই দুঃসাধ্য। বর্তমান বাংগলা সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট রবীন্দ্রের সাহিত্যের প্রভাব বাংগালী লেখকমাত্রেরই উপর অল্প বিস্তর পড়েছে। শত চেষ্টায়ও যেমন প্রকৃত অনুকরণ সহজ নয়, তেমনি শত চেষ্টায়ও প্রধান সাহিত্যিকদের রচনা-ভংগীর প্রভাব এড়ানো সহজ নয়। তবু আমি নবীন লেখকদের বলি, তাঁরা যেন শুধু অনুকরণের চেষ্টা না করেন, তাঁদের নিজের প্রকাশভংগি যেটা আপনা হতে আসে সেটিকে যেন যত্নে রক্ষা করেন, অজ্ঞাতসারে অপরের প্রভাব পড়ে পড়ুক। সুলেখক মাত্রেরই রচনা-ভংগীর স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করি। মুখোস পরে নিজের আকৃতির দৈন্য অনেকদিন ঢেকে রাখা যায় না। নিজের সাহিত্যের আকৃতিকেই সুপরিমার্জিত করে, স্বাভাবিক উপায়ে তার সৌষ্ঠব বর্ধন করাই শ্রেয়ঃ মনে করি। তাতে অন্ততঃ হাস্যাস্পদ হতে হয় না। সাহিত্যের ভংগী-সম্বন্ধে এ কথাটি আপনাদের কাছে নিবেদন করলাম।

এ বিষয়ে উপসংহারে আমি গর্বের সহিত বলি, বর্তমান বাংগলা-সাহিত্যের যা কিছু ত্রুটিই থাক না কেন, আমাদের বাংগলার সাহিত্য-ক্রমোন্নতির স্তরে আরোহণ করেছে। এক সময় ছিল যখন বাংগলা সাহিত্যে কয়েকজন মাত্র মহারথী ছিলেন আর বাকি সব নিতান্তই নিম্নস্তরের। আজকাল সুসাহিত্যের স্তর ও বিস্তার অনেক উঁচুতে—যাকে ইংরেজীতে বলে level। যেটি পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি লাভ করেছে। সেটি খুবই শ্লাঘার বিষয়। যদি কিছু কালের জন্য রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কেদারনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকদের লেখা ভুলে থাকা যায়, তবু সুপাঠ্য ও সুখ-পাঠ্য সাহিত্যের দৈন্য কেহ লক্ষ্য করবেন না। আমাদের সাহিত্য-কলা নবীন সৌষ্ঠব সুন্দর। কবিতা ও গান বাংগলা-সাহিত্যকে ও বাংগালী জাতিকে চিরদিন অমর করে রাখবে। এমন কবিতা-প্রিয়, সংগীতপ্রিয় জাতি জগতে আছে কিনা জানি না।

"কি যাদু বাঙ্‌লা গানে
............কাটে চাষা,
আ মরি বাংলা ভাষা।"

দীর্ঘ ভাষণ দানের পর অতুলপ্রসাদ ক্লান্ত, অবসন্ন। কিন্তু সেজন্য তাঁর চিন্তা নেই। তিনি তখুনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি চারুচন্দ্র দাসের বাড়ি গেলেন, সংগে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি শ্রান্ত অতুলপ্রসাদকে লক্ষ্য করে মন্তব্য করলেন, না আসাই আপনার উচিত ছিল। উত্তরে অতুলপ্রসাদ জানালেন,

"উচিত তো অনেক কিছুই থাকে, কটা পারলুম। ভদ্রলোককে কথা দিয়েছি যে।"[২] সেখানে পেঁাছেও রেহাই নেই, একজন ভদ্রমহিলা একটি গান শোনাতে অনুরোধ করলেন। সংগে সংগে শোনালেন, তিনি কাউকে বিমুখ করতে পারতেন না।

এই গোরক্ষপুর সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে অতুলপ্রসাদ কথাপ্রসংগে নিজেকে একজন "বাউল" বলে উল্লেখ করেন।

॥ ছেষট্টি ॥

গোরক্ষপুর সাহিত্য সম্মেলন থেকে আরো অসুস্থ হয়ে ফিরে এলেন। এ সময়ে তিনি প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। সুস্থ হলেই আবার কোর্টে যাওয়া-আসা করতেন! একেবারে বিশ্রাম নেবেন এত অবসর তাঁর কোথায়; নিজের প্রয়োজন ব্যতীত তাঁর প্রচুর অর্থের দরকার। হেমকুসুম আলাদা থাকলেও তাঁকে তাঁর প্রয়োজন মত অর্থ দিয়ে এসেছেন। তাছাড়া তাঁর কত প্রার্থী, কতও দানধ্যান, তাঁকে কোর্টে যেতেই হয়।

তবে ডাক্তারের পরামর্শে কোর্টের কাজ ও বাইরের কাজ কমিয়ে বিশ্রাম নিতে লাগলেন, অবসর হয়ে উঠল দীর্ঘ। হেমন্তনিবাসের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই অতুলপ্রসাদ তাঁর সে অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা করে নিলেন। রবিবারের উপাসনা সভা, সাহিত্য ও সংগীতচর্চা এই সবের মধ্যে দিয়ে তাঁর বিলম্বিত দিনগুলি সময়ের কোল থেকে যেন শিশির বিন্দুর মত ঝরে পড়তে লাগল। সুহৃদ ও অনুরাগীদের নিয়ে প্রধানতঃ সংগীতচর্চায় তাঁর সময় কাটত; হেমন্ত-নিবাস বিচিত্র সুরধারায় সর্বদা কলমুখরিত হয়ে থাকত।

সংগীতচর্চায় ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর সংগী ছিলেন। কতদিন নির্জনে তাঁর সংগে গান নিয়ে আলোচনায় কেটে গেছে; নতুন গান তৈরী হলে তাঁর ডাক পড়েছে, গান শোনাতে শোনাতে সন্ধ্যে উৎরে রাত ঘন হয়েছে।

এবার এলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল। অতুল-ভবনে তাঁর যাওয়া-আসা ছিলই তবে পাহাড়ী সান্যাল চিত্রজগতে চলে যাওয়ায় তাঁর স্থানটি নিয়ে তিনি অতুল-

---

২—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'অন্নষ্টং যন্ন দীয়তে' : "উত্তরা" ৮ম বর্ষ—৭ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩৪০।

প্রসাদের এখন সংগীতের ঘনিষ্ঠ সংগী হলেন। চলতে লাগল অতুলপ্রসাদের গান শোনা, তাঁর কাছে গান শেখা এবং তাঁর গান সম্বন্ধে আলোচনা।

অতুলপ্রসাদ অন্যের কণ্ঠে নিজের গান শুনেই তৃপ্ত হতেন না, তাঁর প্রতিটি গানের যাতে চর্চা হয় তাও আশা করতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথকে একদিন বললেন, তুমি আমার "কে আবার বাজায় বাঁশি" গানটি গাও না তো ? আমার অন্যান্য গানের সংগে ওটিও গেও।

ঐ গানের সঞ্চারি দ্বিজেন্দ্রনাথের পছন্দ ছিল না, সে মত ব্যক্তও করলেন। শুনে অতুলপ্রসাদ যেন আকুল হয়ে বললেন, 'দ্বিজু দ্বিজু, ও গানের আভোগের সুর তোমার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে, গেও আমার ও গানটি।'

তাঁর গানের আসর তখন সর্বসম্প্রদায়ের সমন্বয়ে ও আগমনে তীর্থ হয়ে উঠেছে। অতুলপ্রসাদের প্রিয় গায়ক রতনঝংকার তখন প্রায়ই আসেন ; সংগে আসেন নাটু মহারাজ। তাঁদের কাছ থেকে ওস্তাদী গান শুনে সেই সুরে বাংলা শব্দ প্রয়োগ করে গান রচনা করতেন। এই ভাবেই হিন্দী গান 'ভবানী দয়ানীর' ওপর লেখা হয় 'সে ডাকে আমারে বিনা সে সখারে' ; 'আয়ে বাদরোয়া কালে কালে'-র ওপর লেখা হয় 'যাবা না যাব না যাব না ঘরে' ; 'কলিয়া কা সংগ করত রংগবালিয়া'-র ওপর লেখা হয় 'আমার বাগানে এত ফুল, তবু কেন চলে যায়' ইত্যাদি।

রাস্তা দিয়ে কোন ভিখারী বা ভিখারিণী মিষ্টি সুরে গান গেয়ে বেড়ালে অতুলপ্রসাদ সংগে সংগে সে সুরে বাংলা শব্দ প্রয়োগ করে গান লিখে ফেলতেন।

সত্যপ্রসাদ সেন তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন, "সংগীত ছিল তাঁর (অতুল-প্রসাদের) জীবন। প্রত্যেকটি সংগীতের সংগে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের যোগ ছিল। তাঁকে চিনতে হয় তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে।"

অতুলপ্রসাদের জীবন অনুধাবন করলে উপরোক্ত মন্তব্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না। তাঁর বিরাট কর্মময় জীবনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি যে সব গান রচনা করেছেন এবং গেয়ে শুনিয়েছেন তা যেন মনে হয় কবি স্বয়ং কথক হয়ে নিজের জীবন-কথা, নিজের পূর্ণ রূপ সবার চোখের সামনে তুলে ধরেছেন।

অতুলপ্রসাদ তাঁর গানে জীবনের নানাদিকসহ তাঁর জীবনাদর্শও তুলে ধরেছেন, যেমন—

"হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,
হও উন্নত শির—নাহি ভয়"...

গানটিতে তাঁর জাতীয়াদর্শ অনুভব করা যায়। তেমনি—

পরের শিকল ভাঙিস পরে,
নিজের নিগড় ভাঙ রে ভাই।”

গানটিতে তাঁর হরিজনপ্রীতি,

“দেখ মা, এবার দুয়ার খুলে।
গলে গলে এনু মা, তোর, হিন্দুমুসলমান দু-ছেলে।”

গানটিতে একত্ববোধ ও সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা,

“দুটি ঘরে জ্ঞানের আলো,
কোটি ঘরে আঁধার কালো।”

গানটিতে শিক্ষা বিস্তারের একান্ত অভাব, এবং

“কত কাল রবে নিজ যশ-বিভব-অন্বেষণে?”

গানটিতে মানবসেবায় সকলকে উৎসাহিত করেছেন।

এ কথা সত্যি যে অতুলপ্রসাদ যে ক'খানি জাতীয় সংগীত রচনা করে গেছেন তাইতেই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কিন্তু অতুল-সংগীতের জনপ্রিয়তার মূল কারণ হল তাঁর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের করুণ গান যা কখনো স্বগতোক্তিতে লেখা কখনো বা ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে লেখা।

এই সব করুণ গান সৃষ্টির মূল কারণ হল তাঁর পারিবারিক জীবনে সীমাহীন অশান্তি। স্ত্রী হেমকুসুমের সঙ্গে মাঝে মাঝে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠলেও এবং বিচ্ছেদ হলেও তাঁর অন্তরের অন্তস্তলের সবখানি প্রিয়তমা পত্নী জুড়ে ছিলেন। জীবনের ঝড়-জল-রৌদ্র-আলোয় তাঁকে সর্বদা পাশে পেলেন না, হাতে হাত রেখে সংসারে চলতে পারলেন না এজন্য তাঁর মনের গভীর দুঃখই হল অতুল-সংগীতের উৎস। আবার তাঁর মত মানী, গুণী ব্যক্তির স্ত্রী একই শহরে আলাদা বসবাস করছেন সে খবর ও তার কারণ প্রায় কারুরই অজানা ছিল না; সে জন্য তাঁর কুণ্ঠা, ক্ষোভ ও দুঃখের অবধি ছিল না।

অবশ্য তাঁর এ দুঃখের স্তরভেদ আছে। অতুলপ্রসাদ তাঁর গান রচনার সঙ্গে সঙ্গে যদি তারিখ ব্যবহার করতেন তবে এই স্তরভেদ করা সহজ হত। কিন্তু তা যখন করেন নি তখন তাঁর গানের দ্বারা আমাদের সে কাজ করতে হবে। ১৯১৬ সালে প্রথমবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। এর আগে অতুলপ্রসাদ তাঁর বিখ্যাত স্বদেশসংগীতগুলি রচনা করেছেন। কিন্তু উক্ত ঘটনার পর থেকে তিনি যেমন প্রচুর গান রচনা করেছেন তেমনি তার ভাষা ও সুর বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

প্রচণ্ড অভিমানে তখন কবি এ-স্থান ও-স্থান করে বেড়াচ্ছেন। দাদার সংগে দার্জিলিং গেলেন। এতদিন মনে আশা করেছিলেন তাঁদের ভাঙা ঘর আবার জোড়া লাগবে, চাঁদের হাসির মতই আবার আনন্দে তাঁদের জীবন হেসে উঠবে, হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

কিন্তু তাঁর স্বপ্ন সার্থক হয় নি। বিরহের মাঝে মিলনের সেতু গড়ে ওঠে নি বরং দুজনের মাঝে বিচ্ছেদের পরিখা বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হয়ে উঠেছে। কবি অভিমান ভরে গেয়ে উঠেছেন :—

"যাব না যাব না যাব না ঘরে"

বা

"তখনি তোরে বলেছিনু মন,
যাস নে রে তুই এ বিপথে,
মানলি নি তখন"...

আবার কলহের শেষে প্রিয়তমা পত্নী যখন ফিরে এসেছেন তিনি নতুন আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে গেয়েছেন :—

"কে গো তুমি বিরহিণী,
আমারে সম্ভাষিলে ?"...

"আজ আমার শূন্য ঘরে
আসিল সুন্দর"...

কিন্তু সে আনন্দ সংসারের অত্যাচারে বিরহে পরিণত হতে দেরি হয় নি। দুঃখিত, অনুতপ্ত কবি তখন প্রিয়তমাকে উদ্দেশ করে গেয়েছেন :—

"তাপিত চিত্তে এ মিনতি করি
কাটাই দিন কেমনে "...

"প্রতিদিন ফুল তুলে, যাইব তোমার কূলে
সেদিনের মত শুধু মিটাও প্রেম পিয়াসা"...

"ওগো নিঠুর দরদি, এ কী
খেলছ অনুক্ষণ"...

বা

"পথ আমার গেল ভেঙে"...

এ সব হল জীবনে ভাঙনের রূপ দেখে তাঁর ব্যথিত চিত্তের বিষণ্ণ অভিব্যক্তি। পত্নীর সংগে দ্বিতীয়বার বিচ্ছেদ ঘটার পর এমন করুণ ভাব ও ভাষার গান তিনি বহু রচনা করেন।

পরে ভোগ-সুখময় পৃথিবীর দিকে চেয়ে নিজের ব্যর্থ জীবনের জন্য কাতর হয়ে কবি তাঁর সংগীত ভাণ্ডারের করুণতম গানটি গেয়ে উঠেছেন :—

"এত হাসি আছে জগতে তোমার,
বঞ্চিলে শুধু মোরে।
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে!"…

মানুষ তার জীবনে যতই বিফল হোক না কেন তবু স্বপ্ন দেখাই তার রীতি। কবি-মন আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে চাইছে নতুন সফলতার। কিন্তু বিক্ষুব্ধ কবি নিজের মনকে প্রশ্ন করছেন :—

"আবার তুই বাঁধবি বাসা কোন সাহসে?
আশা কি আছে বাকি হৃদয়-কোষে?"…

তারপর কবি জগতের রীতিনীতি গভীর ভাবে অনুভব করে এবং জীবনকে অনুধাবন করে সাধকের মত সান্ত্বনার সুরে গাইলেন :—

"পাগ্লা, মনটারে তুই বাঁধ,"

"ভোল রে, ভোলা, ভোল।
ভুলে যা কাঁটার ব্যথা"…

"মিছে তুই ভাবিস মন"…

বা

"মন দুখ চাপি মনে হেসে নে সবার সনে"…

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের মনকে ধমক দিয়ে বা সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করতে পারেন নি। শ্রান্তক্লান্ত কণ্ঠে কবি নিজের ভাগ্যবিধাতাকে প্রশ্ন করেছেন :—

"কত গান তো হল গাওয়া,
আর মিছে কেন গাওয়াও?"…

বা

"আর কত কাল থাকব বসে দুয়ার খুলে
বঁধু আমার!"…

১৯৩০-এর পর অতুলপ্রসাদ এবং হেমকুসুমের সম্পর্ক নতুন রূপ নেয়। সত্যপ্রসাদ সেন তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—"ক্রমে স্বামী-স্ত্রীতে যেরূপ সম্পর্ক দাঁড়াইল তাহাতে একে অন্যের প্রতি স্নেহমমতাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।"...

অমল হোম, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে অতুলপ্রসাদ সবার সংগে অন্তরংগের মত মিশতেন, মহামজলিসী মানুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন একাকী থাকতেন তখন—"তাঁকে নির্লিপ্ত বৈরাগীর মতই পেয়েছি। সে কি উদার আত্মহারা নিবিষ্টতা।"

মনে হয় অতুলপ্রসাদ তখন চাওয়া-পাওয়ার ও দুঃখ-জ্বালার দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে জীবনে নতুন এক অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করেন। তাই তাঁর সংগীতও সাধারণ দৃষ্টিতে অদ্ভুত এক রহস্য নিয়ে উপস্থিত হয়। প্রচণ্ডতম আঘাতের পরও যদি এক মহান শক্তির প্রতি পরমতম বিশ্বাস রাখা যায় তবেই কবিসত্তা চৈতন্যরূপের এমন এক অনুভূতির আভাস পেতে পারে। এই দুর্লভ অনুভূতির সংস্পর্শ দু-চারজন ভাগ্যবান ভক্তের ভাগেই দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক এমনি অনুভূতির আভাস আমরা রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্র কাব্যে পেয়ে থাকি।

অতুলপ্রসাদ তাঁর এই জাতীয় গানে যেন কার আগমন, পলায়ন এবং কথন শুনে সচকিত হয়ে উঠছেন। কিন্তু যিনি অদৃশ্য থেকে তাঁর মনের আঙিনায় আনাগোনা করছেন সেই অধরার ধরাছোঁয়া না পেয়ে বিরহী ভক্ত, বাউলের মত তিনি গেয়েছেন—

"কে যেন আমারে বারে বারে চায়।
আমি তো চিনি নি তারে, সে চেনে আমায়।
যবে থাকি ঘুমঘোরে
কে দোরে আঘাত করে;
'কে তুমি' বলে ডাকিলে
কে যেন পালায়।"...

"কেন তারে পাই নে দেখা নয়নে ?
লুকিয়ে সে বসে আছে জীবনে কোন্ গোপনে ?
যখন থাকি আপন মনে,
কয় সে কথা ক্ষণে ক্ষণে;

তার সকল ভাষা বুঝতে নারি,
কী ভাষা তার কে জানে ?"...

"কে তুমি ঘুম ভাঙায়ে, কেন মোরে,
ডাকিলে গো এ আঁধারে ?
স্বপ্নে যারে চেয়েছিনু
সে বুঝি চাহে আমারে।
কেন তবে দাও না ধরা ?
কেন খোঁজাও সারা ধরা ?
কেন বাজাও মন-হরা ?
ও মুরলী বারে বারে ?"...

"আমারে এ আঁধারে
এমন করে চালায় কে গো ?
আমি দেখতে নারি, ধরতে নারি,
বুঝতে নারি কিছুই যে গো ?
নয়নে নাহি ভাতি,
মনে হয় চিররাতি,
মনে হয় তুমি আমার চিরসাথি ;
একবার জ্বালিয়ে বাতি, ঘুচিয়ে রাতি
নয়ন ভরে দেখা দে গো।"...

তারপর হৃদয়ের গভীরে ডুব দিলেন অরূপরতনের আশায়, কুড়িয়ে পেলেন পরশমণি। তার স্পর্শে সকল অভাব, বেদনা ও দুঃখবোধ দূর হয়ে দেখা দিল সমর্পণের প্রবল বাসনা ও তারই ভেতর দিয়ে লাভ করলেন পরম শান্তি, পরমানন্দ। গাইলেন :

"তোমায় ঠাকুর, বলব নিঠুর কোন মুখে ?
শাসন তোমার যতই গুরু, ততই টেনে লও বুকে।"...

"কি আর চাহিব বল, হে মোর প্রিয়,
তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।"...

"আমারে ভেঙে ভেঙে করো হে
তোমার তরী"...

বিশ্বাস ও নিবেদনের পর কবি শান্ত মনে গেয়েছেন :—

"বিধি, আর তো তোমারে নাহি ডরি।
আমি পেয়েছি অকূলে আজি তরী।"...

শেষে ঈশ্বরের ওপর অপার আস্থায় উৎফুল্ল হয়ে গেয়ে উঠেছেন :—

"তুমি গাও, তুমি গাও গো।
গাহো মম জীবনে বসি, বেদনে বাঁধা জীবনবীণা
ঝংকারি বাজাও গো।—
তুমি গাও।"...

জীবনে আঘাত পেলেও অতুলপ্রসাদ কখনো দিশেহারা হয়ে পড়েন নি। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অটুট বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তি তাঁকে সকল দুঃখ অতিক্রম করে মহৎ পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, শান্তি দিয়েছে, সান্ত্বনা পেয়েছেন।

•

১৯৩৩ সালে মে মাসে অতুলপ্রসাদ তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় কার্শিয়াং রওনা হলেন।

তিনি সেখানে পেঁছিলে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। তাঁর ভবন লোকসমাগমে, গানে গল্পে উচ্ছল হয়ে ওঠে। সকলের অনুরোধে ঐ স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি সারাদিন গান শোনাতেন। মাঝে মাঝে সকলকে নিয়ে একসঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া করতেন।

ঐ সময়ে বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর সদলবলে কার্শিয়াং আসেন এবং অতুলপ্রসাদের সঙ্গে পরিচিত হন। অতুলপ্রসাদের আমন্ত্রণে উদয়শংকর স-শিষ্য তাঁর ভবনে আসেন। তারপর গানে-গল্পে-আলোচনায় কয়েক ঘণ্টা কোথা দিয়ে শেষ হয়ে গেল কেউ বুঝতেই পারলেন না।

ভূরিভোজনের পর সকলে বিদায় নিলেন। অতুলপ্রসাদের গান ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে উদয়শংকর বিমোহিত হলেন।

কার্শিয়াংয়ে থেকে শরীরের কিছুটা উন্নতি হল। লখনৌয়ে ফিরে এসে আবার কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

খোঁজ নিলেন, পূজা সংখ্যা 'উত্তরা' কেমন হবে, তার জন্য কি ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি তাঁর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি আশা করেন। সভাসমিতি থেকেও সেনসাহেবের ডাক আসে। তিনি তাদের নিরাশ করতে পারেন না। ডাক আসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও। ভাইস-চ্যান্সেলর ডাঃ পরাঞ্জেপে তাঁর বন্ধু। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিষয় নিয়ে তাঁদের গভীর আলোচনা হয়। তাঁর উৎসাহ থেকে রাজনীতিও বাদ যায় না। তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই সরব এবং জটিল। গোল টেবিল বৈঠকের পর দেশবাসী অশান্ত হয়ে উঠেছে এবং নেতারা চিন্তিত। কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারের বার বার সংঘর্ষ হচ্ছে, নেতারা কারারুদ্ধ হচ্ছেন। অপরদিকে বিপ্লববাদীরা অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছেন। অবস্থা বুঝে ১৯৩২-এ তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ভাবী শাসনব্যবস্থার এক ফিরিস্তি প্রকাশ করলেন। তার ভাঁওতা বুঝতে নেতাদের দেরি হল না। পরের বছর প্রকাশ হল কুখ্যাত 'হোয়াইট পেপার'। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হল। প্রত্যেক পার্টি তার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনায় মুখরিত হয়ে উঠলেন। বলা বাহুল্য লিবার‍্যাল পার্টিও বাদ গেল না।

॥ সাতষট্টি ॥

গোরক্ষপুর থেকে ফেরার পর অতুলপ্রসাদের স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হল। একদিন হঠাৎ তাঁর বাঁ দিক অবশ হয়ে গেল, ঝিম ঝিম করতে লাগল। তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। ডাক্তার ভিয়াসকে খবর দেওয়া হল। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে রক্তের চাপ এখন খুবই উর্ধ্বমুখী। তিনি ওষুধপত্তর দিলেন।

অতুলপ্রসাদ একটু সুস্থ হলে ডাক্তার ভিয়াস তাঁকে সমুদ্রের ধারে গিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দিলেন। তাঁর শরীর এখন খুব দুর্বল।

তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে কিরণ কলকাতা থেকে লিখলেন, দাদা তুমি কলকাতায় চলে এসো। ডাক্তার নীলরতনের চিকিৎসায় তোমার খুব উপকার হয়।

সত্যদাদা লিখলেন, চাঁদপুরে চলে এসো, এখানে তোমার শরীর ভাল হয়ে যাবে।

অতুলপ্রসাদ উপস্থিত কলকাতা যাওয়াই স্থির করলেন।

রাধাকুমুদ লখনৌ থেকে তাঁর সংগে কিছুদূর অব্দি গেলেন। প্রতাপগড় স্টেশনে নামবার আগে শ্রান্তক্লান্ত অতুলপ্রসাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে শিউরে উঠলেন। শংকিত মনে তিনি ভাবলেন আবার দেখা হবে তো।

অতুলপ্রসাদ নিরাপদে কলকাতায় কিরণের বাড়ি এসে পেঁছিলেন। ডাক্তার নীলরতনের চিকিৎসা সংগে সংগে আরম্ভ হয়ে গেল। এখানে এসে তিনি সত্যদাদার চিঠি পেলেন, উত্তরে তাঁকে লিখলেন :—

আমার পরম আপন দাদা,

কিরণের বাসায় তোমার স্নেহপূর্ণ চিঠিখানি পেলাম। আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু বলি। দু-মাস পূর্বে আমার ব্লাডপ্রেশার খুব বেশি ছিল, ২৩৫ হয়েছিল। বড় দুর্বল ও রোগা হয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন বাঁদিকটা অবশ ও ঝিমঝিম বোধ হয়েছিল, সেটা এখনও সারে নি। সেই জন্যে এখানে এসেছিলাম। স্যর নীলরতন সরকার এবং অন্যান্য ডাক্তারেরা দেখেছিলেন। এসেই ইউরিন একজামিন করিয়েছিলাম তাতে সামান্য albumen ও cast পাওয়া গিয়েছিল। একেবারে প্রায় শুয়েই ছিলাম ৩।৪ সপ্তাহ। শুধু ফল খাচ্ছিলাম আর দুধ, দই, কিছু খই আর একবেলা সব্জি কিছু নুন না দিয়ে খাচ্ছিলাম। দুধ দই কিছু খাই। গত দুবারেও albumen ও cast পাওয়া যাচ্ছে না। দুর্বলতা কমেছে। বাঁদিকে যে অবশ ও রানো ভাব ছিল, তা সামান্য কমেছে। হাঁটতে কষ্ট হয় না। তবে হাতে ও পায়ে আড়ষ্ট ও জ্বালা-জ্বালা ভাব এখনও আছে, একটু কম। ওজনে খুব কমে গিয়েছিলাম এখন সামান্য বেড়েছি। দুমাস কাজ ছেড়ে আছি। এখন আর চলে না। ডাক্তারেরা বলেছেন খুব light কাজ করতে পারি। তবে খাওয়া সম্বন্ধে খুব সাবধানে থাকতে হবে। আমি পরশু লখনৌ ফিরে যাব। তাই এখন এ অবস্থায় চাঁদপুর যাওয়া হবে না। ভবিষ্যতে যাওয়ার ইচ্ছে রইল। সেখানে কি নদীর ধারে বাড়ি পাওয়া যাবে? এখন তো আবার ঝড়-বৃষ্টির সময় এসে পড়ল। চাঁদপুর কোন সময়ে স্বাস্থ্যকর ও সুবিধাজনক? লখনৌয়ে জানিও। ভাল কথা, এখন প্রায় ১½ মাস থেকে ব্লাডপ্রেশার ১৮০ থেকে ১৯০-তে স্থির হয়ে আছে। ১৮০ আমার প্রায় নর্মাল অনেক দিন থেকে। আমার হেল্থ-এ কোন দোষ নাই। কিডনি প্রায় সেরেছে, মাথাটা মাঝে মাঝে খুব গরম হয়। আবার সেরে যায়। আমি যখন ফিরে যাব

তখন রমারা হয়ত আসবে। বেশ, দেখা হবে। আশা করি বৌঠান ও তোমরা সকলে ভাল আছ। সকলে আমার ভালবাসা নিও। ইতি—

তোমার স্নেহের ভাই

এই সময়ে একদিন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় এলেন। উঠলেন ধূর্জটিপ্রসাদের কাছে। আমলকীর মোরব্বা নিয়ে অতুলপ্রসাদের সংগে দেখা করতে গেলেন। তিনি আমলকীর মোরব্বা পেয়ে খুব খুশি হলেন।

তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ নেবার পর খাওয়া-দাওয়া কি চলছে জিজ্ঞাসা করলে রসিক ব্যক্তি অতুলপ্রসাদ হাসি টেনে বললেন, 'ডারউইন' লোকটা ঠিক ধরেছিল, দেখুন না, ফল খেয়ে বেশ আছি, একটু বল পেয়েছি, সকাল-বিকেল একটু বেড়াতে পারছি।'

কলকাতা থেকে আবার লখনৌ ফিরে এলেন। তাঁর গুণমুগ্ধরা তাঁকে কাছে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিলেন।

ডাক্তারদের পরামর্শমত অতুলপ্রসাদ কোর্টে গিয়ে অল্প সময় থাকেন, হালকা কাজ করেন। কিন্তু সে আর কদিন। তাছাড়া তাঁর কাছে লোক আসা-যাওয়ার বিরাম নেই, তাঁদের নানা আবদার, ফলে তাঁকে এখানে ওখানে যেতে হয়। এর ওপর আড্ডা, গান তো আছেই।

এই সব কারণে অতুলপ্রসাদের স্বাস্থ্যের ক্রমশই অবনতি ঘটতে লাগল। ডাক্তারদের পরামর্শে আংশিক বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বাধ্য হলেন। কাজকর্ম বন্ধ, চিকিৎসার কোন ত্রুটি নেই কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থা আত্মীয়বন্ধুর চিন্তার কারণ হয়ে উঠল। অবস্থা দেখে ডাক্তার ভিয়াসের পরামর্শে তিনি সমুদ্রের ধারে কিছুকাল বাস করা স্থির করলেন।

অতুলপ্রসাদ পুরী যাবেন। ওখানে গেলে উপকার পান। তবে তার আগে কলকাতায় ডাক্তার নীলরতনকে দিয়ে আর একবার পরীক্ষা করাতে চান।

হেমন্তনিবাসে তাঁর কাছে প্রতিদিন কতলোক আসেন, স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন। সবাই শুনলেন সেন সাহেব পুরী যাচ্ছেন। জগৎনারায়ণ মোল্লা, বিশ্বেশ্বরনাথ শ্রীবাস্তব, গোকরণ মিশ্র শুনে সন্তোষ প্রকাশ করলেন; বললেন, ভালই, সুস্থ হয়ে ফিরে আসুন।

পুরী যাবেন কিন্তু হাতে টাকা নেই। নিজের রোগের জন্য খরচ, সংসারের

জন্য খরচ আবার দানধ্যানও সমানে চলে। তাঁর দানের পরিধি বিরাট অথচ শরীরের জন্য এখন অর্থাগমের পথ বন্ধ।

সেণ্ট্রাল ব্যাংক থেকে আট হাজার টাকা ওভারড্রাফ্‌ট্‌ নিলেন।

তিনি যেদিন পুরী যাবেন দলে দলে লোক দেখা করতে এলো। হিন্দুরা তাঁর নীরোগ কামনা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন, মুসলমানেরা সেন সাহেবের স্বাস্থ্য কামনা করে আল্লার কাছে দোয়া ভিক্ষা করলেন।

পুত্র দিলীপকুমার, প্রভা ও তাঁর কন্যা কুন্তলাকে নিয়ে চারবাগ স্টেশনে এলেন। সেখানে এসে ড্রাইভার জয়চাঁদ বিনীত প্রার্থনা জানাল, তার কিছু টাকা চাই। বড় দরকার। কি দরকার তা অতুলপ্রসাদ শুনলেন এবং তার গুরুত্ব বুঝে তাকে ঐ আট হাজার টাকা থেকে পাঁচশো টাকা দিয়ে দিলেন।

জয়চাঁদ কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ল। হেমন্তকুমার, মুবাশীর হোসেন এবং আরো অনেকে এ দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখলেন।

পুরী যাবার পথে কলকাতায় কদিন থাকার পর দাদাকে চিঠি লিখলেন—

Calcutta
13. 4. 34

দাদা,

তোমার পি-সি পেয়েছি। আমি পরশু পুরী যাচ্ছি। সেখানে একটি ছোট বাড়ি নিয়েছি। ছুটকি, কুন্তলা ও দিলীপ আমার সংগে যাচ্ছে ও থাকবে। একা থাকব না। পুরী শুনেছি ব্লাডপ্রেশারের জন্যে ভাল। এখন ব্লাডপ্রেশার কম আছে। বাড়ির ঠিকানা সেখানে গিয়ে তোমাকে জানাব।

তোমরা আমার ভালবাসা নিও।

তোমার ভাই অতুল

পুরীর ঠিকানা :—

রায়বাহাদুর মহেন্দ্রলাল মিত্রর কুঠী

পাথরপুরী

১৯৩৪-এর ১৫ই এপ্রিল অতুলপ্রসাদ পুরী যাত্রা করলেন। এ সময়ে পুরীর আবহাওয়া মন্দ নয়, মাঝে মাঝে গরম বোধ হয় কিন্তু বেশির ভাগ সময় হু হু করে হাওয়া বয়; সমুদ্রের ধারে সর্বদাই যেন ঝড় তুফানের লক্ষণ।

অতুলপ্রসাদ বিশ্রামের জন্য এখানে এসেছেন, যতটা পারেন বিশ্রাম নেন।

সকাল-বিকেল প্রভা, দিলীপ, কুন্তলাকে সংগে নিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যান। ভোরবেলা সূর্যোদয় দেখেন, নীল জলের ভেতর থেকে যেন বিরাট এক লাল টুকটুকে ফুলের কুঁড়ি ভেসে উঠছে; তার রঙের আভায় আকাশ লালে লাল, সমুদ্রের নীল জলে তারই প্রতিবিম্ব। সে দৃশ্য দেখতে দেখতে দেহমনের সব শ্রান্তি-ক্লান্তির নিরসন হয়।

তারপর সমুদ্র স্নান। নুলিয়ার হাত ধরে অকূল সিন্ধুতে একটি বিন্দুর মত ডুবে ডুবে স্নান করা, লক্ষ লক্ষ ঢেউ কলহাস্যে যেন তলিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

আবার বিকালে সমুদ্রের ধারে সুসজ্জিতা স্ত্রী ও পুরুষের মেলা, সব ভ্রমণকারীর দল। আকাশও একটু পরে সোনালি শাড়ি জড়িয়ে লাল কুমকুমের টিপ পরে যেন হাসতে থাকে। এরপর রোগ-শোক-গ্লানি-অবসন্নতা সব দূর হয়ে যায়।

অতুলপ্রসাদ খবর পেলেন যে লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পুরীতে এসেছেন, বি. এন. আর. হোটেলে আছেন।

লখনৌয়ের লোককে পুরীতে দেখতে পাবেন এই সংবাদে অতুলপ্রসাদ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তীও জানলেন সেন সাহেব এখানে এসে কোথায় আছেন। একদিন সস্ত্রীক তাঁর সংগে দেখা করতে এলেন।

রাধাকুমুদ পুরীতে এলেন এবং সেন সাহেবের সংগে দেখা হল। তাঁর স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি দেখে রাধাকুমুদ আশ্বস্ত হলেন; মুখে সন্তোষ প্রকাশও করলেন।

অতুলপ্রসাদের পরিচয় এর মধ্যে পুরীতে জানাজানি হয়ে গেছে। তাঁর গান শোনার আবদার নিয়ে অনেকে তাঁর কাছে আসেন। সমুদ্রবেলায় তারা তাঁকে যেন মক্ষিকার মত ঘিরে ধরেন। তিনি কাউকে না বলতে পারেন না, গান শোনান।

ইতিমধ্যে কিরণও এসে গেছেন। আসর, বৈঠক থেকে এবার ডাক আসতে দেখে কিরণ, প্রভা দুজনেই প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। অতুলপ্রসাদ তাঁদের আশ্বস্ত করেন, বেশি গান গাইব না। তাড়াতাড়ি চলে আসব।

সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধী পুরীতে এলেন। অতুলপ্রসাদের তিনি পরম শ্রদ্ধার পাত্র। গান্ধীজী ইতিপূর্বে অতুলপ্রসাদের গান শুনেছেন। এখন তিনি পুরীতে আছেন জেনে গান্ধীজী তাঁকে গান শোনাবার জন্য আহ্বান জানালেন। অতুলপ্রসাদ সে আহ্বান পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হলেন। তাঁর রচিত 'কে

আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জবনে' গানটি গান্ধীজীর বড় পছন্দ। অতুলপ্রসাদ ঐ গানটি হিন্দীতে অনুবাদ করে গান্ধীজীকে গেয়ে শোনালেন।

গান্ধীজী শুনে মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর গানের অজস্র প্রশংসা করলেন।

দেড় মাস পুরীতে কাটিয়ে অতুলপ্রসাদ প্রথমে কলকাতা ও পরে লখনৌ ফিরে এলেন। সংগে দিলীপকুমার। আরো কিছুদিন থাকতে পারলে ভাল হত, কিন্তু কাজের মানুষের পক্ষে দীর্ঘ বিশ্রাম যেন বিরক্তিকর; তাছাড়া টাকারও প্রয়োজন।

তাঁকে লখনৌয়ে ফিরে পেয়ে সহকর্মী, বন্ধু, ভক্ত সকলেই খুব খুশি; তিনি না থাকলে লখনৌ যেন অন্ধকার।

তাঁর প্রত্যাবর্তনের খবর পেয়ে কাশী থেকে সুরেশ চক্রবর্তী এলেন দেখা করতে; 'উত্তরা' সম্বন্ধে আলোচনা করা চাই; তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ চাই!

অতুলপ্রসাদকে দেখে তিনি বেশ নিরাশ হলেন। বলেও ফেললেন, আপনার শরীর তো খুব সারে নি মনে হচ্ছে। আরো কিছুদিন পুরীতে থাকলেন না কেন?

তিনি ম্লান হেসে জবাব দিলেন, আমার কি আর বসে থাকলে চলে সুরেশ! কত লোক আমার ওপর নির্ভর করে বসে আছে, চারিদিকে কত-ও প্রয়োজন। ···টাকার এখন আমার বড় দরকার সুরেশ, আমায় এখন অনেক্‌দিন বাঁচতে হবে, অনেক টাকা উপায় করতে হবে।

অতুলপ্রসাদের আগমনের সংগে সংগে 'হেমন্তনিবাস' আবার আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠল। আবার গান, গল্প, আড্ডা, ভুরিভোজন চলতে লাগল। পরামর্শ নিতে আসছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, লিবার‍্যাল পার্টির সদস্যরা, সমিতি, সংস্থা, আরো কত। অতুলপ্রসাদ কারুর একার নন, তিনি সবাকার।

॥ আটষট্টি ॥

২৫শে আগস্ট সকালবেলা অতুলপ্রসাদ প্রাতর্ভ্রমণে বেরুলেন। কি মনে করে কে জানে এ. পি. সেন রোডে যত পরিচিত প্রতিবেশী আছেন সবার সংগে দেখা করতে গেলেন। প্রথমে গেলেন হেমন্তকুমারের বাড়ি। সবার শেষে

গেলেন রাধাকৃষ্ণ শ্রীবাস্তবের বাড়ি। শ্রীমতী শ্রীবাস্তব সেন সাহেবকে গরম দুধ, বিস্কুট খেতে দিলেন।

একটু পরে হেমন্তকুমার অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। দেখলেন অতুলপ্রসাদ মাথায় ছাতি দিয়ে, হাতে কাঁচি নিয়ে তাঁর প্রিয় গোলাপ বাগানের তদারক করছেন, মালীকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

এরপর পড়ার টেবিলের সামনে এসে বসলেন। আগামী সোমবার একটি দরকারি কেস আছে। জুনিয়র মুবাশীর হোসেন উপস্থিত ছিলেন। কেসটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং নির্দেশ দিলেন।

তিনি বিদায় নিলে এলাহাবাদে একজন পরিচিত মহিলার চিঠির উত্তরে লিখলেন :

"আমি যাবার আগে কাউকে যেন কষ্ট না দিই, ও নিজে না কষ্ট পাই—এই কামনা করি।"[১]

মিস্টার টমাস জজপদে নিয়োজিত হয়েছেন। এইদিন সন্ধ্যেবেলা বার এ্যাসোসিয়েশন্ থেকে তাঁকে ডিনার্ পার্টিতে সংবর্ধনা জানানো হবে স্থির ছিল। আরো স্থির ছিল যে অতুলপ্রসাদ সেখানে পৌরোহিত্য করবেন।

অতুলপ্রসাদ ছোটখাট ব্যাপারে কখনো লিখে বক্তৃতা দিতেন না, প্রস্তুতি ব্যতীত মুখে বলে যেতেন। কিন্তু সেদিন পার্টিতে কি বক্তৃতা দেবেন তা লিখতে বসলেন। আরাম কেদারায় বসে শুধু এতটুকুই লিখলেন, "He is one of us—" মনে হয় ভেতরে ভেতরে অসুস্থ বোধ করছিলেন তাই যা বলতে চান তা লিখে রাখছিলেন। তবে শরীর বেশি খারাপ বোধ হওয়ায় তখনকার মত লেখা স্থগিত রেখেছিলেন। লিখিত কাগজটি পরে তাঁর আরাম কেদারার পাশে পাওয়া যায়। টেবিলের ওপর একটি অটোগ্রাফের খাতা ছিল, তাঁর স্বাক্ষর সংগ্রহের মানসে কেউ হয়তো রেখে গিয়েছিল। উনি সেটিতে স্বহস্তে লিখে দেন :

"যে জন রহিতে চায় নিজ রুদ্ধ ঘরে
হারানিধি নিরবধি সেই খুঁজে মরে।"

বেলা বারোটায় দিলীপকুমার এলে তাঁকে স্নান করে নিতে বললেন। তারপর কোনও বিষয় আলোচনা করতে করতে পিতা-পুত্র খেতে বসলেন। কয়েক

১—পারুল দেবী—কবি অতুলপ্রসাদ।

চামচ খাবার পর অতুলপ্রসাদের হাত থেকে হঠাৎ চামচ মাটিতে পড়ে গেল। তারপর তিনি চেয়ারের ওপর লুটিয়ে পড়লেন।

হেমন্তকুমার সেদিন বাড়িতেই ছিলেন। দিলীপকুমার ছুটে গিয়ে তাঁকে ডেকে আনলেন। তিনি এসে অর্ধ-অচৈতন্য অতুলপ্রসাদকে ধরাধরি করে তাঁর পালংকে এনে শুইয়ে দিলেন। পাশেই ডাক্তার সেনের বাড়ি। তাঁকে খবর দিয়ে আনান হল।

বেলা দুটো আড়াইটে নাগাত ডাক্তার ভিয়াস এলেন; নার্স আনা হল। 'ভিজিটার্স নট অ্যালাউড' লিখে বোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হল। হিরণ তখন বিলেতে, কিরণ নৈনীতালে ও প্রভা কলকাতায়। তাঁদের সবাইকে খবর পাঠান হল।

'সেন সাহেব অসুস্থ' এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সংগে সংগে সারা লখনৌ শহরে হৈ হৈ পড়ে গেল; নানা সম্প্রদায়ের জনস্রোত জলস্রোতের মত হেমন্তনিবাসের দিকে ছুটল। সকলেই তাঁদের প্রিয় সেন সাহেবকে, ভাইদাদাকে একবার দেখতে চান।

অতুলপ্রসাদের সহকর্মীবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা, লখনৌয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি সবাই হেমন্তনিবাসে উপস্থিত; সকলেই উৎকণ্ঠিত, আকস্মিক ঘটনায় স্তম্ভিত।

অবস্থার কোন রকম উন্নতির লক্ষণ না দেখে রাত আটটায় ডাক্তার হাণ্টারকে ডেকে আনা হল। কিন্তু তখন আর কিছুই করবার ছিল না।

অতুলপ্রসাদের অসুস্থতার খবর হেমকুসুম বিলম্বে হলেও পেয়েছিলেন। তিনি উৎকণ্ঠিত হলেও ব্যস্ত হন নি। এই তো কয়েকমাস আগে অতুলপ্রসাদ কতও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, আবার ভাল হয়ে উঠেছেন। এবারো তিনি ভাল হয়ে যাবেন। ডাক্তাররা আসছেন, সেবাযত্ন হচ্ছে খোঁজ পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। অসুস্থ মানুষ যথারীতি শুয়ে পড়েছিলেন।

ইংরেজী মতে ২৬শে আগস্ট রাত একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে গ্রহ তার কক্ষচ্যুত হল, লখনৌ শহরের বুকে অশনিপাত ঘটে গেল, একটি বিরাট এবং মহৎ প্রাণ এ মরজগৎ থেকে বিদায় নিয়ে সুরলোকে মহাপ্রয়াণ করলেন।

হেমকুসুম রাত দুটোর সময় হেমন্তনিবাসে ছুটে এলেন। তার আগেই তো সব শেষ হয়ে গেছে। খবর পেয়ে হেমন্তকুমার ছুটে এলেন। বললেন, সবই তো শেষ হয়ে গেছে, আপনি কষ্ট করে নেমে আর কি করবেন। অসুস্থ মানুষ,

ফিরে যান। কাল সকালে আসবেন। মর্মর মূর্তির মত হেমকুসুম স্থির, তাঁর নিথর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

রাতের অন্ধকার ভেদ করে তিনি ফিরে চললেন। কি নিবিড় অন্ধকার আজ তাঁকে ঘিরে ধরেছে! আজ যেন কোথাও আলো নেই, হাওয়া নেই, প্রাণ নেই। এ পৃথিবী কী শূন্য আর তিনি আজ কতও একা।...

সকাল হতে সারা লখনৌবাসী স্তম্ভিত হয়ে শুনল যে তাঁদের প্রিয় সেন সাহেব আর ইহজগতে নেই। সে খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা উত্তর প্রদেশে, বাংলা দেশে, সারা ভারতে। সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় অতুলপ্রসাদের চিত্রসহ দুঃসংবাদ প্রকাশিত হল—কবি, গীতকার, রাজনীতিবিদ, ব্যারিস্টার এ.পি. সেন আর ইহজগতে নেই।

আবার জনস্রোত বয়ে চলল হেমন্তনিবাসের দিকে। সকলেই হায় হায় করতে লাগলেন। কত লোক নীরবে অশ্রুপাত করতে লাগলেন।

অতুলপ্রসাদের মরদেহ সকালবেলা পত্রপুষ্পে সজ্জিত করে হেমন্তনিবাসের লন-এ এনে রাখা হল। প্রত্যেকে এসে তাঁকে শেষবারের মত দর্শন করতে লাগলেন। হেমকুসুমও এলেন এবং গাড়িতে বসেই অপলক নেত্রে অতুল-প্রসাদের মৃত মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন, চোখ দিয়ে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। একটু পরে তাঁর সংজ্ঞাহীন দেহ গাড়ির ভেতর লুটিয়ে পড়ল।

লখনৌয়ের মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে গোমতী নদীর ধারা; তার দুই তীরকে দানে ধন্য করে, সবুজ করে সমৃদ্ধ করে আপন লক্ষ্যে ছুটে চলেছে।

শহরের মাঝ দিয়ে আজ আরো একটি ধারা বয়ে চলেছে—জনতার ধারা; জনতা তাঁদের নেতা, বন্ধু, পরমপ্রিয় সেন সাহেবকে শেষ বিদায় দিতে চলেছেন—যিনি তাঁর মনের ঐশ্বর্য, সুষমা ও ভালবাসা দিয়ে লখনৌকে সুন্দর সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। শুধু কি লখনৌ, সারা উত্তর প্রদেশ তাঁর স্নেহধন্য, সারা ভারত তাঁর পরমপ্রিয়।

সর্বজনপ্রিয় অতুলপ্রসাদের মরদেহ কাঁধে নিয়ে চলেছেন মহম্মদ নাসীম, জগৎনারায়ণ মোল্লা, মিস্টার টমাস, বিশ্বেশ্বরনাথ শ্রীবাস্তব এবং আরো সকলে। সর্ব ধর্ম নির্বিশেষে এক বিরাট জনতার শোক মিছিল তাঁদের প্রিয়তম নেতাকে শেষ বারের মত অনুসরণ করে চলেছে, সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

"অতুলপ্রসাদের মুখমণ্ডল মৃত্যুর পরেও অম্লান, স্বাভাবিক। কি সুন্দর

মুখের শ্রী, যেন কিছুই হয় নাই—মহানিদ্রায় নিদ্রিত শান্ত-সমাধিস্থ আত্মা।··· সমবেত বিস্তর লোক—বিশেষ করে Chief Court, Judges Court-এর সব Judges, Magistrates এবং অন্যান্য সব কর্মচারি, উকিল, ব্যারিস্টার বোধ হয় আর কেউ বাকি ছিল না ঐ শবের অনুগমন করতে—এবং সকলেই একে একে কাঁধ দিতে লাগলেন অল্প সময়ের জন্য। পরে সেই শব Bengali Club-এ নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে কিছুক্ষণ রাখা হয় Main Hall ঘরে। পরে সকলে ধীর মন্থর গতিতে মশানের দিকে চলিতে লাগিলেন। সেই শবের সহিত কি হিন্দু কি মুসলমান—Judge, ব্যারিস্টার ইত্যাদি সকলেই নগ্ন পায়ে সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। অনেক দূর পায়ে হেঁটে যাবার পর ২।৪ জন যাঁরা নগ্নপায়ে কখনও চলেন না তাঁরা Car-এ করে ধীরে ধীরে পিছনে পিছনে আসতে লাগলেন। এই ভাবে তাঁরা সকলেই শ্মশান ঘাট পর্যন্ত পেঁছিলেন।

"দিলীপকুমার মুখাগ্নি করিবার পর প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রত্যেকে এক একটি কাষ্ঠখণ্ড প্রদান করিলেন। তাহার পরও কিছুক্ষণ থাকিয়া সকলেই সজল নয়নে যে যার গৃহে গমন করিলেন।"[২]

সেদিন কোর্ট-কাছারি, বিশ্ববিদ্যালয়, বার লাইব্রেরী, স্কুলকলেজ, হাট-বাজার সব বন্ধ থাকল; সারা শহর শোকের রূপ ধরে কর্মহীন, শুব্ধ।

বাংলা দেশ অতুলপ্রসাদের মৃত্যু সংবাদ শুনে মর্মাহত, রবীন্দ্রনাথ স্তম্ভিত। বলেছিলেন, "অতুলপ্রসাদের মৃত্যু আমি স্বীকার করি না, তিনি এক সুরলোক থেকে অন্য সুরলোকে গমন করেছেন।"[৩]

পরে ক্ষোভের সংগে বলেছিলেন, "আহা, এঁরা সবাই চলে গেলেন আর আমি পড়ে রইলাম"।[৪]

পড়ে রইল সেন সাহেববিহীন লখনৌ শহর এবং তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ ও ভক্তরা, এক বিরাট বেদনাদায়ক শূন্যতা তাঁদের ঘিরে রইল যার পূরণ হওয়া আর কখনই সম্ভব নয়।

সারা শহর যখন অতুলপ্রসাদের মহাযাত্রা অনুসরণ করে গোমতী নদীর দিকে এগিয়ে চলেছে তখন অক্ষম নিঃসংগ হেমকুসুম একা ঘরে নিঃশব্দে বসেছিলেন;

২—স্বামী দেবেশানন্দ মহারাজ—চিঠি।

৩—সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।

৪—সুবালা দেবী—"অতুলপ্রসাদ"।

দুচোখে অশ্রুর বিন্দু। ঠিক এই সময়ে পরিচিত এক খৃস্টান দম্পতি তাঁর কাছে এলেন। হেমকুসুম বিস্মিত হলেন। তাঁরা সান্ত্বনা-বাক্য বললে হঠাৎ হেমকুসুম অনুভব করলেন এ জগতে তিনি একেবারে একা নন। তারপরই অঝোরে কেঁদে উঠলেন।

তাঁর জন্য আরো আঘাত সঞ্চিত ছিল। অতুলপ্রসাদ উইলে যা ব্যবস্থা করে গেছেন তা জানা গেল। আত্মীয়-বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সাশ্রু নয়নে তিনি তাঁদের বললেন, শুনেছ উইলের কথা? তার জীবিত কালে জ্বলেছি, এখনো জ্বলছি। আমার কি করে চলে বল তো?

ইতিমধ্যে উত্তর প্রদেশে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁর জন্য শোকসভা হয় এবং তাঁর বিয়োগ ব্যথায় দুঃখিত হয়ে বহু ব্যক্তি ও সংস্থা দিলীপকুমার এবং হেমকুসুমকে শোকবার্তা পাঠান। লখনৌয়ে বহু ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দশদিন অশৌচ পালন করেন।

যথা সময়ে অত্যন্ত গম্ভীর পরিবেশে সুচারুরূপে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন সে অনুষ্ঠানে আচার্যের কাজ করেন।

"বোধ হয় ত্রয়োদশ দিবসে তাঁর স্ত্রী তাঁর বাংলোতে গরীবদের খাওয়াইয়াছিলেন ও কুষ্ঠরোগীদের আমার হাত দিয়া প্রত্যেককে আট আনা করিয়া দান করাইয়াছিলেন।"[৫]

॥ উনসত্তর ॥

ভগবান যাঁকে দুঃখ দেন তাঁকে সহ্য করবার শক্তিও দেন। হেমকুসুমের জীবন তো শেষ হয়ে এসেছে কিন্তু একমাত্র সন্তান দিলীপকুমারের সামনে রয়েছে তাঁর দীর্ঘ ভবিষ্যৎ। হেমকুসুম তাঁর জন্য চিন্তিত হলেন। তাঁর বসবাসের জন্য স্যর কে. জি-র দেওয়া পঁচিশ হাজার টাকায় ওয়াজির হাসান রোডে জমি কিনে বাড়ি তৈরী হতে লাগল।

৫—স্বামী দেবেশানন্দ মহারাজ—চিঠি।

নিঃসঙ্গ শোকতপ্ত হেমকুসুমের কাছে তাঁর গুণগ্রাহী আত্মীয়বন্ধুরা প্রায়ই আসতেন। সুধীন্দ্রচন্দ্র দাস, হেমন্তকুমার ঘোষ এবং তাঁদের পত্নীরা, ইন্দিরা রায়, জুবিলী কলেজের অধ্যাপিকারা, অনুগত অরুণপ্রকাশ, কমলাকান্ত, ডাক্তার ওদেদার-পুত্র, বেগম মমতাজ হোসেন, বেগম মুবাশীর হোসেন প্রায়ই আসতেন। গল্প-কথায়, বাড়ি তৈরীর আলোচনায় সময় কেটে যেত।

এমনি করে দিন, মাস, বছর কেটে গেল। ১৯৩৭ সালে হেমকুসুম অসুস্থ হয়ে পড়লেন; চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়ে মাথা কেটে যায় এবং তা বিষাক্ত গ্যাংগ্রিনে পরিণত হয়। ডাক্তার ভাটিয়া (বড়) অপারেশন করলেন কিন্তু তাতে কোন সুফল পাওয়া গেল না। হেমকুসুম দিন দিন নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগলেন।

অবশেষে দুরন্ত গ্রীষ্মের খর দাবদাহের দিনে তুষারের সুশীতল হাওয়ার মত মৃত্যু তাঁর শয্যা-পার্শ্বে এসে দাঁড়াল; জুন মাসের দু' তারিখে তার হিম-শীতল হাত হেমকুসুমের সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিয়ে তাঁর বিক্ষুব্ধ জীবনের অবসান ঘটাল; সব যন্ত্রণা, চিন্তা ও উৎকণ্ঠার এবার চিরদিনের মত শেষ হল।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

অতুলপ্রসাদের মৃত্যুতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সংস্থা থেকে পুত্র দিলীপ-কুমারকে পাঠান শোকপত্রের কয়েকটি :

"Uttarayan"
Santiniketan
Birbhum

কল্যাণবরেষু,

তোমার পিতাকে আমি পরমাত্মীয় বলেই জেনেছি। অকস্মাৎ তিনি চলে গিয়ে আমার অন্তরঙ্গ প্রিয় বন্ধুশ্রেণীতে যে শূন্যতা ঘটল সে আমার কাছে গভীর বেদনার কারণ।

ভগবান তোমাদের সকলকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিন এই আমার কামনা। ইতি—১২ ভাদ্র ১৩৪১

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা জোড়াসাঁকো
বৃহস্পতিবার

কল্যাণবরেষু,

তোমার আমন্ত্রণলিপি পাইয়াছি—তোমার পিতার মৃত্যুতে একজন সুহৃদ ও সুকবি, সুগায়ক হারাইলাম। জানি না—কি বলিয়া তোমাদের সান্ত্বনা দিব।

সকল যন্ত্রণার যিনি সান্ত্বনা সেই শান্তিদাতা শান্তি আনুন এই কামনা করি।

তোমারি
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

19 Albart Road
Allahabad
3rd. Sept. 1934

My dear Mr. Sen,

I was very sorry to hear of the death of your father. He & I had been known intimately to each other for over thirty years & I always held him in the highest possible esteem not merely as a lawyer of eminence but as a public man whose patriotism no one could challenge & whose spirit of self-sacrifice was abundantly plain to everyone. One of the most sweet-tempered man he had in him the rare gift of making friends & maintaining friendship unimpaired by any honest difference of opinion. I do not think the void left by his death at Lucknow & in these Province can easily be filled.

Your Sincerely
Tej Bahadur Sapru

19, Edmonston Road
Allahabad
3. 9. 34.

My dear Dilip Kumar,

May I offer my humble tribute to the memory of your revered father. His death will long be mourned, he was a great gentleman and kindman. which he showed to us recently at Puri will long be remembered by us. May his soul rest in peace and may you be granted the fortitude to bear your great sorrow.

Your Sincerely
K. N. Katju

Nabanatyamandir
49/3/3 Cornwallis St.
Calcutta, 28. 8. 1934

Dear Mr. Sen,

I should be failing in my duty if I did not condole you on the occasion of your sad loss.

Your. father loved me and I honoured him. I shall not easily forget him.

Your very Sincerely
Sisir Kumar Bhadury

Sevashrama
Benares Cantt.
Aug. 28. 1934

My dear Mr. Chintamany,

I am shocked to read in the Leader that has come today, that Mr. A. P. Sen has passed away... I regret I know no member of his family personally ; and I shall be oblised if you would kindly convey to them my condolences in their grievous bereavement.

...You will please also accept my sympathies for the Liberal Association which has lost in him a stalwart supporter.

With respectful regards,

Your Sincerely
Sri Prakasa

Condolence message by C. Y. Chintamani

It was one of the privilleges of my life to know Mr. A. P. Sen intimately for more than a century. I rarely came across a better man. His genius for friendship, the strength of his attachments, his deep seated love for country and his anxiety to serve were accompanied by a keen intelligence, versatile talent and many sided interests. "Love and service"—the motto given by Ananda Mohan Bose to his countrymen as President of the Madras Congress in 1898—was acted upto by A. P. Sen as nearly as it is possible for most men to do. In his death his host of friends (among whom it was my good fortune to be included), the city of Lucknow and the U. P. have sustained a severe loss, which I fear it will take years to repair. Personally, I am immensely the poorer for A. P. Sen is not.

Condolence Meetings

On Monday (27.8.34) morning both the Bench and the Bar of the Oudh Chief Court united in paying tribute to the memory of late Mr. A. P. Sen. Hon'ble Chief Justice Mr. B. N. Srivastava said :

On behalf of myself and my brother judges I associate myself...

He was fearlessly independent, but always moderate in his counsels and in his action. He won the high place which he occupied at the Bar by sheer dint of merit and honest work. He was a man of high principle. He was a clean fighter and a very fair advocate. The judges could always implicitly rely on statements made by him. I feel that his death has created a

void in the ranks of the Oudh Bar which it would be very difficult for you to fill up for many years to come.

I feel his death is a keen personal loss to me. I joined the Lucknow Bar about the same time when he started practice. I learnt very soon to love and respect him. For about twenty five years we have been on relations of intimate and loving friendship. He was really one of my dearest friends in Bar...

In view of the unique position which he occupied at the Bar I would presently order that the Chief Court and all the Subordinate Civil Courts in Lucknow be closed for the day.

At the Condolence Meeting of the Lucknow University Executive Council Dr. R. P. Paranjpye—Vice Chancellor said :

During the two years of tenure of his office the Speaker had benefited by the uniformaly sound advice and faultless judgement of Mr. A. P. Sen in matter of University Administration... Mr. Sen has consistently maintained the high tradition of his profession.

As a politician Mr. Sen was respected for his sound knowledge and judgement even by parties whose political creed radically differed from him. The Speaker came into intimate contact with him in 1924 during the session of the U. P. Provincial Liberal Conference and was struck by his political sagacity and forsight. The late Mr. Gokhale had the highest respect for Mr. Sen.

The late Mr. Sen was not only an eminent lawyer, educationist and a politician, he was renowned poet. He proved the truth of the old age : "Let me make the ballads of a nation and I do not care who makes its laws". In Bengal Mr. Sen will

always be remembered as a great poet whose songs and lyrics will always be sung in the remotest of villages of Bengal.

So far as University was concerned it had sustained a loss which could not be adequately replaced in near future.

A public meeting of the citizens of Lucknow was held on Thursday under the Presidentship of Dr. Jagat Narain Mulla

Dr. Jagat Narain was visibly moved and tears trickled down his wrinkled cheeks when in a deep voice speaking with emotion he made a reference to the death of Mr. Sen. He had confidently expected that Mr. Sen would be among his pall-bearers but fate had willed it otherwise. The people had met in this hall under the shadow of Mr. Sen's death. Mr. Sen was the chief citizen of Lucknow. The speaker had known Mr. Sen for forty years and he could say without any fear of contradiction that Mr. Sen had been the central figure in the social, political and in other spheres of corporate activities of the city.

Generous to a fault Mr. Sen was as unassuming as he was honest. His charity knew no bounds. The poor and the destitute never returned empty handed from his house. There were not a single institution in the city which had not benefited by his munificence. Of a cheerful disposition Mr. Sen was never known to frown. Even after the death had stilled his generous heart the same ever-present smile was playing on his parted lips.

Resolution :

Mr. Sen was dead but his memory would always be cherished by the citizens of Lucknow. He then called upon Mr. C. B. Gupta to move the following condolence resolution :

The citizen of Lucknow assembled in this meeting to express their profound sense of sorrow at the sudden demise of Mr. Atul Prasad Sen, who by the many qualities of his head and heart and manifold services in diverse spheres—as a politician, as a social worker, as a poet, as a promoter of music and all fine arts and as a leader—occupied pre-eminent position in the Province and whose services in this direction will ever be remembered by his countrymen...

Syed Zahur Ahmad who had worked with Mr. Sen for thirty years seconded the resolution.

Other speakers were Sir Wazir Hussain, Mr. B. N. Srivastava etc.

লখনৌ মিউনিসিপ্যাল পার্কে ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে অতুলপ্রসাদের একটি মর্মর মূর্তি লখনৌ নগরবাসী স্থাপনা করেন। সেই মর্মর মূর্তির পাদদেশে লেখা আছে ঃ

To

The memory of A. P. Sen Poet, Patriot, Lawyer, Philanthropist who gave his loving services to all spheres of Life and Society.

Erected by
Friends

20th Oct. 1871
26th Aug. 1934

"দিল বঙ্গ বীণাপাণি অতুলপ্রসাদ
চিত্ত জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ।"

—রবীন্দ্রনাথ

এই উপলক্ষে উত্তর প্রদেশের তৎকালীন রাজ্যপাল সরোজিনী নাইডু নিম্নোক্ত বাণী প্রেরণ করেন ঃ

"I deeply regret that I have sustained an injury to my leg and hence must forgo the pleasure of unveiling the marble bust of my old and dearly valued friend, Atul Sen. I do not remember a time when I did not know him or love his exquisite Bengaly poetry. He choosed law for his bread, but poetry was his narcissus flower, food for the soul, which fulfilled, as it is said in the Hadis, an injunction of the Prophet Mohammad who said—"If thou hast two loaves and, go and sell one for the flower of the narcissus, for bread feeds the body, but the flower of the narcissus is food for the soul."

Atul Sen's genius for...and not only talent had the authentic lyric note which moved deeply into the hearts of all who heard his songs. He had the gift of poignant and beautiful words, in which he interpreted the most profound and subtle emotions and experiences of his soul. There are and will be many lawyers in the world, but only one Atul Sen, the poet, who has ensured his own immortality through the medium of his lovely lyric genius............

অতুলপ্রসাদের ডায়েরী

[গীতিকার ও কবি অতুলপ্রসাদের ডায়েরীর মলাটের ভেতরের দিকে ডাক্তার জ্যোতি-লালের ঠিকানা রয়েছে যিনি ১৯২৫ সালে কবি-পত্নীর চিকিৎসা করেছিলেন।

[ডায়েরীর প্রথম পাতায় যা লেখা আছে তা জীবন কাহিনীর ৯৪ পাতার পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

[এরপর কয়েকটি পাতা বাদ দিয়ে গান লিখেছেন। বিভিন্ন ঋতুর ওপর রাগ ও তার বর্ণনাসহ গান লিখেছেন। কোনটি অসমাপ্ত ; প্রথম গান যেমন :]

গ্রীষ্ম

হরশিবশঙ্কর, রাগ ভৈরব (দৃশ্য প্রভাত, গ্রীষ্মকাল) (গিরিশৃঙে আসীন শিব, ব্যাঘ্রচর্ম, শূলপাণী, ফণীজটা)

ভৈরব রাগিণী—(রাগ ভৈরব)

প্রভাতকালে তুলিব ফুল,
খুঁজিব ফুল্ল তরুর মূল।
তুলিব বেলী, যুথী, চামেলি—
সৌরভে হবে মন আকুল।
তুলিব জবা বরণ অতুল।

রামকেলী (রাগ ভৈরব)

আজি ভুলিবে ভোলা শুনি
নিদাঘ প্রভাতে রামকেলী রাগিণী
শুনিবে সে গীত উদ্দাম ছন্দে
নাচিবে তাতা থৈ থৈ
তাতা থৈ শূলপাণী।

ব্র্যাকেটের [ ] ভেতরের লেখাগুলি লেখিকার।

পরিশিষ্ট

সিন্ধু রাগিণী (রাগ ভৈরব)

হে হর ভৈরব তব পদভঙ্গে
সিন্ধু হৃদয় আজ ভরিবে তরঙ্গে
মম নীল অঞ্চল অতিশয় চঞ্চল
কম্পিত দেহমন নবরসরঙ্গে
সিন্ধু নাচিবে ভৈরব রঙ্গে
এস ভক্ত গভীর আনন্দে হে মেঘ
এস সজল করুণা ; শোন মম বন্দন
ওগো সুনীল সুন্দর মূরতি
হেরি গগনে ওহে দেব, শান্ত হবে চিত
জল স্থল পাবে সান্ত্বনা ।

বর্ষা (মল্লার)

এস হে সজল ঘন······

সুরট (রাজা মেঘ)

আজি কে দ্বারে ?
কে ডাকিবে আমারে ?
সুনীলকান্তি তনু, জলদবারি বেণু
দামিনী চমকিত কেশ ভারে ।

গৌর সারঙ্গ (রাগ মেঘ)

শ্রাবণ মাহ, আও অব
মেঘ সুন্দর মেরে
হ্যয় তোহে গোর সারঙ্গীনে
চয়ন নাহি তু বিন পিয়ারে ।
—হামারে

পরিশিষ্ট

শ্রীরাগ

ভূপালী—(শ্রীরাগ)

আসিল শীতঋতু বায়ু আজি
বহে শীতলিয়া, জনমন মোহিয়া।
তিরপিত হও সবে
সঙ্গ পিয়াসী ভূপালি গাহিয়া।

ত্রিবেণী (শ্রীরাগ)

শ্রীরাগ সঙ্গিনী ত্রিবেণী যামিনী
মধুর রঙ্গিণী শীত সোহাগিনী।
রজত বেশিনী অরূপ কামিনী
শ্যাম সুকেশিনী — ভাষিণী।

কল্যাণী (শ্রীরাগ)

শিশির ধৌত কুসুম অর্ঘ, এনেছি তোমার চরণে আজ
হেরি আনন্দ মোহিতকান্তি ভক্তি হৃদয়মাঝ।
গোধুলি অন্ত শোন শ্রীকান্ত কল্যাণীর করুণ গান
হইব ধন্য করি প্রসন্ন গীত পরিমল করায়ে পান।

বসন্ত (রাগ) বসন্ত কাল

যামিনী অন্তে নব বসন্তে
এস নব অনুরাগিণী।
নাচ আনন্দে মোহন ছন্দে
গুঞ্জরী মধুরাগিণী

কৌশকী (বসন্ত রাগ)

আহা কি মধুর বিহঙ্গ গাহে
না জানি কোয়েলা কারে চাহে
কহিছে কৌশিকী কহো কাহে
পরাণ ফুকারে মধু মাহে
হৃদয় গাহিছে—

মালবী (বসন্ত)

সুরভী পবন বন করিল আকুল
বিটপীর কানে কানে দুলিতেছে দুল।
বরণ গন্ধের আর নাহি পাই কুল
পরাণ কুসুম পরানেতে ফুল।

মেঘ

প্রবল ঘন মেঘ আজি
নীল ঘন ব্যোম-'পরে·········

[এর পর এক পাতা বাদ দিয়ে ইংরাজীতে কিছু নাম, বর্ণনা ও গাইবার সময় লেখা হয়েছে যেমন :]

Bhairabi Ragini—Songs of Summer······

[এবার কয়েক পাতার পর তারিখ দেওয়া আছে :] 7. 2. 17

Practice In Chorus
I Ragini—18—Suren Babu
a) Tulu, Zhunu
b) action ; myself & Bulu & Mrs. Singh

[তারপর ১, ২ করে ইংরাজিতে রাগ রাগিণীর নাম লেখা চারপাতার পর ভৈরবী সুরে হিন্দীতে ছ'টি গান পেন্সিলে লেখা আছে]

১ মত্তর তো তোরে দাসনয়া লাগি মহারাজ······

২ মোরি নিদিয়া—গৌরী রে······

[গানের শেষে একপাতা বাদ দিয়ে কোন সুরের স্বরলিপি লেখা আছে। এরপর খাতাটিকে উল্‌টে ধরে পেছন থেকে লেখা শুরু হয়েছে। পেছনের মলাটের ভেতর দিকে কতকগুলি হোমিওপ্যাথি ওষুধের নাম লিখেছেন। প্রথম পাতায় লিখেছেন :]

ব্র্যাকেটের [ ] ভেতরের লেখাগুলি লেখিকার

Mr. Ananda Prakash Ghosh

13 in Preak + 5 = 18 in preak.

[দ্বিতীয় পাতায় আবার ভলেন্টিয়ারদের কথা। তারপর সাড়ে তের পাতা কোন থিয়েটার সম্বন্ধীয় কথা, মনে হয় যার সঙ্গীত রচনা, পরিচালনা ও নির্দেশনা অতুলপ্রসাদ করেছিলেন। খাতাটিকে আবার উল্‌টে ধরে গানের দীর্ঘ সূচীপত্র দেওয়া আছে। এতে তিরানব্বই টি গানের প্রথম চরণ লেখা আছে। এরপর আবার স্বরচিত গান :]

ভৈরব

ডাক শিব সুন্দরে নির্মল উষাকালে

হৃদয়ে দেখ হৃদয়বিহারী

[খানিকটা জায়গা বাদ দিয়ে লেখা :]

আদিরাগ ভৈরব নির্মল উষাগমে……

[গানটি সম্পূর্ণ করে লেখা হয়েছে। পরের পাতায় এই গানটিকে কিছু অদলবদল করে আবার লেখা হয়েছে। তারপর :]

মেঘ রাগ

প্রবল ঘন মেঘ আজি ইত্যাদি

নটনারায়ণ

উজ্জ্বল সমর বেশে এসো নটনারায়ণ……

শ্রীরাগ

আইল শীতঋতু হেমন্তের পরে……

বসন্ত

নবরূপ হেরি' আজি বিশ্ববিমোহিত :……

তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে

উঠিল কুসুম ফুটিয়া……

[এই গানটি কবির চোদ্দো বছর বয়সে লেখা এবং খুব কাটাকুটি করে লেখা। খাতার তারিখ :]

ব্র্যাকেটের [ ] ভেতরের লেখাগুলি লেখিকার।

পরিশিষ্ট

8. 1. 17.

১৯১৬ কংগ্রেসে হিন্দু মুসলমানের মিলন উপলক্ষে

রামপ্রসাদী মালসী

দেখ, মা, এবার দুয়ার খুলে।
গলে[২] এনু মা, তোর,
হিন্দু মুসলমান দু-ছেলে।......

9. 1. 17

যারে দেখতে নারি তারেই আমি চাইগো......

মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বঙ্গ ভাষা
মা আমার প্রণমি বঙ্গ ভাষা
এই ভাষাতেই প্রথম বোলে
ডাকনু মায়ে মা মা বলে
(মরি হায় হায় রে)
এই ভাষাতেই মায়ের গানে
আনল চোখে ঘুমের নেশা
জননীর ঘুমপাড়ানী
শিশুর কানে লাগল আশা
ঘুমপাড়ানীর সরল সুরে পেনু কোলের ভালবাসা
হচ্ছে না
ঐ ভাষাতেই নিতাই গোরা
আনল দেশে প্রেমের ধারা (ঝোরা) (মরি···)
কীর্ত্তনের মদিরা পিয়ে ঘুচল মোদের প্রেমপিপাসা
কীর্ত্তনে ভাই নিতাই গোরা
আনল দেশে প্রেমের ঝোরা ('মোহিনী' মোহন ঐ ভাষায় গো)

' ' এই চিহ্নের ভেতরের লেখাগুলি অতুলপ্রসাদের নিজের হাতে কাটা।

(মালসী, বাউল, ভাটিয়ালি 'ঘুচ' মিটায়
(মোদের ক্ষুদ পিপাসা
বাউলের উদাস তানে বাড়ায় প্রাণে
প্রেম পিপাসা
(মরি কি ভাষা গো)
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন্
হেম, রবি, বঙ্কিম, নবীন্
ঐ ফুলেরই মধুর রসে বাঁধল মধু
মধুর বাসা
অথবা
বিদ্যা, রবি, চণ্ডী, গোবিন্
হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন
ঐ ফুলেরই মধুর রসে বাঁধল তারা (সুখে)
মধুর বাসা।
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে (বীণা)
আনল মালা জগত জিনে (জগত জিনা)
থাকনা মোদের নয়নে জল (মোদের আনন হইল উজ্জল)
পরাণে আর নাই নিরাশা।
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে
ডাকনু মায়ে 'মা মা' বলে
ঐ ভাষাতেই বলব হরি যখন হবে কূলে আসা।
ডাকব মায়ে যখন 'ঘাটে হবে আসা'
হবে ঘাটে আসা
ভরল এ দেশ গানে গানে
গান গেয়ে 'ধান' দাঁড় মাঝি টানে
তোমার ঐ শ্রান্তি হরা গান গেয়ে
ধান কাটে চাষা

' ' এই চিহ্নের ভিতরের অংশগুলি অতুলপ্রসাদের নিজের হাতে কাটা

তুমি যখন বাজাও বাঁশী
(বাজে যখন তোমার বাঁশী
কি যাদু জানে গো)
কখন কাঁদি কখন হাসি
ঐ বাঁশরী বলবে হরি
সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা
[কবি দ্বিতীয়বার গানটি এই ভাবে লিখেছেন]
মোদের গরব মোদের আশা
—আ মরি বঙ্গ ভাষা !
প্রণমি বঙ্গ ভাষা

১ ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে
ডাকনু মায়ে 'মা মা' বলে (মরি হায় হায় গো)
ঘুমপাড়ানীর বাঙ্গলা সুরে
পেনু কোলের ভালবাসা।

৩ কীর্ত্তনে ভাই নিতাই গোরা
আনল 'ভকতির' দেশে ভক্তি ঝরা
(কি 'মোহন ভাষা' সুধার কথা গো !
সুধার ধারা)
বাউলের উদাস তানে
আনে 'জাগায়' প্রাণে প্রেম পিয়াসা

৪ বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন্দ,
হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন (আরো কত মধুপ গো)
ঐ ফুলেরই মধুর রসে বাঁধল তারা মধুর বাসা।

ব্র্যাকেটের [ ] ভেতরের লেখাগুলি লেখিকার
• ' এই চিহ্নের ভিতরের অংশগুলি অতুলপ্রসাদের নিজের হাতে কাটা

× বাজিয়ে রবি তোমার বীণা
আনল মালা জগৎ জিনা
(এ সুখ গরব কোথায় রাখি গো)
(তুমি) মোদের আনন করলে উজল
পরাণে আর নাই নিরাশা।

৫ × বাজিয়ে রবি বীণা তোমার
জগত জিনি আনিল হার (গরব কোথায় রাখি গো)
তোমার চরণ তীর্থে আজি
জগত করে যাওয়া আসা।

২ ভরলে এ দেশ গানে গানে
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে
(এমন কোথায় আর আছে গো)
তোমার ঐ শ্রান্তিহরা গান গেয়ে
ধান কাটে চাষা।

৬ বাজে যখন তোমার বাঁশী
কখন কাঁদি কখন হাসি (কি যাদু জানে গো)
ঐ বাঁশরী বলবে 'হরি'
সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা।

9. 1. 17
Calcutta

কোরাস :

ধরমেতে রহ ধীর
করমেতে হও বীর
ভরমে উঠাও শীর
ভারতবাসী ;

' ' এই চিহ্নের ভিতরের অংশগুলি অতুলপ্রসাদের নিজের হাতে কাটা

ভোল ভেদাভেদ জ্ঞান
হও সবে আগুয়ান
আছে সাথে ভগবান
বিবাদনাশী।
এক জন্মভূমি মাতার সন্তান,
এক অধিপতি এক ভগবান—
পারসী ইসাহি হিন্দু মুসলমান
—মিলিত জীবনে মরণে
হের নব মহাজাতির উত্থান
বিচিত্রের মাঝে মিলন মহান
বিবিধ কুসুম একই উদ্যান
এক ধনু নানা বরণে

কোরাস ধরমেতে হও ধীর ইত্যাদি

যে দেশ আদর্শ ছিল এই ভবে
কতদিন আর পিছে পড়ে রবে
ঐ দেখ ভানু উদিছে পূরবে
প্রভাত হইছে রজনী
আসিছে সুদিন, আসিছে সুদিন
মোরা ত্রিশ কোটি নহি মোরা হীন
হতে পারি দীন, নহি মোরা ক্ষীন
ভারত মোদের জননী

কোরাস্ . .

ন্যায়ধর্ম্ম অসি আছে যার করে
বিঘ্ন বিপদে তারা নাহি ডরে
বাঁধিবে দুর্গ মহত্ত্বের পরে
সত্যের শিঙা বাজিবে
হইবে স্বার্থ পরাজিত রণে
সাম্যশান্তি আসিবে ভুবনে

পরিশিষ্ট

বিশ্বহিতের ভারত গগনে
বিজয় পতাকা রাজিবে
কোরাস

কতকাল রবে নিজ যশবিভব অন্বেষণে
ছদিনের ধনের লাগি ভুলিলে পরম ধনে
[মাত্র এই দু লাইনই লেখা আছে। এরপর]
তোমায় ঠাকুর বলব নিঠুর কোন মুখে
শাসন তোমার যতই গুরু ততই টেনে লও বুকে।......

ভৈরোঁ।
জাগো জাগো জাগো এবে
হের পূরব প্রান্তে ভানু রেখা
হে ভারতবাসী।......
[উপরের গানদুটি সম্পূর্ণ লেখা আছে]

ব্র্যাকেটের [ ] ভেতরের লেখাগুলি লেখিকার

মুসায়েরা

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

অনেক দিনের কথা; তখন সবে মাত্র লক্ষ্ণৌতে আসিয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই এদেশীয় কয়েকটি সুকবির সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল। তন্মধ্যে একজন—হামিদআলি খাঁ। খাঁসাহেব এক সময় ব্যারিস্টারী করিতেন, কিন্তু অগত্যা সে ব্যবসাটা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমার সঙ্গে যখন তাঁহার পরিচয় হয়, তখন তিনি উর্দ্দু কবিতা ও হোমিয়োপ্যাথি চর্চায় ব্যস্ত। উর্দ্দু ভাষায় তিনি একজন সুকবি বলিয়া জনসমাজে বেশ যশ লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী কবিতা সম্বন্ধেও তাঁহার একটু খ্যাতি ছিল; তবে সেটা বন্ধুবর্গ উপহাসচ্ছলেই উল্লেখ করিতেন। যৌবনাবস্থায় বিলাতে অবস্থানকালে তিনি নাকি রমণীগণের মুখমণ্ডল লক্ষ্য করিয়া নানাবিধ প্রেমকবিতার সৃষ্টি করেন। তাঁহার সমসাময়িক একজন বন্ধু তাহার দুই একটি নমুনা আমাকে শুনাইয়াছিলেন; সেগুলি শুনিলে আদিরসের উদ্রেক হউক বা না হউক, হাস্যরসের উদ্দীপনা যথেষ্ট পরিমাণে হয়। বোধ হয় খাঁসাহেব একই কারণে ব্যারিস্টারী ও ইংরাজী কবিতা রচনা উভয় চেষ্টা হইতে বিরত হন। আমি তাঁহাকে আচকান্, দোপল্লি টুপি ও চুড়িদার পায়জামা ছাড়া অন্য কোন পরিচ্ছদে দেখি নাই।

একদিন তিনি বাসায় আসিয়া উপস্থিত; বলিলেন, 'সেন, চলো ম্যায় তুমকো মুসায়েরা মে লে চলুংগা।' তখন আমার উর্দ্দু-বিদ্যা নিতান্ত প্রাথমিক; বিহার অঞ্চলের চাকরদের কাছে শেখা বাংলা-ভাঙা বিকৃত হিন্দী তখনও অতিক্রম করিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম—খাঁসাহেব, মুসায়েরা ব্যাপারটা কি? হয়ত বলিয়া থাকিব খাঁসাহেব ব্যাপার 'ক্যা হায়?' তিনি উত্তরে হাসিয়া বলিলেন—লক্ষ্ণৌ আসিয়াছ আর, কমবখ্‌ৎ এও জান না মুসায়েরা কাকে বলে?" তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, মুসায়েরার অর্থ কবি-সম্মিলন, যেখানে আমন্ত্রিত কবিগণ তাঁহাদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। আমার শুনিয়া লোভ হইল;

বলিলাম—চল ; কিন্তু খাঁসাহেব, একটু কাছে বসাইও, বুঝাইয়া দিতে হইবে। তিনি বলিলেন—আচ্ছা তাহাই হইবে, কিন্তু শোন ; যেখানে যাইবে সেখানে ইংরাজী সভ্যতা এখনও প্রবেশ করে নাই ; সে স্থানটি প্রাচীন লক্ষ্ণৌর কেন্দ্রস্থল, সেখানকার লোকদের বেশ-ভূষা, ভাষা, আচার-ব্যবহার ঠিক নবাব আসফোদ্দৌলার সময়ে যা ছিল তাই ; তাহারা ইংরাজী কহে না ; ইংরাজি জানে না ; বস্তুত তাহারা ইংরাজি ভাষাকে ও ইংরাজি সভ্যতাকে ঘৃণা করে। এসব শুনিয়া আমি একটু ইতস্তত: করিতে লাগিলাম ; ভাষা ও বেশ সম্বন্ধে মনে নানা প্রকার দ্বিধা ও আশঙ্কার সঞ্চার হইল। খাঁসাহেব বলিলেন—শীঘ্র চল, বেশ পরিবর্তন করিয়া লও। তাড়াতাড়ি হিন্দুস্থানী ও বিদেশী মিশ্রিত এক অপূর্ব বেশ ধারণ করিয়া খাঁসাহেবের সঙ্গে চলিলাম। তখন পর্যন্ত একেবারে খাঁটি খাঁসাহেবটি সাজিতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিতাম। আমার বন্ধুটি হিন্দুস্থানীর পোষাকেই স্বপক্ষে অনেক অকাট্য যুক্তি দর্শাইলেন ; আমাকে স্বীকার করিতেই হইল যে হিন্দুস্থানী বেশ ইংরাজি পোশাক অপেক্ষা অধিকতর শোভন, সহজ ও সঙ্গত। তদবধি কার্যত কখনও কখনও এ মতের পোষকতা করিয়া থাকি।

লক্ষ্ণৌর একটি পুরাতন পল্লীর পার্শ্বে বড় রাস্তার ধারে আমাদের গাড়ি থামিল। আঁকাবাঁকা অনেকগুলি সংকীর্ণ গলির মধ্য দিয়া পদব্রজে চলিলাম, কেননা সে গলিতে গাড়ি চলিতে পারে না। দুদিকে জীর্ণ ইমারৎ, জন্মাবধি কখনও তাহার সংস্কার হয় নাই ; দুই পার্শ্বে সেই সনাতন আবর্জনা ; আবার সেই অপরিষ্কার গলির দুই ধারে দধি, 'বালাই' (লক্ষ্ণৌতে মালাইকে বালাই বলে) কবাব, রুটি, জিলেবী, বরফি ইত্যাদি খাদ্য ও অখাদ্য দ্রব্যের দোকান ও তৎসহ যথেষ্ট মাছি। মাঝে মাঝে দু একটি ভাঙা ও ছাড়া বাড়ির ভাঙা কামরার ছিন্ন-বসন বা বিবসন আফিমসেবিগণ নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া স্তিমিত নেত্রে বিশ্রাম করিতেছেন। পানের দোকানের অবধি নাই ; দু পা হাঁটিলেই এক একটি পানের দোকান। এখানকার মুসলমানেরা পান করেন না বটে কিন্তু পান খান অজস্র। এরূপ গলির ভিতর দিয়া প্রায় আধ মাইল হাঁটিয়া অবশেষে একটি প্রকাণ্ড ফটকের মধ্য দিয়া একটি প্রকাণ্ড বাড়ির আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলাম। গৃহের দ্বারেই গৃহকর্তা করযোড়ে। খাঁসাহেবকে

দেখিয়াই তিনি "তসলিমাত্ আরজ খাঁসাহেব, তসরিফলাইয়ে" বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। আরও অনেক ফারসি-বহুল উর্দূ ভাষায় তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। খাঁসাহেব সৌজন্যের রাজা, তিনি প্রত্যুত্তরে ভূয়সী সৌজন্য প্রকাশ করিলেন, এবং মাথা একটু নত করিয়া দুই হাতে এক সঙ্গে তিনবার সেলাম করিলেন। আমি পড়িলাম মুশকিলে; পূর্বে কখনও দুই হাতে কিংবা একসঙ্গে একেবারের বেশী সেলাম করি নাই। আমি অতি সন্তর্পণে খাঁসাহেবের অনুকরণ করিলাম। পরিচয়ের পর নিমন্ত্রাতা আমাদিগকে ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন।

যাহা দেখিলাম তাহা অদ্ভুত। দেখিলাম, সেখানে কবিবৃন্দ গোলাকারে বসিয়া আছেন; খাঁসাহেবকে দেখিবামাত্র তাঁহারা সকলে হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন; এবং সৌজন্য প্রকাশের একটা কলরব পড়িয়া গেল; একসঙ্গে এতগুলি হস্তযুগলের উত্তোলন ও আন্দোলন আমার কাছে এক প্রকার ব্যায়াম বলিয়া ঠেকিল। সকলে আমাদিগকে খুব আদর করিয়া বসাইলেন। খাঁসাহেবের এরূপ প্রভূত সংবর্ধনা দেখিয়া বুঝিলাম যে তিনি একজন যশস্বী কবি। খাঁসাহেব কবিদের পংক্তিতে বসিয়া গেলেন, আমি তাঁহার পশ্চাতে বসিলাম। তাঁহাদের বসিবার প্রণালী ঠিক আমাদের বাঙালীদের মত নয়। তাঁহারা হাঁটুর উপর ভর করিয়া একটু অগ্রদিকে হেলিয়া হাত দুটি জানুর উপর রক্ষা করিয়া বসেন। পিছনে তাকিয়া নাই; প্রত্যেকের সামনে একটি করিয়া মৃতভাণ্ড, তাহাতে পান রাখা। কিছু দূরে দূরেই একটি করিয়া উগালদান, তাহার কারণ, লক্ষ্ণৌর পানে তাম্বুলের মাত্রা একটু অধিক। কিন্তু মুসায়েরার আসরের একটি বিধি এই যে, গজল পাঠের সময় কেহ ধূমপান করিতে কিংবা পান খাইতে পারিবেন না। মাঝে মাঝে যখন পাঠের বিরাম হয় সে অবসরে তামাকু ও পান খাইয়া লইবেন।

আগত কবি বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'খাসাহেব, ঐ ফর্সা সুপুরুষটি কে?' উত্তরে জানিলাম উনি একজন কাশ্মীরী হিন্দু কবি—তাঁর খুব প্রতিষ্ঠা। ঐ রোগাপানা আচকান্ গায়ে, দোপল্লি টুপি উলটোভাবে পরা, বিষণ্ণবদন মুসলমানটি কে?—উনি একজন প্রসিদ্ধ মারসিয়া খান; অর্থাৎ তিনি মারসিয়া শোক-সঙ্গীত খুব ভাবের সহিত সুন্দরভাবে পাঠ করেন, আর উত্তম কবিতাও লেখেন। উনি কে? ঐ যে লম্বিত কেশ,

কুঞ্চিত কুণ্ডল, প্রকাণ্ড মাথার অগ্রভাগে একটি ক্ষুদ্র টুপি, ঢুলু ঢুলু অর্ধনিদ্রিত (হয়ত অহিফেন সেবন করেন) স্থূলকায় পুরুষটি? উনি? উনি একজন বিখ্যাত কবি; সাহীযুগের শ্রেষ্ঠ কবি আতসের বংশধর, ইঁহার সমকক্ষ কবি এখন লক্ষ্ণৌতে নাই। আর ঐ যে তাঁহার পার্শ্বে অত্যন্ত কৃষ্ণকায় অতি সাধারণ পোশাক পরিয়া হাস্যবদনে বসিয়া আছেন, উনি কে? ও লোকটি? শুনিয়া হয়ত হাসিবে, ইনি এক্কাওয়ালা নাম্নে সাহেব, লক্ষ্ণৌর একজন সুকবি, দিনের বেলা এক্কা হাঁকান; লিখিতে বা পড়িতে পারেন না, কিন্তু মনে মনে অতি সুন্দর কবিতা রচনা করেন, এবং স্বরচিত গজল মুসায়েরাতে পাঠ করিয়া বেশ যশ লাভ করিয়াছেন। ইঁহার তখল্লুস্ সফিক্। তখল্লুস মানে কবির একটি বিশেষ নাম। এদেশে কবি মাত্রেরই এক একটি করিয়া তখল্লুস থাকে; এ নামে তাঁহারা কবি সমাজে পরিচিত; কবিতার অন্তিম চরণে এ নামেই তাঁহারা আত্মপ্রকাশ করেন।

এইরূপ হিন্দু ও মুসলমান ধনী ও দরিদ্র, বৃদ্ধ ও যুবক শ্বেতবর্ণ ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নানা শ্রেণীর কবিগণ সে সভায় আসীন। আমার দেখিয়া মনে বড় আনন্দ হইল; কবি-সমাজে এরূপ সাম্য বড়ই সুদর্শন। তারপর পাঠ আরম্ভ হইল। কেহ সুললিত কণ্ঠে সুর করিয়া নিজের রচনা আবৃত্তি করিলেন; কেহ একটু নাকি সুরে কেহ বা গুরুগম্ভীর নিনাদে স্বীয় কবিতা পাঠ করিলেন। সকলেরই উচ্চারণ অতি স্পষ্ট, একেবারে দ্রুত নয়। ইঁহাদের পাঠ করিবার প্রণালী অতি সুন্দর।

মুসায়েরার পদ্ধতি এই। যিনি মুসায়েরা আহ্বান করেন তিনি নিমন্ত্রণ পত্রের নিম্নভাগে দুই এক চরণ কবিতার নমুনা লিখিয়া পাঠান; তাহাকে বলে 'মিস্রাতরাহ'। মিস্রাতরাহর শেষ কথাটিকে বলে 'রদিফ; আর ঠিক তার পূর্বের শব্দটিকে বলে 'কাফিয়া'। একটি উদাহরণ দিতেছি :—

'দিলহি বুঝা হুয়া হো তো লুতফ্‌এ বাহার ক্যা' ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ :—

শুষ্ক যদি অন্তর আমার, বসন্তের আনন্দ কোথায়?

এ পংক্তিটির 'ক্যা' শব্দটি রদিফ্ আর 'বাহার' শব্দটি কাফিয়া। বাঙ্গলাতে হবে 'কোথায়' কথাটি রদিফ, আর 'আনন্দ' কথাটি কাফিয়া।

এখন, নিমন্ত্রণ পত্রে যদি কেহ এই মিস্রাতরাহটি লিখিয়া পাঠান :—

'দিলহি বুঝা হুয়া হো তো লুতফ্‌এ বাহার ক্যা।'

তবে বুঝিতে হইবে যে, নিমন্ত্রিত কবিগণ মুসায়েরায় পাঠ করিবার জন্য যে গজলটি লিখিয়া আনিবেন তাহার প্রত্যেক দ্বিপদীর দ্বিতীয় চরণের কাফিয়া হবে 'বাহার' অর্থাৎ বাহারের সঙ্গে মিল থাকিবে; আর শেষ কথাটি হবে 'ক্যা' যথা :—

'চলতি হুয় ইস চমনমে হাওয়া ইনকিলাব্‌ কি
শবনম্‌ কো আয় দামনে গুল মে করার ক্যা।'

এখানে 'বাহার' ও করার' এর কাফিয়া মিলিল; আর রদিফ 'ক্যা'ও রক্ষা হইল। উপরি উক্ত কবিতার বাঙ্গলা অনুবাদ :—

'হেথাকার ফুল-বনে সদা চলে পবন চঞ্চল
তাইত শিশির-বিন্দু পুষ্পকোলে সদা টলমল।

সর্বপ্রথমে নিমন্ত্রাতা কোনও বিখ্যাত কবির দুই একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া মুসায়েরা আরম্ভ করেন। তারপর কবিগণ তাঁহাদের স্বরচিত গজল পাঠ করেন। গজল ছাড়া মুসায়েরাতে আর কোন রকম কবিতা পাঠ করা নিয়মবিরুদ্ধ। নিমন্ত্রিত কবিদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও মাননীয় কবি তাঁহাকেই সচরাচর প্রথমে পাঠ করিতে অনুরোধ করা হয়। অনেক সময় তিনি কৃত্রিম বিনয় অবলম্বন করিয়া নানা প্রকার আপত্তি প্রকাশ করেন; 'আমি এখন সেকালের, আজকালকার নবীন কবিদের আমার কবিতা ভাল লাগিবে কেন? ইহাদিগকে প্রথমে পড়িতে বলা হউক।' অমনি সভাস্থ সকলে একবাক্যে তাহার প্রতিবাদ করেন; হয়ত বলিলেন, 'আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এখনও আপনার ন্যায় কবি জীবিত আছেন—ইত্যাদি'; এরূপ অনেক প্রকার বিনয় প্রকাশের পর নিজের আঙ্গারখার পকেট হইতে একটি পরচা বাহির করেন। তাহাতে স্বরচিত গজলটি লেখা। একটি সৌজন্যসূচক সেলাম করিয়া তাঁহার গজলটি পড়িতে আরম্ভ করেন; দ্বিপদী গজলের প্রথম পদটি আবৃত্তি করিলে পর সভাস্থ কবিকুল সমস্বরে তাহার পুনরাবৃত্তি করেন। মনে করুন উনি পাঠ করিলেন 'চলতি হুয় ইস চমনমে হাওয়া ইন্‌কিলাব্‌ কি'। অমনি সকলে বলিয়া উঠিল 'চলতি হুয় ইস চমনমে হাওয়া ইন্‌কিলাব্‌ কি'। তারপর কবি নিমন্ত্রিত কাফিয়া-সংযুক্ত দ্বিতীয় চরণটি পাঠ করিলেন; 'শবনম্‌ কো আয় দামনে গুল মে করার

ক্যা'। যেমনি দ্বিতীয় চরণটি পড়িলেন অমনি কবিবৃন্দ ও শ্রোতৃগণের প্রশংসা-ধ্বনির কলরবে গৃহটি পরিপূর্ণ হইল। কেহ বলিল—"আ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!' কেহ বলিল—'সুভনাল্লা', ফির দোহরাইয়ে ; কেহ বলিল—'ক্যা খুনমিশ্রা লাগায়া' ; কেহ বলিল—ওয়াহ ওয়াহ, ওয়া, আপনে বেনজীর মিশ্রা কহি', এইরূপ আরো অনেক স্তুতিবাদ। কবি তখন উঁচু হইয়া উঠিয়া চারিদিকে তাকাইয়া সেলাম করিতে লাগিলেন, এবং কবিভ্রাতাদের প্রশংসা-বাদের জন্য অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। একটি কবির গজল পাঠ শেষ হইলে তাঁহার পার্শ্ববর্তী কবিটির পালা ; এবং ঠিক সেইরূপ পুনরাবৃত্তি, সেইরূপ প্রশংসাধ্বনি, এবং ঠিক সেইরূপ চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেলাম। এইরূপ পাঠপরম্পরায় কবি-চক্রটি সম্পূর্ণ আবর্তন হইলে পর সর্বশেষে নিমন্ত্রাতা আপনার রচিত গজলটি পাঠ করেন। সৌজন্যের জন্যই হউক বা কাব্য মাধুর্যের জন্যই হউক প্রশংসার মাত্রাটা তাঁর ভাগ্যেই একটু বেশী পড়ে। মুসায়েরা চক্রটি একটি মধুচক্র ; ইহার আকর্ষণ অসাধারণ। চারিদিক হইতে, এমন কি সুদূর নগর ও গ্রাম হইতে কাব্যামোদিগণ 'মধুগন্ধে অন্ধ অলি'র ন্যায় তথায় আসিয়া একত্রিত হন। অনেক মুসায়েরাতে অতি মনোরম ও উচ্চাঙ্গের গজল পাঠ করা হয়।

বহুদিন পূর্বে লক্ষ্ণৌতে একটি মুসায়েরা হয়, তার গর্ব আজও অনেক লোক করে। সে মুসায়েরার ভাল ভাল কবিতাগুলি অনেক কাব্যপ্রিয় লোকেরই কণ্ঠস্থ। উদাহরণচ্ছলে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। যিনি মুসায়েরা আহ্বান করিলেন তিনি নবাব ওয়াজিদালি সাহর সময়কার বিখ্যাত কবি আতস্-এর একটি গজল হইতে 'মিশ্রাতরাহ' লিখিয়া পাঠান। তার দুটি চরণ এই :—

দো রোজ হুয় ইয়ে লুতফ্‌
ও আয়েস ও নিয়বৎ দুনিয়া ;
বুই সবাই উরুছি মেহমান হুয় পিরহন মে'।

বাঙ্গলা অনুবাদ :—

দুদিনের তরে হয়, সংসারের সুখ লাস্য যত ;
বধূর বাসর বাসে ক্ষণস্থায়ী সুগন্ধের মত।

মুসায়েরা সম্মিলনে অনেক সুকবি উপস্থিত ছিলেন, এবং তাঁহাদের স্বরচিত গজল পাঠ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি গজলের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। সুকবি 'হাকিমের' গজলের দুটি লাইন :—

'ফির গয়ের গয়েরহি হুয় গো হুয় উস অঞ্জুমন মে ;
বেগানগি সবজা জাতি নেহি চমন্ মে'।

'পিরহনমে' আর চমন্‌মে'র কফিয়া মিলিল।

বাঙ্গলা অনুবাদ :—

যদিও সে একসঙ্গে লভেছে আসন
তথাপি সে পর, কভু হবে না আপন ;
ফুল-বনে বন ঘাস উঠে ফুল পাশে ;
ফুল ত চায় না তারে মনে উপহাসে।

এ কবিতাটিতে প্রতিযোগী প্রেমিকের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করা হইয়াছে।

সুকবি 'মঝর আগা'র গজলের দুটি চরণ :—

'নাজ ও নয়াজ দেখেঁ বুলাবুল কে আওর গুলকে,
হামভি চলে চমন মে তুমভি চলো চমন্ মে'।

বাঙ্গলা অনুবাদ :—

চল বধূ দুজনাতে যাই ফুল-বনে
দেখিগে ফুলের খেলা বুলবুলের সনে।

কবি ইউসুফের গজলের দুটি পদ :—

সাগর ভরে ধরে হুয় সাকী কি অঞ্জুমন মে।
তহ রহে হুয় কৌসর ফিরোজ কে চমন্ মে।

বাঙ্গলা অনুবাদ :—

সুরা-পাত্র উছলিত সাকীর সভায়
নন্দন-উদ্যানে যেন মন্দাকিনী ধায়।

সুকবি পণ্ডিত 'বিষণনারায়ণ দর' এ-সভায় তাঁহার সুন্দর গজল পাঠ করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি লক্ষ্ণৌতে একজন খ্যাতনামা ব্যারিস্টার। ১৯১১ সালে তিনি কলিকাতায় কংগ্রেস

সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত গজলের দুটি চরণ এই :—

'গুল্‌কে যো কান ওড়াই বক্‌ বক্‌কে বুলবুলোনে,
বোলি কলি ছিটক কর ক্যা সোর হুয় চমন্‌ মে'

বাঙ্গলা অনুবাদ :—

বুলবুলের গোলমাল শুনি ফুল-বন,
হইল অধীর, তার বধির শ্রবণ ;
হেনকালে জাগি উঠি মেলি আঁখি-পাতা
ফুলকলি ফুকারিল—কার গোল হোথা ?

নবাব ওয়াজিদালি সাহের সময় মুসায়েরার খুব আদর ও প্রতিষ্ঠা ছিল। সে সময়কার মুসায়েরার গল্প এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। ওয়াজিদালি সাহ্ স্বয়ং খুব সুন্দর গজল রচনা করিতেন। বাদসাহ নিজেও নাকি কখনও কখনও মুসায়েরাতে সরীফ হইতেন। সে সময়ে কয়েকটি কবি খুব যশস্বী হইয়া ওঠেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; একজনের কবিনাম 'আতস্', অন্যজনের কবি আখ্যা 'নাছিখ্'। উভয়েই প্রতিভাশালী কবি তবে আতসের প্রতিভাই উজ্জ্বলতর। অনেকে বলেন যে 'আতস্' লক্ষ্মৌর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। উভয়ের মধ্যে বেশ একটু প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবও ছিল। নাছিখ্ ছিলেন একটু উদ্ধত ; উভয়ের শিষ্য ও স্তাবকের সংখ্যা বিস্তর।

একবার একটি বিখ্যাত মুসায়েরাতে দুজনেই আহুত হয়েন। নাছিকের বয়স্যেরা আতস্‌কে অপদস্থ করিবার জন্য একটি ষড়যন্ত্র করিল। নাছিখ্ ও তার দলবল নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বেই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া মুসায়েরার চক্রটিকে অধিকার করিয়া বসিলেন। আতস্ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গো যখন আসিলেন তখন ঘর পূর্ণ। আতসের জন্য অবশ্য স্থান হইল ; কিন্তু তাঁহার সহচরগণকে স্থানাভাবে পশ্চাতে বসিতে হইল। প্রথমেই পাঠ করিলেন নাছিখ্। তারপর তাঁহার শিষ্যবর্গ খুব লম্বা লম্বা গজল বিশেষ আস্ফালনের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। এমনভাবে তাঁহারা তাঁহাদের কবিতা আওড়াইলেন যেন তাহাতেই রাত্রি কাটিয়া

যায়, যেন আতসের আর গজল শুনাইবার সুযোগ না হয়। রাত্রিও শেষ হইল—তাঁহাদের গজলপাঠও সমাপ্ত হইল; এবং তৎপর-মুহূর্তেই নাছিখ্ এবং তাঁহার অনুচরগণ সভা হইতে উঠিয়া গেলেন; ভাবিলেন যে, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই মুসায়েরাও সাঙ্গ হইবে; শ্রোতৃবর্গের আর ধৈর্য থাকিবে না। কিন্তু বহুলোক আতসের গজল শুনিবার জন্য উৎসুক; তাঁহারা নাছিখের ব্যবহারে বিরক্ত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের ধৈর্যচ্যুতি হইল না। ঠিক সূর্যোদয়ের সঙ্গে আতসের গজল পড়িবার সময় আসিল; আতস্ তখন তখনই নাছিখ্ ও তাঁহার স্তাবকগণকে নির্দেশ করিয়া দুটি পদ রচনা করিলেন। তাহা এই :—

'রাতভর হব্ সবিতো ও সইয়ারা গরমে লাফ্ থা ;
সুবোকো খুরসিদ যব নিকলা তো মতলা সাফ্ থা।'

অর্থাৎ :—

সারারাত গ্রহ তারা চমকিল গর্বে মাতোয়ারা ;
দিনমণি যেমনি উদিল পলাইল কোথায় তাহারা ?

আতসের এরূপ অপ্রত্যাশিত ও বিদ্রূপপূর্ণ জবাবে সকলে চমকিত হইলেন এবং উল্লাসে হুঙ্কার করিয়া সভাস্থলে ও সভার বাহিরে রাজপথে—রাতভর হব্ সবিতো…' এ চরণদুটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। শহরে এমন একটা জয়রোল উঠিল ও হৈ চৈ পড়িয়া গেল যে, নিশান্তে নিদ্রিত বাদশা ওয়াজিদালি হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন এবং প্রহরীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এত গোলমাল কিসের? নিশ্চয় কোথাও ডাকাত পড়িয়াছে, যাও শীঘ্র সিপাহীদিগকে খবর নিতে বল।' সিপাহীরা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'হুজুর, ডাকাত নয় মুসায়েরার কবি আতস্ নাছিখের ও তাঁহার সঙ্গোপাঙ্গদের দুর্ব্যবহারের এমন উচিৎ জবাব দিয়াছে যে, শহরময় তাহার জয়োল্লাসধ্বনি উঠিতেছে।' বাদশাহ কবিতাটি শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আতস্কে ডাকিয়া ইনাম দিলেন।

এতো গেল সাহি-জমানার কথা। আজকালও মুসায়েরা এদেশে খুব প্রচলিত ও সমাদৃত। নগরে নগরে—এমন কি গ্রামে গ্রামেও মুসায়েরা হইয়া থাকে। কলেজ ও স্কুলের ছাত্ররাও মুসায়েরা উৎসব করে। এখনও

মুসায়েরার মজলিসে বেশ ভাল ভাল গজল শুনিতে পাওয়া যায় ; তবে নিকৃষ্ট রচনাও কখনও কখনও প্রশ্রয় পায় ; এমন কি তাহা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করা কঠিন হয়। সময় সময় শুধু ব্যঙ্গ রসের অবতারণার জন্য এরূপ নির্বোধ গজল রচয়িতাকে আহ্বান করা হয়। আমি নিজেই দেখিয়াছি একজন রচয়িতা নিতান্ত অর্থশূন্য ও বালকসুলভ কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন এবং তাহা শুনিয়া শ্রোতারা খুব তারিফ্ করিতেছে এবং কবি কৃতজ্ঞতাবনত মস্তকে সকলকে সেলাম করিতেছে। অল্পবুদ্ধি বুঝিতেছে না যে, সে তারিফ্ বিদ্রূপে ভরা।

মুসায়েরা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিলাম ; মনে হয়, বাংলা-সাহিত্য-সমাজে এরূপ একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলে মন্দ হয় না।*

* 'উত্তরা প্রথম সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ আশ্বিন, ১৩৩৩।

রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের পত্রগুচ্ছ

সুহৃদবরেষু

সসম্মান সম্ভাষণমেতৎ,

বাড়িতে রোগ তাপ লইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, সেই কারণে আজ রাত্রে আপনার ওখানে খাইতে যাওয়া সম্ভব হইবে না আমাকে মার্জনা করিবেন। আমার ভগিনীপতি সতীশের অবস্থা অত্যন্ত সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আপনার সহিত সাক্ষাতের পর দিন হইতেই আমার শিশু পুত্রটিও এমন পীড়িত হইয়াছে যে আমি সরলার সহিত সাক্ষাতের অবসর পাই নাই। কাল সন্ধ্যার সময় তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল। সরলা বলে, যে, গানে যোগ দিবার উপযুক্ত মেয়ের অভাব। আপনাদের পরিচিতবর্গের কাহাকেও সংগ্রহ করিয়া একবার সরলাকে জানাইতে পারেন না? আপনি জানেন আজকাল আমি প্রকাশ্যে গান গাওয়া এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছি। আমার গলা গিয়াছে—বিশেষত: দুই তিন দিন হইতে কুইনিন খাইয়া সর্দি-জ্বরের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছি। তাহার পরে ঘরে রোগের প্রাদুর্ভাবে সমস্ত রাত্রি জাগরণে যাপন করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় আছি। ইতিমধ্যে পরশু একটা নতুন গান রচনা করিয়া রাখিয়াছি। যদি পছন্দ করেন কীর্তনের সুরে বসাইয়া কাহাকেও দিয়া গাওয়াইয়া লইতে পারেন—সেই গানটি এই সঙ্গে পাঠাই। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

লক্ষ্ণৌ

২২শে বৈশাখ

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বাসনা ছিল যে কাহাকেও না জানাইয়া হঠাৎ আপনার জন্ম দিনের মহোৎসবে উপস্থিত হইয়া আপনার চরণে মাথা ছোঁয়াইব। কিন্তু কর্মের শৃঙ্খলে এমন আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে যাইতে পারিলাম না। আমি জানি আজ আপনার অজস্র পত্রবৃষ্টি হইতেছে; তবে ইহাও জানি যে আপনি আমার

ধৃষ্টতা মাপ করিবেন। কেন না এক সময়ে আমি আপনার স্নেহ ও অনুগ্রহের পাত্র ছিলাম।

আমি আপনাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছি। বঙ্গ সাহিত্য-তীর্থের সর্বপ্রধান পুরোহিত, ধর্মে সিদ্ধ ও অগ্রণী, সঙ্গীত কুঞ্জের মাধব, বাংলার দুলাল এবং আমার পরম ভক্তি ভাজনের চরণে আজ প্রণত হইতেছি। কায়মনোবাক্যে আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘায়ু হইয়া দেশের ধর্ম, স্বদেশানুরাগ, সাহিত্য সৌজন্যের নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকুন।

অধিক লিখিয়া আপনার সময়াপহরণ করিব না। ইতি—

কৃপাকাঙ্ক্ষী

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

ওঁ

Mount Petit
Peddar Street
Bombay

কবিবন্ধু,

শনিগ্রহ এখনো রবিকে চালনা করে নিয়ে বেড়াচ্ছে— বোধ হয় অন্তকাল পর্যন্ত এই রকমই চলবে। এখানে আধমরা হয়ে পৌঁছেচি—দু'দিন অর্ধ শয্যাশায়ী হয়ে কাটিয়েছি। আজ সকালে উঠে মামুদাবাদের রাজাসাহেবকে একটি চিঠি লিখেছি—নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলুম :—

I must let you know how deeply I was touched by warm expression of sympathy with which you accepted my appeal for the Visvabharati. It has specially delighted me because of the rarity of any real understanding of its ideals which I find among my countrymen who almost rudely refuse to realise the true perspective of their country's problems in the largest of humanity. Please accept my hearty thanks not only for the ready welcome you accorded to the ideals I beg to represent in my life's work but also because you had difficult respect for my personality not to hurt my cause with an impatient gesture of

an indifferent charity made all the more conspicuous by the high position which you and your peers in Oudh hold in India.

• মামুদাবাদকে মাঝে মাঝে তাঁর প্রতিশ্রুতি যদি স্মরণ করিয়ে দিতে পার তাহলে উপকার হয়। মনে আছে তিনি বেনারসের রাজা মাধোলালকে সংস্কৃত অধ্যাপনার পাকা ব্যবস্থার জন্য লিখবেন বলেছিলেন। আর তিনি মার্চের শেষে দিল্লীতে গিয়ে চেষ্টা করবেন এমন কথাও হয়ে গেছে। সম্প্রতি বিনা বিলম্বে দু'টি জিনিস আমাদের চাই—সংস্কৃত বিদ্যার সিংহাসনে ব্রজেন্দ্রবাবুকে, আরেকটি ধর্মশালা, যেখানে ভারতীয় অভ্যাগতেরা এসে স্বয়ং ব্যবস্থা করে কিছুকাল যাপন করে যেতে পারেন। বিস্তর লোক আসতে চান জায়গা দিতে পারিনে তাতে অত্যন্ত ব্যথা পাই।

সেদিন তোমার দরবারে শেষ গান গেয়ে এলুম। শেষের পরের গানের কথা সেদিন আমাকে বলেছিলে। গাড়ীতে চলতে চলতে সেই পরের গানটি বানিয়েছি—তার আরম্ভ দু লাইন হচ্ছে :—

> "তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে
> চলে এসেছি, কেউ কি তা জানে।"

এ কথা নিশ্চয়ই মনে জেনো, কর্তা Wheel এর চক্রধ্বনির রেশ কানে আনি নি—তোমার সমাদরের মধুর সুর হৃদয়ে আছে, আর আশা আছে মধুর ফলের আকাঙ্ক্ষা যথা সময়ে মিটবে। কথাটা বিশেষ করে মনে পড়ল যেহেতু এখানে এসে পৌঁছে অবধি আমার ভাগ্যে আম পেকে উঠেছে—বন্ধু মহলে আমার লোভের কথা রাষ্ট্র হয়ে গেছে—আমিও কবুল জবাব দিয়ে বসে আছি—প্রতিবাদ করিনে। চলে এসেছি বলেই মক্কেলদের কাছে তোমার হৃদয় মন সম্পূর্ণ করে দিও না—এই ঘূর্ণাবায়ুগ্রস্ত হতভাগ্যের কথা স্মরণ করে অবকাশ মত দু-একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলো। সেই দীর্ঘ নিশ্বাস হয়ত বিধাতার কাছে গিয়ে পৌছতে পারে। ইতি—১২-৩-২৩

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন কল্যাণীয়েষু,

আজকাল হাঙ্গার স্ট্রাইক চলছে কিন্তু মৌনব্রত এখনো রাষ্ট্রনৈতিকরা স্বীকার করেন নি—ব্যারিস্টারদের তো কথাই নেই। তাই তোমার স্তব্ধতা দেখে মনে হচ্চে ছুটিতে আছ বলেই ঐ বাক সংযম—অন্ততঃ এখন তোমার বাক্যের সঙ্গে যথেষ্ট অর্থের সংযোগ নেই। মনে সংকল্প ছিল বিজয়া দশমীতে তোমাকে কবির আশীর্বাদ পাঠাব—ঠিকানার অপেক্ষায় ছিলুম। তারিখ একাদশীতে এসে ঠেকলো আর দেরি করবো না। বিশেষ কিছু নয়, আমার স্বরচিত গুটিকতক বই—সম্পাদকের সমালোচনার জন্য নয়, সমজদারের সম্ভোগের জন্যে। শেষ বেলাকার ফসল, সুতরাং আশা করি পাক ধরেছে, কিন্তু সাধ হয়েছে কিরকম তার বিচার তোমাদের 'পরেই রইল। অভিমত দাবী করে বিপদে ফেলতে চাইনে—আমাদের শাস্ত্রমতে আহারকালে কথা কইতে নেই—কাব্য আস্বাদনকালেও সেই নিয়ম প্রচলিত থাকলে অশান্তির কারণ ঘটে না। ইতি—২৯শে আশ্বিন ১৩৩৬

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

একটা কাজের কথা আছে। আমাদের বিদ্যালয়ে হিন্দুস্থানী গান শেখাবার ব্যবস্থা করতে চাই অথচ পেরে উঠচিনে। অর্থের অভাবের চেয়ে লোকের অভাবই সবচেয়ে বেশী। ভাটখণ্ডের কোন ছাত্রকে কি এই কাজে পাবার কোন আশা আছে? মাসে একশো টাকার বেশী বেতন দেবার সাধ্য নেই—কিন্তু যোগ্য লোক তার চেয়ে বেশী দাবী করেন তবে তা' পূরণ করবার জন্যে কোনো একটা উৎকট চেষ্টা করা যাবে। ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা শূন্য ঝুলি ভরাতে পারিনি তাই স্থির করেছি আবার একবার নটবর বেশে যদি কিছু সংগ্রহ করতে পারি। ভেবেছিলুম শীতকালটা কর্মক্ষেত্রের বাইরে কাটাব কিন্তু পেটের দায়ে এখানকারই মাটি আঁকড়ে থাকতে হলো। বরদা যাবার পথে তোমার দুয়ার ঠেলা দিয়ে যাবার সংকল্প মনে রইলো। যে পর্যন্ত না তুমি

মুখ ভার করো তোমার ঘর জুড়ে দিন যাপন করবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু একদিকে বরদায় বক্তৃতার আসর অন্যদিকে ভবানীপুর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীতে সভাপতির পালা এই দু'য়ের মধ্যবর্তী সময়টি সংকীর্ণ, অতএব আগমনী এবং বিজয়ার মধ্যে দীর্ঘ আয়োজন তোমাকে করতে হবে না। যাই হোক নিতান্তই একজন গায়ক চাই। ইতি—১৪ই নভেম্বর, ১৯২৯

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

উত্তরায়ণ

কল্যাণীয়েষু,

উত্তরায় রবীন্দ্রনাথ নামক এক ব্যক্তির সম্বন্ধে যে কয়টি কথা লিখেছ তা পড়ে উক্ত নামধারী খুশী হয়েছেন। হবার কারণ এই যে অনেক কথা মনে পড়ে গেল। খামখেয়ালী পর্বের একটা কথা বোধ হয় অযথা হয়েছে—সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের অভিমুখে কৃষ্ণপক্ষের কালিমা উদঘাটন করেচেন তাঁকে আমাদের মজলিসে পাবার সৌভাগ্য হয় নি। তুমি যে ব্যাপারের বর্ণনা করেছ সেটা প্রাক্ খামখেয়ালী যুগের। তখন আমি আমার স্বজন বন্ধু মহলে দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতির ভূমিকা রচনা করে বেড়াচ্ছিলুম। বস্তুত আমি ছিলুম তাঁর প্রথম ও প্রধান নকীব। তুমি সেদিনকার ইতিহাসের দুই অধ্যায়কে এক অধ্যায়ে মিলিয়েছ। রামগড়ের সেই নির্জন আনন্দের স্মৃতি তোমার এই রচনা যোগে অন্তরের মধ্যে উদ্বোধিত হলো।—পলাতকা দিনগুলোকে ফিরে পেতে ইচ্ছে করে, সেদিনকার অমৃতের ভাণ্ডটা সুদ্ধ নিয়ে তারা দৌড় দিয়েছে। আমি পড়ে গেছি ভীড়ের মধ্যে—শান্তির স্নিগ্ধ রসের পাত্রটা উজাড় করে দিয়ে তার মধ্যে খ্যাতির ঝাঁঝালো মদ ভরে দিয়েছে। ইতি ২৮।৩।৩২

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ

পরিশিষ্ট

শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু,

তোমার আম্রাতক পাওয়া গেল। ভোগ স্থরু হলো। লাগছে লক্ষ্ণৌয়ের টপ্পার মত—নবাবী স্বাদ অল্পটুকুর মধ্যে গন্ধ ও রস আঁট হয়ে আছে।

এই উপলক্ষে সাঙ্গীতিক ভাষা কেন ব্যবহার করলুম তা' ধূর্জটিকে দেখালে অধ্যাপক হয় তো বুঝতে পারবে। একটা কারণ, তোমার কাছ থেকে যা কিছু মাধুর্য আসে তার সঙ্গে সিন্ধু-খাম্বাজের মিল পাওয়া যায়, দ্বিতীয় কারণটার আলোচনা আশাজনক বলে বোধ হচ্ছে না। তবু একটা কথা বলে রাখি—প্রাংশুলভ্য ফলের কামনা ত্যাগ করেছি। উদ্বাহু বামনের দাবী যতদূর পৌঁছতে পারে সেখানেও মিঠুয়া গোছের কোনো ফল যদি পতনোন্মুখ হয়ে থাকে তাতেই কাজ চলবে। মাঝারি জাতীয় মানুষ যদি বাঙালী হয় তবে তাকে পেরে উঠ্‌বো না, অন্য প্রদেশীয় হলে বোধ হয় নরম হবে। আর কিছু নয়, এখানে কতকগুলি ভাল গলা আছে তার জন্য কতকগুলি মিষ্টি গান যদি জোগান দেওয়া যায় তাহলেই আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকব। গ্রহ যখন সুপ্রসন্ন হবে তখন প্রণালী পদ্ধতির কথা চিন্তা করে দেখব কাৎলা রুই তোমাদের ঘরেই থাক আপাততঃ ট্যাংরা হলেই আমাদের লজ্জা নিবারণ হবে। ইতি ২২শে জুলাই ১৯৩২

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অতুলপ্রসাদের রাজনীতি

অতুলপ্রসাদ লখনৌয়ে আসার পর মডারেট নেতারূপে বিখ্যাত হন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক ধ্যানধারণার রূপরেখা তৈরী হয়েছে তার বহু পূর্বে।

ব্রাহ্মধর্মকে কেন্দ্র করে যে বাকবিতণ্ডা কলকাতায় শুরু হয়েছিল তার প্রভাব পূর্ববঙ্গের মাটিতে প্রতিঘাতের ঝড় তুলেছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ; বীতশ্রদ্ধ বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ ও ঢাকায় তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতাবলী সেকালের তরুণ সমাজকে উত্তেজিত করেছিল। সেই তরুণ সমাজের একজন ছিলেন অতুলপ্রসাদের পিতা, ব্রহ্মানন্দের সমর্থক ডাক্তার রামপ্রসাদ সেন; অপরদিকে উদারতার ও সহনশীলতার প্রতিমূর্তি ঋষি কালীনারায়ণ গুপ্ত। অতুলপ্রসাদ তাঁর শৈশবকাল থেকেই এই দুই প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

অতুলপ্রসাদের কৈশোরকাল বাংলা তথা সারা ভারতের নব জাগরণের যুগ। জাতির এক চোখে দেশপ্রেম ও অপর চোখে স্বাধীনতার স্বপ্ন। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়েছে; জীবনের বিভিন্ন দিকে তখন সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। সেই জাগরণী মুহূর্তে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পুরধা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এলেন অতুলপ্রসাদ। সেই কিশোর মনে সুরেন্দ্রনাথ যে দেশভক্তির প্রগাঢ়তা ঢেলে দিয়েছিলেন তার প্রতি অতুল-প্রসাদের আমৃত্যু নিষ্ঠা ছিল এবং যে পরাধীনতার দাহ তিনি জ্বালিয়েছিলেন গীতকার অতুলপ্রসাদ তা সুরের মাধ্যমে দেশকে উপহার দিয়ে গেছেন। "……আ মরি বাংলা ভাষা"-র উদ্দীপনাময়ী শক্তি আমরা বাংলাদেশে আজও দেখতে পাচ্ছি।

১৮৯০ সালে যুবক অতুলপ্রসাদ ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত পাড়ি দিলেন। সেখানে পেলেন সতীর্থ ও আত্মীয় চিত্তরঞ্জন দাসকে; পেলেন শ্রীঅরবিন্দ, সরোজিনী নাইডু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতিকে যাঁরা পরবর্তী জীবনে এক একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে ভারতের ভাগ্যাকাশকে উদ্ভাসিত করেছেন। আরো একজনকে তিনি দীর্ঘদিনের বন্ধুরূপে পান, তিনি

হলেন মহম্মদ আলি জিন্না। কবি মনমোহন ঘোষের সঙ্গে বিলেতেই বন্ধুত্ব হয়।

অতুলপ্রসাদ যখন বিলেতে ছিলেন তখন গ্লাড্‌স্টোন সাহেবের লিবারাল পার্টি ইংলণ্ডে ক্ষমতাসীন। সে সময়ে আমাদের দেশের একাধিক নেতা বিলেতে গিয়ে ওদেশের উদারনৈতিক পার্টির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ফিরে আসেন। অতুলপ্রসাদও এর ব্যতিক্রম নন। বরং উদার আবহাওয়ায় শৈশব ও কৈশোর জীবন অতিবাহিত হওয়ায় বিলেতের তখনকার রাজ-নৈতিক প্রভাব তাঁর মনে এমনিই গভীরে প্রবেশ করেছিল যে পরবর্তী কালে কোনদিনই তিনি সে আদর্শ থেকে চ্যুত হন নি ; অনেক প্রলোভনও তাঁর মনের পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি।

অপরদিকে আয়ারল্যাণ্ডে তখন স্বাধীনতার জন্য দুর্বার শক্তি জেগে উঠেছে। বলাবাহুল্য, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য, মাতৃভূমির পরাধীনতায় বিক্ষুব্ধ অতুলপ্রসাদের মন সেই প্রশংসনীয় সংগ্রামের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। তাই বিলেতে চিত্তরঞ্জন দাস যখন পার্লামেণ্টে নির্বাচন যুদ্ধে ও জেম্‌স ম্যাক্‌লীনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তাঁকে সমর্থন করতে অতুলপ্রসাদকে দ্বিধায় পড়তে হয় নি বা চিন্তা করতে হয় নি। সহস্র যোজন দূরে বসেও তিনি তাঁর পরাধীন দেশের দুর্ভাগ্যকে ভুলতে পারেন নি বরং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় অনুপ্রাণিত হয়ে বিদেশী সুরে বাংলা শব্দ বসিয়ে তাঁর প্রথম দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন :—

"উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী, উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা"···

পাঁচ বছর পর অতুলপ্রসাদ যখন দেশে ফিরে এলেন সতীর্থ চিত্তরঞ্জন দাস ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে দেখা তো হলই উপরন্তু সঙ্গ পেলেন রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ও লোকেন পালিতের সঙ্গে সেই দিনগুলি অতুলপ্রসাদের জীবনে অমূল্য। তখনি তিনি অনুভব করেছেন রবীন্দ্রনাথ রচিত জাতীয় সঙ্গীত তার রচয়িতাকে অমরতা দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

এরপর ১৯০২ সালে অতুলপ্রসাদ ভাগ্যান্বেষণে এলেন সংযুক্ত প্রদেশের রাজধানী লখ্‌নৌ শহরে।

১৯০৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ২৭ তারিখে তিনি আউধ বার এসো-

সিয়েশনে যোগ দিলেন। ১৯০৫ সালে, মাত্র দু বছরের মধ্যে অতুলপ্রসাদ একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবহারজীবী, সারা উত্তর ভারতের মুকুটহীন নবাব, সকলের প্রাণের মানুষ হয়ে উঠলেন।

অতুলপ্রসাদ বহুমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। ফলে সংযুক্ত প্রদেশের রাজনীতির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। সংযুক্ত প্রদেশের রাজনীতিকে তখন 'আর্মচেয়ার পলিটিক্স্' বলা হত। অনেকে তখন একেই লিবার্যাল পার্টির রাজনীতি মনে করতেন। কিন্তু লিবার্যাল ফেডারেশনের জন্মের অনেক আগেই ভারতে প্রথম দিকে শুধু কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। কংগ্রেসের সদস্য থাকাকালে অতুলপ্রসাদ জাতীয় কংগ্রেসের সংযুক্ত প্রদেশীয় শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। রাজনীতিবিদ ত্রিলোকী সিংয়ের মতে অতুলপ্রসাদ ১৯১৩-১৪ সালে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে থাকবেন।

পরবর্তীকালে তিনি সংযুক্ত প্রদেশের বিখ্যাত মডারেট নেতা বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তবু তিনি তাঁর সমসাময়িক বন্ধু নেতাদের থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন এবং তাঁর আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্নতর ছিল। তখনকার দিনের নেতারা ড্রয়িংরুমে বসে রাজনীতি চর্চা করে তার চূড়ান্ত করেছেন বলে ভাবতেন; পথের ওপর জনতার পাশে তাঁদের দেখা যেত না।

অতুলপ্রসাদ কিন্তু তাঁর ড্রয়িংরুমের দরজা ডিঙিয়ে পথের ওপর জনতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তার কারণ তিনি তাঁর সুদূর প্রসারী দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করেছিলেন যে ভারতবাসীর মত একটি পরাধীন জাতির জীবনে প্রথম প্রয়োজন হল একতা ও সঙ্ঘবদ্ধতা। সেই প্রয়োজনের তাগিদে ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ রাস্তায় বেরিয়ে বালকদের সঙ্গে নিয়ে দোরে দোরে মুষ্টিভিক্ষা করে বেড়াতেন। লখনৌয়ের ইতিহাসে এমন অভাবনীয় ঘটনা এর আগে কখনো ঘটে নি তাই জনসাধারণ বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে এ নতুন দৃশ্য দেখল। সেন সাহেবের প্রতি তাদের মাথা সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধায় নত হয়ে এলো। তাঁর প্রচলিত 'মুষ্টিভিক্ষা'-ই হল আউধ সেবা সমিতি গঠনের প্রথম পদক্ষেপ।

এরপর অতুলপ্রসাদ তরুণদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ফেরালেন। ১৯০৫ সালে তিনি বেনারসে কংগ্রেস অধিবেশনে গোখলের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর প্রজ্ঞায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে গুরুরূপে স্বীকার করেন। ১৯১৪ সালে তিনি 'গোখলে

সোস্যাল সার্ভিস লীগ' বা গোখলে ছাত্র সমিতি গঠন করে দেশের তরুণ শক্তিকে একতাবদ্ধ করেন। ছাত্রদের দ্বারা তিনি নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও নানাপ্রকার সমাজসেবার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া সমিতির আলোচনা চক্রে দৈনন্দিন বিশেষ বিশেষ ঘটনা নিয়ে আলোচনা করার পরামর্শ দেন যাতে তারা আত্মসচেতন হয়ে উঠতে পারে।

তাঁর ধারণায় ভারতবাসীর একতাবদ্ধতা শুধু এক বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গান্ধীজীর বহু পূর্বে, সেই ১৯১২-১৩ সালে তিনি হরিজনদের অবজ্ঞার অন্ধকার থেকে আলোর জগতে আনতে চেয়েছিলেন। হরিজন পাড়ায় তাদের আনন্দ উৎসবে অতুলপ্রসাদ যোগ দিতে যেতেন। হোলির সময় তিনি হরিজনদের কুঁড়েতে গিয়ে তাদের সঙ্গে হোলি মিলন করে আসতেন। চাঁদা তুলে এবং নিজের পকেট থেকে মোটা টাকা খরচ করে তিনি হরিজনদের খাওয়াতেন। 'চ্যারিটি বিগিন্স্ অ্যাট্ হোম'—তিনি নিজের প্রিয়পুত্র দিলীপকুমারকে সঙ্গে নিয়ে এ কাজ শুরু করলেন এবং কিছু খৃষ্টান শিক্ষক শিক্ষিকাও তাঁকে এ কাজে সহযোগিতা করেন। প্রায়ই তিনি হরিজনদের পাড়ায় গিয়ে তাদের রান্না ডাল ভাত তরকারি তৃপ্তির সঙ্গে খাইয়ে আসতেন। তিনি এ কাজে বড় আনন্দ পেতেন।

অতুলপ্রসাদ যখন মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান তখন চেষ্টা করেছিলেন যাতে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে হরিজন বালকদের পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

লর্ড কার্জনের সময় বঙ্গ বিভাগ হলে সারা দেশ জুড়ে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় অতুলপ্রসাদের বুকেও তা স্পর্শ করে। তিনি লখনৌয়ে বঙ্গ বিভাগ বিরোধী এবং বিলিতি বস্ত্র বর্জনের আন্দোলন পরিচালনা করেন।

মহাত্মা গান্ধী ১৯১৫ সালে ভারত ভ্রমণে এলে অতুলপ্রসাদ তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন এবং গান্ধীজী লখনৌ এসে অতুলপ্রসাদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয় অতুলপ্রসাদ সেই আন্দোলনের নির্যাতিত ব্যক্তিদের জন্য সংযুক্ত প্রদেশ থেকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে গান্ধীজীকে পাঠিয়ে দেন। বলাবাহুল্য ঐ অর্থের সঙ্গে তাঁর নিজের দেওয়া মোটা অংশ ছিল।

খিলাফৎ আন্দোলনে অতুলপ্রসাদ আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে এবং মহাত্মা গান্ধীকে

নানা ভাবে সাহায্য করেছিলেন। আলি ভ্রাতৃদ্বয় তাঁর উদার ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং লখনৌয়ে এলে সেন সাহেবের আতিথ্য স্বীকার করেন।

তখনকার দিনে একজন ব্যবহারজীবীর পক্ষে সরকার বিরোধী কাজে অংশ নেওয়া সাহসের কাজ। অতুলপ্রসাদ শুধু সাহসী নন, তিনি দুঃসাহসীও ছিলেন। তাই গোয়েন্দার প্রশ্নে রাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেবকে ও লখনৌ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যঙ্গোক্তির উত্তরে সমুচিত জবাব দিতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি। তাঁর দুঃসাহস ও অসঙ্কোচ দেশপ্রেমের জন্য তিনি কোন সরকারী আনুকূল্য লাভ করতে পারেন নি যদিও তিনি তার জন্য বিন্দুমাত্র লালায়িত ছিলেন না।

তিনি তখন সংযুক্ত প্রদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য চিন্তিত। শিক্ষার দ্বারাই সাধারণের মধ্যে জাতীয়চেতনা ও স্বাধীনতার মূল্যবোধ জাগরূক হতে পারে। লখনৌয়ে আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কল্পনা তাঁর। সে কল্পনার কথা তাঁর বন্ধুবর্গ ও তালুকদাররা জানলেন, জেনে খুশি হলেন। শুরু হল তাঁর কল্পনাকে রূপ দেবার প্রচেষ্টা। কিন্তু সরকারের সামনে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব পেশ করলেন মামুদাবাদের নবাব; প্রচারবিমুখ অতুল-প্রসাদ অন্তরালে রইলেন।

যথা সময়ে লখনৌয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। অর্থ ও সেবার জন্য অতুলপ্রসাদ এগিয়ে এলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। এই পদে আমৃত্যু আসীন থেকে তিনি যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি রাখতেন তেমনি ছাত্রদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতি বিধানে ব্যক্তিগত ভাবে যত্ন নিতেন। তাঁর উদ্যম ও পরিশ্রম চিরস্মরণীয় করে রাখতে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি 'হল' 'এ. পি. সেন হল' নামে চিহ্নিত করে রেখেছেন। লখনৌয়ের একাধিক স্কুল কলেজ যাতে সুচারুভাবে চলে তার জন্য তিনি নিয়মিতভাবে অর্থসাহায্য করিতেন। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও কানপুরে ডি. এ. ভি. কলেজে তিনি প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছেন।

পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রও তাঁর অবদানে চিহ্নিত। 'লীডার' পত্রিকা প্রকাশের উৎসাহদাতাদের মধ্যে তিনি একজন। 'লীডার' সম্পাদক সি. ওয়াই. চিন্তামণি যেমন তাঁর স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছেন তেমনি তাঁর সাহায্য ও

সুপরামর্শ। সে সাহায্যের কথা সি. ওয়াই. চিন্তামণি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত স্মরণ করে গেছেন।

অতুলপ্রসাদের চরিত্রের প্রধান গুণ তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি। রাজনৈতিক জীবনে প্রথমে তিনি কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। সুরাট কংগ্রেসের ঘটনায় তিনি মর্মাহত হন। কিন্তু ১৯১৬ সালে যখন লখনৌয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তখন তিনি নরম ও চরম পন্থীদের মিলনের আশায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, অধিবেশনকে সফল করে তুলতে নিজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিরাশ হতে হয়, নরম ও চরমপন্থীরা সমঝোতায় আসতে পারেন নি।

১৯১৮ সালে অতুলপ্রসাদ ভারতীয় লিবার‍্যাল ফেডারেশনে যোগদান করেন এবং মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্মের খসড়া সমর্থন করেন।

কিন্তু পার্টি বদল করলেও অতুলপ্রসাদ তাঁর মনের সব দরজা খোলা রেখেছিলেন ; তিনি দলাদলি পছন্দ করতেন না। কংগ্রেস ছাড়লেও তার প্রতি অধিবেশনে তিনি যোগদান করতেন। লখনৌ কংগ্রেস অধিবেশনে যে সৌহার্দ্য নিয়ে মুসলীম লীগের সদস্য ওয়জির হোসেনের সঙ্গে কাজ করেছিলেন তেমনি প্রথম অল ইণ্ডিয়া সোশ্যল্ সার্ভিস কন্‌ফারেন্স-এ মহাত্মা গান্ধীকে সভাপতি করার প্রস্তাব তিনিই করেছিলেন। এলাহাবাদে চরম-পন্থীদের পত্রিকা 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্' অফিসে হাসিমুখে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাঁরই গাড়িতে 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রিকার সহ-সম্পাদক অমল হোম ও 'লীডার' সম্পাদক সি. ওয়াই. চিন্তামণিকে বসিয়ে নিজের বাড়ি এনে রেখেছেন। পুণায় গোখলে ইনস্টিটিউট্-এ যেমন দুহাতে দান করেছেন তেমনি গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অর্থ সাহায্য করেছেন ; আবার ডাক্তার কার্ভের উম্যান্ হোম-এও প্রচুর টাকা দিয়েছেন।

অতুলপ্রসাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি এমনি উদার ছিল বলেই একাধারে যেমন মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহরু, জহরলাল নেহরু, এইচ. সি. পোলক-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল তেমনি গোখলে, এ্যানি বেসান্ত, মালব্যজী, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, তেজবাহাদুর সপ্রু, সুরেন্দ্রনাথ, সি. ওয়াই. চিন্তামণি, লর্ড সিন্‌হা, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতির সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গেও তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

বিপ্লববাদ তিনি পছন্দ করতেন না কিন্তু, যুবকদের মধ্যে তেজস্বিতা তাঁর কাছে প্রশংসনীয় ছিল। শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্তা, যিনি এখন সি. বি. গুপ্তা নামে সুবিখ্যাত তখন যুবক। তিনি লখনৌ চীফ্ কোর্টের নোংরামির বিরুদ্ধে তিনটি চিঠি লিখে 'ডেলী টেলিগ্রাফে' প্রকাশ করেন। মিঃ স্টুয়ার্ট তখন লখনৌ চীফ্ কোর্টের চীফ জাস্টিস্। তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং বার এ্যাসোসিয়েশনের তখনকার সভাপতি সেন সাহেবকে বলে দিলেন সি. বি. গুপ্তা যেন কোর্টে এসে তাঁর কাজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

সেন সাহেব সি. বি. গুপ্তাকে ডেকে স্টুয়ার্টের বক্তব্য জানালেন। সি. বি. গুপ্তা দীপ্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করে বললেন, 'চীফ্ জস্টিসের হুকুম মান্য করা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব'। পরে গঙ্গাপ্রসাদ মেমোরিয়াল হলে মিটিং করে সি. বি. গুপ্তাকে তার কাজের জন্য সেখানে দুঃখ প্রকাশ করতে বলার চেষ্টা করা হল; তীক্ষ্ণবুদ্ধি সি. বি. গুপ্তা সে সভা আরম্ভের আগেই তা পণ্ড করে দিলেন। অতুলপ্রসাদ তখন সি. বি. গুপ্তাকে নিজের গৃহে ডেকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে 'তুমি যুবক, যদি ক্ষমা না চাও তো কোর্টে তোমায় ওকালতি করতে হুকুম দেবেন না, তাতে তোমারি ক্ষতি।'

কিন্তু সি. বি. গুপ্তা নিজের সঙ্কল্পে অটল। তাঁর অবাধ্যতায় সেন সাহেব কিন্তু ক্ষুণ্ণ বা বিরক্ত হলেন না। সি. বি. গুপ্তা দেখলেন, সেন সাহেবের প্রশংসনীয় চোখের দৃষ্টিতে তাঁর দৃঢ়চিত্ততার প্রতি পূর্ণ সমর্থন। রাজনৈতিক মতবাদে যদিও তখন তাঁরা দুই প্রান্তের লোক—সেন সাহেব লিবার‍্যাল ও সি. বি. গুপ্তা কংগ্রেসী তবু অতুলপ্রসাদের তাঁর প্রতি সহানুভূতির অভাব হয় নি।

সি. বি. গুপ্তাকে বন্দী করে লখনৌ থেকে বস্তীর জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পথে সি. বি. গুপ্তা পুলিসদের অনুরোধ জানালেন যে তিনি সেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করে যেতে চান। সেন সাহেবের কাছে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল।

সেন সাহেব সি. বি. গুপ্তাকে স্নেহের অভ্যর্থনা জানালেন, দুপুরে খাওয়া সেন সাহেবের সঙ্গে এক টেবিলেই হল। খোসগল্পে দু ঘণ্টা কাটিয়ে সি. বি. গুপ্তা সেখান থেকে বিদায় নিয়ে পুলিসের সঙ্গে চলে গেলেন।

বিক্ষুব্ধ মনের অসন্তোষ বা অপমানকর জ্বালার যে দাবদাহ অতুলপ্রসাদের

স্বদেশ সঙ্গীতে পাওয়া যায় তা তাঁর রাজনীতিতে অনুপস্থিত। সে ক্ষেত্রে কংগ্রেসী নেতারা অনেক বেশি সজীব ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন সংযমী ও উদার। অকপট দেশানুগত্য, সঙ্ঘবদ্ধতা এবং শাসনব্যবস্থায় ক্রমঅধিকারের দ্বারা একদিন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর আদর্শ। সবার ওপর জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের প্রতি প্রেমই ছিল অতুলপ্রসাদের রাজনীতি। শুধু রাজনৈতিক মতবাদে তিনি মডারেট ছিলেন না, স্বভাবেও তিনি প্রকৃত মডারেট ছিলেন।

কবি অতুলপ্রসাদ

স্বর্ণকুমারী দেবী অতুলপ্রসাদকে জলধর সেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ইনি 'উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী'র কবি।

রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, কাজী নজরুল এঁরা গীতকার আবার কবিরূপেও খ্যাত। কিন্তু অতুলপ্রসাদ কবিরূপে তত নয়, যত গীতকার রূপে সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

এর প্রথম কারণ হল স্বয়ং কবির আপনার সৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীনতা। তাঁর গীতিকাব্যও অজানার আড়ালে থেকে যেত যদি না গীতকার নিজেই একজন সুরকার এবং সুগায়ক হতেন। তাঁর গীতিকাব্যে নিজে সুর সংযোজন করে গাইতেন এবং অন্যদের যত্ন করে শেখাতেন। এইভাবে তাঁর গানের বহুল চর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের ধারণাও এজন্য অনেক পরিমাণে দায়ী। কাব্যের ওপর সুরের পোশাক চড়ালেই আমাদের কাছে তখন তা শুধুই গান; তার কাব্যমূল্যের কথা তখন আমরা সম্পূর্ণ ভুলে যাই। অন্যথায় প্রতিভার স্পর্শে সুর ও কাব্যের যে হরপার্বতী মিলন তিনি সম্ভব করে তুলেছেন তা আমরা উপভোগ করতে পারতুম।

তৃতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ কিছু সংখ্যক লোক অতুলপ্রসাদকে কবি বলে স্বীকৃতি দিতে আপত্তি তোলেন। তাঁদের মতে অতুলপ্রসাদের গীতিকাব্য থেকে সুরের সাজসজ্জা সরিয়ে নিলে কাব্য আর প্রায় থাকেই না। তাঁরা

তাঁদের মন্তব্য জোরদার করতে অতুলপ্রসাদেরই বক্তব্য উল্লেখ করে দেখান। অতুলপ্রসাদ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুরোধের উত্তরে শ্রীঅমল হোমকে লিখেছিলেন—"সুর ছাড়া আমার গানগুলি বড়ই ছন্দহীন, ছন্দের রাজার কাছে তাহা কি করিয়া পাঠাইব?"...

অতুলপ্রসাদ উপরোক্ত মন্তব্য করে থাকলেও ওর বেশির ভাগই বিনয়। তাঁর এমন প্রচুর গীতিকবিতা আছে যা সুর সংযোজনের অপেক্ষা রাখে না, শোনামাত্র কণ্ঠে সুর আপনিই গুনগুনিয়ে ওঠে এমনিই তা ছন্দবদ্ধ-মাধুর্যময়। যেমন :

"মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে,
মোরা নাচি সুরধনী-কূলে-কূলে।"......

"ঝরিছে ঝর-ঝর গরজে গর গর
স্বনিছে সর সর শ্রাবণ মাঃ।"......

"মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে,
ও আকাশ, বল্ আমারে।" .....

"বাদল ঝুম্ ঝুম্ বোলে
না জানি কী বলে।"......

আবার গীতাকারে অতুলপ্রসাদের এমন অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা আছে যার থেকে সুরের ওড়না সরিয়ে নিলে তাঁকে সার্থক কবি বলে স্বীকার করতে সঙ্কোচের অবকাশ থাকবে না। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটির উদ্ধৃতি দেওয়া হল। যেমন :

"এত হাসি আছে জগতে তোমার,
বঞ্চিলে শুধু মোরে।"......

"আবার যখন প্রভাত হবে
মেঘগুলি সব সরে যাবে।"......

"রাতারাতি করল কে রে ভরা বাগান ফাঁকা?"...

"যতই গড়ি সাধের তরী, যতই করি আশা,"......

পরিশিষ্ট

অতুলপ্রসাদ শুধু কবি নন, বাংলা কাব্যক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের পরিমাপ করতে হলে সবার আগে গীতিকাব্যের উদয়কাল ও তার প্রাণধর্ম সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় জীবনের দিকে দিকে যে নবজাগরণের সঞ্চার হয়েছিল তার মূলে ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সংযোগ। অপ্রাপ্যণীয়র জন্য সুদূর স্বপ্নসাধনা, প্রাচীনের পুনরুজ্জীবন ও মানবীয় বৃত্তিসমূহের নিরঙ্কুশ বিকাশ সাধনের অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা এই ছিল রেনেসাঁর লক্ষণ। এ বিষয়ে ইংরেজ কবি ওয়র্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স-এর সৃষ্টি বিদগ্ধ বাঙালীকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত ও উৎসাহিত করে।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য হল রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ আখ্যায়িকা ইত্যাদি যার মধ্যে স্রষ্টার ব্যক্তিমানসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালের গীতিসাহিত্য চর্যাপদ, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী ইত্যাদিতে ব্যক্তিমানস থাকলেও তা অপ্রত্যক্ষ। ক্রমে প্রাচীন ভারত ও তার সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলুম; সাহিত্য-স্রষ্টাদের সম্বন্ধে আগ্রহ তো প্রায় নিঃশেষ হয়েই ছিল।

ইউরোপীয় সাহিত্যের সংস্পর্শে আসার নানা অবদানের একটি হল গীতি কবিতা। কাব্যের মাধ্যমে কবির ব্যক্তিমানস প্রকাশমান হল যার ফলে সার্থক গীতিকাব্য সৃষ্টি হতে থাকল।

কিন্তু আমাদের দেশে গীত ও গীতিকাব্যের ভিন্নতা একটু শিথিল দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে। গীতিকাব্য বিশেষ ভাবেই কবিতা, সুর প্রয়োগে তা কাব্যসঙ্গীত হয়ে ওঠে। এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি। কবির আত্মভাবনার স্বগতোক্তিরূপ, কল্পনায় অবাস্তব জীবনে স্বচ্ছন্দ বিহার, বিচিত্র সৌন্দর্য পিপাসা, আশাতীত প্রেমের প্রত্যাশায় করুণ বিলাপ; প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে অদম্য আকাঙ্ক্ষা, অকারণ বিষাদ বৈরাগ্য, জীব ও জগতের প্রতি এক প্রকার জন্মান্তরীণ সৌহার্দ্যবোধ ইত্যাদি গীতি কবিতার মূলাধার। এজন্য উত্তম গীতিকবিতা রচনায় প্রয়োজন সুতীব্র অনুভূতি এবং স্নিগ্ধ, সুকুমার, ব্যঞ্জনাময় সুমধুর ভাষা।

অতুলপ্রসাদ রচিত গীতিকাব্য—

"বিফল সুখ-আশে জীবন কি যাবে ?"··· / "হে অজানা, আমি তোমায় জান্‌ব কবে"··· / "মধুকালে এল হোলি—মধুর হোলি !"··· / "ওগো নিঠুর দরদি, এ কী খেলছ অনুক্ষণ"··· / "প্রকৃতির ঘোমটাখানি খোল্‌ লো বধূ !"··· / "যদি দুখের লাগিয়া গড়েছ আমায়,"··· / "সন্ধ্যাতারা জ্বলিছে গগনে আয় আয় চাঁদিয়া !" ইত্যাদি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যা উপরোক্ত লক্ষণ-সহ ভাবের গভীরতায়, উপলব্ধির নিবিড়তায়, প্রকাশের বিচিত্রতায় এবং পেলব ব্যঞ্জনাময় ভাষায় অপূর্ব।

গীতিকাব্যে কবি যেমন কল্পনায় জগতের অন্ধিসন্ধিতে তেমনি জাতির জীবনের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে বিচরণ করে বেড়ান। সে বিচরণে তাঁর অনুভব তিনি গীতিকাব্যের মারফত ব্যক্ত করেন।

অতুলপ্রসাদ তাঁর এ জাতীয় গীতিকাব্যে তাঁর মন্ময় অনুভূতির যে বাঙ্ময় রূপ দিয়েছেন তার অনবদ্য প্রকাশ হল স্বদেশ সঙ্গীত "ভারত-ভানু"।

পুনরায় প্রাচীন ভারত স্মরণ পথে এলো, তাকে নিয়ে কাব্য রচিত হল, কিন্তু সে রচনায় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও নতুনত্ব সুপরিস্ফুট ; কবির বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠল ভারতের গৌরবময় স্বর্ণযুগকে স্মরণ করে :

"ভারত-ভানু, কোথা লুকালে······
আছে অযোধ্যা, কোথা সে রাঘব ?
আছে কুরুক্ষেত্র, কোথা সে পাণ্ডব ?
আছে নৈরঞ্জনা, কোথা সে মুক্তি ?
আছে নবদ্বীপ, কোথা সে ভক্তি ?
আছে তপোবন, কোথা সে তপোধন ?
কোথা সে কালা কালিন্দী-কূলে ?···

আবার অতুলপ্রসাদ রচিত :—

"কেন তারে পাই নে দেখা নয়নে ?"···

"আমারে এ আঁধারে এমন করে চালায় কে গো ?"···অথবা জাতীয় গানগুলি যথার্থ রোম্যান্টিক গীতিকাব্য। যা পাওয়া বা বোঝার বাইরে, যা তিনি নিজের কবিসত্তা দিয়ে শুধু অনুভব করতে পারছেন, যা

অস্পষ্ট থেকে তাঁর মনকে যন্ত্রণায় কাতর করে তুলছে তাই-ই তাঁর অন্তরকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছে। অবুঝ, অশান্ত তাঁর কবিসত্তা ছন্দময় ধ্বনির দ্বারা হাহাকার করে অতৃপ্ত বাসনা ব্যক্ত করছেন। ইংরাজ রোম্যান্টিক কবিত্রয়ের মধ্যে বিশেষ করে শেষোক্ত দুজনের কাব্যে এই জাতীয় লক্ষণ

অতুলপ্রসাদের প্রায় সব গীতিকাব্যই তাঁর কবিচিত্তের করুণ হাহাকার বলা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে ব্যর্থতার দরুন অতুলপ্রসাদ দিবারাত্র পীড়িত হয়েছেন; তাঁর স্পর্শকাতর সুকুমার মন এবং তাঁর কবিসত্তা যা তাঁর ব্যক্তি-সত্তার সঙ্গে সর্বদা অভিন্ন ছিল, জীবনের প্রতি পদে বেদনাবোধে তাঁকে অস্থির করেছে। এক্ষেত্রে তাঁর সে অবস্থা কবি কীট্‌সের সঙ্গে তুলনীয়। সে নিপীড়নকে প্রতিরোধ করতে কবি অতুলপ্রসাদ তাঁর কাব্যকুঞ্জের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছেন: হৃদয়ের বেদনাকে কাব্যের মাধ্যমে মুক্তি দিয়ে বলেছেন :—

"ওগো দুঃখসুখের সাথি,
সঙ্গী দিন রাতি, সঙ্গীত মোর
তুমি ভবমরুপ্রান্তর-মাঝে
শীতল শান্তির লোর।"......

তাঁর যন্ত্রণাময় কবিসত্তা, উপরোক্ত কাব্যিক অভিব্যক্তি ও পলায়নী প্রবৃত্তি যথার্থ রোম্যান্টিক বা গীতিকবির লক্ষণ।

অতুলপ্রসাদ গীতিকাব্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে বহু কবিতাও রচনা করে-ছিলেন। কিন্তু তাঁর কবিতাগুলি অধুনা অবলুপ্ত বাংলা মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকার জীর্ণ পাতায় ধূলিধূসরিত হয়ে চাপা পড়ে আছে। তার বেশির ভাগই হয়তো এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে। তাঁর রচিত ভিন্ন রসের দুটি কবিতা এখানে দেওয়া হল। প্রথমটির নাম—"অর্ঘ্য"।

এনেছি হে বিশ্বনাথ, এ সুপ্ত নিশীথে,
গুপ্ত অর্ঘ্য মোর; অন্ধ আঁধার সঞ্চিত
সুগন্ধ কুসুম, লক্ষ নাগ-সুরক্ষিত
কণ্টক-কেতকী—লহ তারে নাগ-নাথ!
এ কি বিশ্বেশ্বর! কেন বহে অশ্রুধার

ত্রিনেত্রে তোমার ? পড়েছে কি মনে
শিবশূন্য দক্ষযজ্ঞে সতীর ক্রন্দন
লাঞ্ছিত প্রেমের সেই চরম আহুতি ?
জেগেছে কি পূর্বস্মৃতি, হে রুদ্র সন্ন্যাসী
তোমার সে প্রলয়ের প্রলয় নর্তন ?
জাগিল কি মনে পার্বতীর প্রেমালাপ
মানস-সরসী-তটে নির্জন কৈলাসে ?
লহ তবে, হে বৈরাগী, জাহ্নবীর তীরে
এ দীনের মহাদান পূত নেত্র-নীরে।

দ্বিতীয়টি :—

"সাগর-বক্ষে জ্যোৎস্না সুন্দরী"

এসো গো আজ চাঁদ-বদনী স্বর্ণ-উজল সাজে ;
ঢেউগুলি তাই নাচে ;
উল্লসিয়া কল্লোলিয়া ঢেউগুলি তাই নাচে।
নীল সাগরের বক্ষে আজি লক্ষ ঘুঙুর বাজে !
সোনার নায়ে সোনা গায়ে কে এলো গো রাণী !
ঘোমটাখানি টানি,
মাঝে মাঝে নীলাম্বরীর ঘোমটাখানি টানি।
তোমার মনে কি আছে তা জানি ওগো জানি।
ঘরের বাহির করবে মোরে—এই তো আছে মনে ?
তাই তো সংগোপনে,
হাওয়ার সনে কানাকানি তাই তো সংগোপনে ;
মেঘের আঁচল পড়ছে খসে তাই তো ক্ষণে ক্ষণে !
আমি যদি আপন হতেই দিই তোমারে ধরা ?
মিথ্যে যতন করা !
অমন করে মন-ভোলানোর মিথ্যে যতন করা।
তোমার তরেই বসে আছি, ওগো স্বয়ম্বরা ![১]

১—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—"বক্তব্য"।

অতুলপ্রসাদের গান ও সুর

আউধের শেষ নবাব সঙ্গীতানুরাগী ওয়াজিদ আলি শা কলকাতায় মেটিয়াবুরুজে বন্দীজীবন যাপন করেছেন আর "অতুলপ্রসাদ বাংলার দূত হয়ে লক্ষ্ণৌয়ে প্রবাসী হয়েছেন। একেই বলে ইতিহাসের প্রতিশোধ। অতুলপ্রসাদের লক্ষ্ণৌয়ে বাস বাংলাদেশের সঙ্গীত ইতিহাসে একটি আধুনিক অধ্যায়"।[১]

শুধু আধুনিক অধ্যায় নয়, একটি বিশেষ অধ্যায়। গীতকার অতুলপ্রসাদের জীবন ও গান এক অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে বাঁধা। গান ছিল তাঁর কাছে যাকে বলে 'frint for soul' প্রাণরসের উৎস। তাই তাঁর জীবন কাহিনীতে তাঁর গানের কথা না বললে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

অতুলপ্রসাদ তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার দ্বারা বাংলার সুরধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সুরধারার সংযোগ সাধন করেই ক্ষ্যান্ত হন নি, নব নব সম্পদে বাংলার সঙ্গীতের ডালাটিকে ঐশ্বর্যে, মাধুর্যে পূর্ণ করেছেন। তাই অতুলপ্রসাদের লখনৌ বাস বাংলা সঙ্গীত জগতের দেওয়া-নেওয়ার এক সুবর্ণ অধ্যায় বলা যায়।

অতুলপ্রসাদের সঙ্গীত সাধনা এবং সঙ্গীতে অবদানের মূলে একাধিক কার্যকারণের যোগাযোগ ছিল। অতুলপ্রসাদের সঙ্গীতপ্রিয়তা ও তাঁর সুরেলা কণ্ঠস্বর বংশগত। সঙ্গীতানুরাগী পিতার সঙ্গ, মাতামহের সঙ্গীতচর্চা ও মাতুলালয়ে সাঙ্গীতিক পরিবেশ তাঁর শৈশবকালেই মনকে সুরের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। যখন সংস্কৃত বুঝতেন না তখনো তার ভাষার ছন্দবদ্ধ সুর তাঁর মনে দোলা দিয়েছিল। বালক বয়সেই তিনি একাধিক যন্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। ওঁদের গৃহে ব্রাহ্ম সভায় গান করতেন এবং মাতামহের সঙ্গে নগর-সংকীর্তনে পথ প্রদক্ষিণ করতেন।

গান ছিল তাই অতুলপ্রসাদের শোণিতে, কণ্ঠে ও মনে। তাঁর মত সুরেলা মনের মানুষ বড় দুর্লভ। অতুলপ্রসাদের গান ও সুর তাদের স্রষ্টার চরিত্র ও মনের প্রতিকৃতি—শান্ত, সংযত, উদার, করুণ, সহজ সরল যদিও তার প্রকাশে বৈচিত্র্য আছে কিন্তু ভাষায়, সুরে ও তার অভিব্যক্তিতে

১—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : "বক্তব্য"।

কোথাও জটিলতা নেই। এদিক দিয়ে আমাদের সহজিয়া কবিদের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। আবার তিনি ভক্তও ছিলেন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে ভক্তিভাব প্রবল হয়ে ওঠে। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান শুনতে শুনতে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠত। জীবনে আঘাত পেয়ে তাঁর মন গভীর ঈশ্বরানুরাগে অভিভূত হয়। ভগবৎপ্রেমের আলোয় তিনি মানবজীবন ও মানবসেবাকে প্রেমের দৃষ্টিতে দেখতে শিখলেন; প্রেমই তখন তাঁর জীবনে প্রথম ও প্রধান হয়ে উঠল। মানুষ অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে দিলীপকুমার রায় লিখেছেন, "...মানুষ হিসাবে তিনি কত বড় ছিলেন আজকালকার সাহিত্যের পাতায় বলতে সঙ্কোচ হয়।.....সে দরাজ প্রাণ, কোমল, পেলব, মধুর প্রাণ—সব যে তাঁর গানের শাখায় শাখায় বেঁধেছে নীড়—রচনা করেছে মণিমঞ্জুষা! সে মঞ্জুষার ডালা খুলতে গেলেই সুরের সাথে যে বিছিয়ে যায় তাঁর প্রাণের সৌরভ, প্রেমের আলো!"[২]

এমনিই প্রেমের মানুষ, সুরের মানুষ এলেন গানের দেশ লখনৌয়ে।

লখনৌ নবাবের দেশ। তখন নবাব চলে গেছেন ইতিহাসের পাতায় কিন্তু নবাবী পরিবেশ রয়ে গেছে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের জন্য সংযুক্ত প্রদেশ বিখ্যাত, লখনৌ হল তার আড্ডাখানা। সেখানে সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে মজলিসী আবহাওয়া।

অতুলপ্রসাদের সঙ্গীতরসিক মন, প্রীতিপূর্ণ হৃদয় ও দিলদরিয়া মজলিসী স্বভাব সহজেই হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও তার আবহাওয়ার অনুরক্ত হয়ে পড়ল। শুধু কি সঙ্গীত? এদেশীয় ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকে অন্তরের সঙ্গে ভাল-বাসলেন—বিশেষ করে কবীরের দোঁহা, তুলসীদাসের ভজন। মীরার ভজনও তাঁর খুব প্রিয় ছিল। এদেশীয় লোকগীতিতে 'প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ততা দেখেছেন এবং তা গ্রহণ করেছেন। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে নতুন স্বপ্ন দেখেছেন।

পুরাতনের সেই অস্তমিত যুগে তিনি তাই লখনৌয়ের ঐতিহ্য হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে সজীব রাখতে উদ্যোগী হলেন; প্রস্তাব করলেন একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপনের। এ কাজে রাজা নবাব আলি, এবং রায় উমানাথ বলির

২—দিলীপকুমার রায়—"সুরেলা"।

সঙ্গে মিলিত হলেন। স্থাপিত হল 'ম্যারিস মিউজিক কলেজ' যা এখন 'ভাতখণ্ড সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়' নামে পরিচিত।

অতুলপ্রসাদ বহু হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বিশারদদের সংস্পর্শে এলেন, তাঁদের সঙ্গে হৃদ্যতা হল। তাঁদের কাছে খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি শুনলেন এবং মুগ্ধ হলেন। তবে ঠুংরির সুরবৈচিত্র্য, ভাবমাধুর্য ও কমনীয়তায় তাঁর মন বাঁধা পড়ল।

আউধের শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শা'র রাজত্বকালে লখনৌ শহরকে আধুনিক ঠুংরির জন্মস্থান বলা যায়। নবাব স্বয়ং ঠুংরির অনুরাগী এবং সমঝদার ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় লখনৌয়ে এ গানের বহুল প্রচার হয় এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সমশ্রেণীভুক্ত হয়। ওয়াজিদ আলি শা'র সভাগায়ক ঠাকুরপ্রসাদ ঠুংরি গানের ওস্তাদ ছিলেন। নবাব নিজেও ঠুংরি গাইতেন এবং ঠুংরিগায়ক হিসাবে তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'আখতার পিয়া'।

ঠাকুরপ্রসাদের পুত্র বিন্দাদীন এবং কালকা মহারাজ ঠুংরি গানের প্রচুর উন্নতিসাধন করেন। ওঁদের সমসাময়িক লালন পিয়া, সনদ পিয়া, কদর পিয়া এবং সুখদ পিয়া ঠুংরির ধারাকে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যান।

প্রাচীন সাহিত্যে কালিদাসের নাটক, 'মালবিকাগ্নি মিত্র'-তে ঠুংরির উল্লেখ পাওয়া যায়। ওয়াজিদ আলি শা'র পূর্বে ঠুংরি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 'ঠুং', 'রি'—এই শব্দের দ্বারা বোঝায় ঠমকের দ্বারা খুশি করা অর্থাৎ নাচের গান। আগে গ্রাম্য রমণীরা নাচের সঙ্গে ঠুংরি গাইতেন। মঞ্চে বসে ঠুংরি গাওয়ার রীতি ষাট সত্তর বছর মাত্র।

ঠুংরি গানের বিষয়বস্তু হল রাধাকৃষ্ণের লীলা। তাই এ গান সজীবতায়, মূর্ছনা, ঝঙ্কার, ভাবাবেশ, মধুরতা, পেলবতায় পরিপূর্ণ। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ঠুংরি হল সবচেয়ে মধুরতম গান।

ঠুংরি দুই প্রকারের—বোলবাট ও বোলবনাও। দ্বিতীয় প্রকারের ঠুংরির প্রচলন ও জনপ্রিয়তা বেশি, তার কারণ এই প্রকার ঠুংরিতে শব্দ ও অর্থের অনুরূপ সুর প্রয়োগ করা হয়। সেজন্য ভাবের অভিব্যক্তি, সুরের চমৎকারিত্ব এবং কলাসৌন্দর্যে এই ধরনের ঠুংরি এক কথায় অপূর্ব। কাফি, খাম্বাজ, পিলু, তিল, ঝিঁঝিট, মানড্, ভৈরবী—যে-সব রাগ শৃঙ্গার, করুণ, শান্ত সেই সব রাগেই ঠুংরি গাওয়া হয়।

ঠুংরির শৈলী তিন প্রকার—বারাণসী, লখনৌ ও পাঞ্জাবী। অবশ্য প্রথম দিকে লখনৌ ও বারাণসী শৈলী একই রকম ছিল। পরে লখনৌ শৈলী পাঞ্জাবী শৈলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। অতুলপ্রসাদ লখনৌবাসী হয়েও এবং বিন্দাদীন ও কালকা মহারাজের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও ঐ বারাণসী শৈলীর অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তার তরঙ্গায়িত সুর ও কারুকার্য অতুল-প্রসাদের কবিমনকে সহজেই আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করে। বাংলা গানে অতুলপ্রসাদের সর্বপ্রথম অবদান হল ঠুংরির আমদানি।

দ্বিতীয়, সুরের স্বাধীনতা। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে বিশেষ করে খেয়ালে সুরের আলোছায়া ও তার মুক্তবিহার অতুলপ্রসাদকে মুগ্ধ ও প্রভাবিত করে।

বাংলাদেশের গানে কথার চেয়ে সুরকে কোনদিনই প্রাধান্য দেওয়া হয় নি। বাণীকে রূপ দেবার জন্যই সেখানে সুরের প্রয়োজন। বাংলা গান তাই কথার ছকে বাঁধা; সুর বাণীকে অনুসরণ করে চলে, বাহন করে চলে না।

বাংলার বাইরে এসে অতুলপ্রসাদ সুরের স্বাধীনতার মর্ম বুঝলেন এবং সর্বান্তকরণে তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলেন। সুর রচনার ক্ষেত্রে তিনি এরপর যেন সুরের যাদুকর হয়ে উঠলেন।

তৃতীয়, সুর মিশ্রণ। অতুলপ্রসাদ দীর্ঘকাল দেশছাড়া হলেও তাঁর মনটি ছিল বাংলার শ্যামল মাটি দিয়ে গড়া। তাই সুর মিশ্রণের কাজ আরম্ভ করলেন বাংলার কীর্তন বাউল ইত্যাদি দিয়ে যা একান্ত বাংলাদেশের লৌকিক রীতি। এ বিষয়ে তাঁর পথপ্রদর্শক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

কীর্তনাঙ্গ বাউল সুর অতুলপ্রসাদের বিশেষ প্রিয় ছিল। এই সুরে তাঁর অতি পরিচিত গান, যেমন—"আর কতকাল থাকব ব'সে", "মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন দেশে" ও তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গান, "মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা" ইত্যাদি রচিত হয়েছে। বাংলা ভাষার ওপর এমন সুন্দর গান আর দ্বিতীয় রচিত হল না।

পরবর্তীকালে হিন্দস্থানী সঙ্গীতে অভিজ্ঞ হবার পর তিনি সুর মিশ্রণের কাজে আরো এক ধাপ অগ্রসর হলেন; তাঁর সুরারোপের ধারা নতুন পথে প্রবাহিত হল। হিন্দুস্থানী খেয়ালের সুরধারায় তিনি যেন নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলেন, তাকে গ্রহণ করলেন। এর দ্বারা তিনি এখন থেকে

রবীন্দ্রনাথের বিপরীত মার্গে চলা শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদের দ্বারা প্রভাবিত।

খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরির সুরে বাংলা শব্দ প্রয়োগ করে অতুলপ্রসাদ গান রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। "সে ডাকে আমারে বিনা সে সখারে", "যাব না যাব না যাব না ঘরে", "ডাকে কোয়েলা বারে বারে" গানগুলি খেয়ালের সুরে রচিত।

টপ্পার সুরে গান রচনার দক্ষতা অতুলপ্রসাদের পূর্বে নিধুবাবু দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে অতুলপ্রসাদের কৃতিত্ব হল মিশ্র টপ্পার সুরে বাংলা গান পরিবেশনে। যেমন, টপ্পা ও খেয়ালের মিশ্রিত সুরে, "পাগ্‌লা মনটারে তুই বাঁধ," টপ্পা ও ঠুংরির মিশ্রিত সুরে "ওগো নিঠুর দরদি", "কে গো তুমি বিরহিণী" ইত্যাদি।

ঠুংরি হল অতুলপ্রসাদের অত্যন্ত প্রিয় সুর। ঠুংরি, মিশ্রিত ঠুংরিতে তিনি বহু গান রচনা করেছেন, আবার ঠুংরির খোঁজ লালিত্য, কমনীয়তা তাঁর প্রায় সব গানেই তিনি ব্যবহার করে মধুরতম বিচিত্রতম রূপ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর অনন্যসাধারণ দক্ষতার মূল কারণ অতুলপ্রসাদ সুরকাররূপে ঠুংরির টেকনিক সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। মিশ্র ঠুংরির সুরে তাঁর বিশেষ পরিচিত গান, "চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে", "বাদল ঝুম্ ঝুম্ বোলে," "শ্রাবণ-ঝুলাতে বাদল-রাতে"। শেষোক্ত গান দুটি হিন্দী ভাষীদের মধ্যেও জনপ্রিয় ছিল। বেনারসের তৎকালীন মোতিবাঈ, সিদ্ধেশ্বরীবাঈ বিখ্যাত গায়িকাদ্বয় বহুবার উক্ত গান দুটি গেয়ে আনন্দ পেয়েছেন।

গম্ভীর ধ্রুপদ সুরে অতুলপ্রসাদ তার প্রাণের স্ফূর্তি খুঁজে না পেলেও মিশ্র ধ্রুপদ সুরে তিনি দু একটি গান রচনা করেছেন। যেমন, "নমোবাণী বীণাপাণি" ও "ক্ষমিয়ো হে শিব"।

হিন্দুস্থানী সুরে রচিত অতুলপ্রসাদের গানগুলি এতই উৎকৃষ্ট যে সভায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পর গাইলে তা মোটেই অসঙ্গত বা বেমানান মনে হবে না।

উর্দু ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়ায় লখনৌয়ে ইসলামীয় সুর গজলের সঙ্গেও অতুলপ্রসাদের পরিচয় ঘটে। গজল সুরে তিনি যে কটি বাংলা গান রচনা করেছেন তার বুঝি তুলনা নেই। অবশ্য কাজী নজরুলও গজল সুরে প্রচুর বাংলা গান রচনা করে বাংলাদেশে গজলের প্লাবন এনেছিলেন। তবে

বাংলাদেশে গজল সুরের প্রথম প্রবর্তক সম্ভবতঃ অতুলপ্রসাদ। "কত গান তো হলো গাওয়া" তাঁর শ্রেষ্ঠ গজল।

অতুলপ্রসাদের সঙ্গীত-পরিশীলিত মন সব রাগরাগিণীর সঙ্গে পরিচিত থাকলেও খাম্বাজ, কাফি, পিলু, দেশ, বেহাগ, ভৈরবী তাঁর প্রিয় রাগ ছিল, বিশেষ করে "ভৈরবী রাগ ও ঝাঁপতাল তাঁর খুবই প্রিয় ছিল।"[৩]

হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতধারাকে অতুলপ্রসাদ যেমন অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তেমনি উত্তরপ্রদেশের লোকগীতিকেও আনন্দে বরণ করে নিয়েছিলেন। হিন্দুস্থানী লোকগীতি, "মহারাজ কেওড়িয়া খোল" গানটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এদেশীয় সাওয়ানী, লাউনী, কাজরী, ঝুলন, হোলি, রেক্তাই সুরে তিনি নানা বাংলা গান রচনা করেছেন যা সত্যিই অপূর্ব।

তাঁর রচিত সাওয়ানী সুরের গান, "ঝরিছে ঝর ঝর" শুনলেই মনে হয় যেন বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দ কানে ভেসে আসছে। লাউনী সুরের গান, "তুমি মধুর অঙ্গে নাচ গো রঙ্গে" এক অনবদ্য সৃষ্টি বলা যায়। কাজরী সুরে, "জল কহে চল্ মোর সাথে চল্" গানটিতে দ্রুত প্রবাহিত জলের ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

উত্তর প্রদেশে 'হোলি' উৎসবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলায় হোলির গান রচনা করেছেন, "এসো দুজনে খেলি হোলি" বা "মধুকালে এল হোলি"।

কীর্তনের সুরে তাঁর গান, "কতকাল রবে নিজ যশ বিভব অন্বেষণে" ও বাউল সুরে, "প্রবাসী চল্রে দেশে চল" উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁর ভক্তি-সঙ্গীতের মধ্যে বাউল সুরে, "আমারে এ আঁধারে এমন করে চালায় কে গো" গানটি অসামান্য। সাধারণ লৌকিক সুরে এমন আধ্যাত্মিক ভাবের গান রচনায় তাঁর প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

নদীর দেশের মানুষ অতুলপ্রসাদ ভাটিয়ালী গানের কথা স্মরণ রেখেছেন। উক্ত সুরে শুদ্ধ ভাষায় তাঁর ভাটিয়ালী গান, "কিষাণ ভাই, তুমি, কি ফসল ফলাবে।"...তিনিই প্রথম বাংলা গানে ভাটিয়ালী সুরকে উচ্চ আসনে স্থান দিয়েছেন।

৩—শ্রীকৃষ্ণ রতনজঙ্কার—চিঠি।

লোকগীতির সাধারণ সুরে অতুলপ্রসাদ বৈচিত্র্য ও গতি প্রয়োগ করে তাকে মনোহারিণী করে তুলেছেন—এই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

অতুলপ্রসাদের লোকোত্তর সঙ্গীতপ্রতিভা প্রদেশীয় গণ্ডির বাধা মানে নি। উত্তর প্রদেশীয় সুরের সঙ্গে সঙ্গে গুজরাটী সুরের সঙ্গেও আমাদের পরিচিত করিয়েছেন। "আজি হরষ সরসি কি জোয়ারা" গুজরাটী খাম্বাজ সুরের গানটি তারই নিদর্শন।

দক্ষিণ-ভারতীয় কর্ণাট সুরও অতুলপ্রসাদের মন আকৃষ্ট করেছে। উক্ত সুরের গানটি হল, "বিঘ্নহরণ সুখবিধায়ক নায়ক"।

অতুলপ্রসাদের সঙ্গীত রচনায় তাই সুস্পষ্ট দুটি ধারাকে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ধারা—রাগপ্রধান গানের সুরে বাংলা গান এবং দ্বিতীয় ধারা—উত্তর প্রদেশীয় লোকগীতি ও বাংলা লৌকিক রীতি।

ভারতীয় সঙ্গীতজগতে সুরের ক্ষেত্রে সংমিশ্রণের মধ্যে যে বিমুগ্ধ ইন্দ্রজাল আছে অতুলপ্রসাদ তা শুধু আবিষ্কারই করেন নি, তার ব্যবহারে এবং বিভিন্ন রীতিনীতির কলাকৌশলে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি যে কত বড় কম্পোজার বা সুরকার তাই-ই প্রমাণিত হয়।

সুরের প্রতি অতুলপ্রসাদের অতি আগ্রহ ও পক্ষপাতিত্বর জন্য অনুযোগ করা হয় তাঁর ভাষা শিথিলতা দোষে দুষ্ট। রবীন্দ্রনাথের মতে তা অন্যায় নয়, কারণ, "……সঙ্গীতের দ্বারা যখন আমরা ভাব ব্যক্ত করিতে চাহি তখন কথাকে উপলক্ষ মাত্র করাই আবশ্যক; কথার দ্বারাই যদি সকল কথা বলা হইয়া যায়, তবে সঙ্গীত সেখানে খর্ব হইয়া পড়ে। কথার দ্বারা আমরা যাহা ব্যক্ত করিয়া থাকি তাহা বহুল পরিমাণে সুস্পষ্ট, সুপরিস্ফুট—কিন্তু আমাদের মনে অনেক সময় এমন সকল ভাবের উদয় হয় যাহা নামরূপে নির্দেশ বা বর্ণনায় প্রকাশ করিতে পারি না, যাহা কথার অতীত, যাহা অহৈতুক, সেই সকল ভাব, অন্তরাত্মার সেই সমস্ত আবেশ উদ্বেগগুলি সঙ্গীতেই বিশুদ্ধরূপে ব্যক্ত হইতে পারে।"

গানে শব্দের যেখানে শিথিলতা সেখানে সুর পরিপূরকের কাজ করে। সুরকারের সে অধিকার আছে, গানে সুর সংযোজনের সময় সুরকার তাঁর ইচ্ছামত সুরের দাবিকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন বা শব্দ বিশেষকে হ্রস্ব বা দীর্ঘ করতে পারেন। প্রায়শ উচ্চাঙ্গের রাগরাগিণীবিশিষ্ট গানে এ উদাহরণ

দেখতে পাওয়া যায়। অতুলপ্রসাদও সে পন্থা অনুসরণ করেছেন। তবে তার মানে এই নয় যে অতুলপ্রসাদের সব গানই শিথিলতাদোষেদুষ্ট এবং তিনি সে দোষ সর্বদা সুরের পক্ষপুটে আড়াল করে রেখেছেন।

অতুলপ্রসাদের 'গীতিগুঞ্জ'-এ তাঁর গানকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে —দেবতা, প্রকৃতি, স্বদেশ, মানব, বিবিধ। 'প্রকৃতি' এবং 'বিবিধ'-এ তাঁর রচিত প্রেমসঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় হয়। প্রকৃতি সম্বন্ধে অতুলপ্রসাদ খুব কম গান রচনা করেছেন। তবে যে কটি রচনা করেছেন তা প্রকৃতির মতই সহজ, স্বাভাবিক, লালিত্যময় ও মাধুর্যময়। প্রকৃতি বিষয়ক রবীন্দ্রসঙ্গীতে যে অতীন্দ্রিয়ের স্পর্শ আছে তাঁর গানে তা অনুপস্থিত। "মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন দেশে" যেমন সহজাত, সার্থক রচনা তেমনি "প্রকৃতির ঘোমটা-খানি খোল" একটি অপূর্ব রোম্যান্টিক নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের নায়িকারা যেমন অতিবাস্তব আবার স্বপনচারিণীও বটে। অতুলপ্রসাদের নায়িকারা ঠিক তেমন নয় তবে তারাও যেন রক্তে মাংসে বাস্তব মানুষ; তাদের বিরহ, অভিমান, আনন্দ, লজ্জা যেন নিত্য দিনের ঘটনার মতই স্বাভাবিক। "কে আবার বাজায় বাঁশি"; "বধূ, ধর ধর মালা, পর গলে"; "তুমি মধুর অঙ্গে"; "একা মোর গানের তরী"—এই সকল গানে সে বিভিন্ন ভাব সুপরিস্ফুট।

বিবিধ-এ এমন কতকগুলি গান আছে, যেমন—"বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখি পাতে" বা "আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর" বৈষ্ণব ভাব দ্বারা প্রভাবিত।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসঙ্গীত সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে অতুলপ্রসাদ বলেছেন যে, ঐ গানগুলি রচনার পর তিনি যদি আর একটিও গান না লিখতেন তবু তিনি কবি বলে অমরতা লাভ করতেন।

ঠিক ঐ কথা আমরা অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধেও বলতে পারি। তাঁর রচিত প্রত্যেকটি স্বদেশসঙ্গীত অপূর্ব। বিদেশী সুরে রচিত তাঁর প্রথম স্বদেশী গান "উঠ গো, ভারত-লক্ষ্মী" ভিন্ন সুরে বাংলা শব্দ প্রয়োগে গান রচনা এই ছিল তাঁর প্রথম ও সার্থক প্রয়াস যে বিষয়ে পরবর্তীকালে তিনি অভাবনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর স্বদেশসঙ্গীতে ক্ষোভ আছে, লজ্জা আছে কিন্তু তিক্ততা নেই। "হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর"; "খাঁচার গান গাইব না আর";

"মোদের গরব মোদের আশা"—প্রত্যেকটি কল্পনায়, প্রেরণায়, ভাবে, গুণে অনবদ্য।

স্বদেশসঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের নাম একেবারে প্রথম সারিতে। নজরুলও বহু স্বদেশ সঙ্গীত রচনা করেছেন এবং তাঁর "দুর্গম গিরি কান্তার মরু" গানটি অবিস্মরণীয়। শৌর্য-বীর্য-ওজঃ গুণে দ্বিজেন্দ্রলাল অনন্যসাধারণ; নজরুলের গানেও ওজঃ গুণ বর্তমান। কিন্তু অতুলপ্রসাদের স্বদেশমাতৃকার বন্দনা গান সহজতায়, মধুরতায়, ভক্তির প্রগাঢ়তায় অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী।

এই বিভাগে রামপ্রসাদী মালসী সুরে গান "দেখ্ মা, এবার দুয়ার খুলে" হিন্দু মুসলমানের মিলনের উপলক্ষে রচিত। অতুলপ্রসাদ ভাবপ্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে কত বাস্তববাদী ছিলেন এটি তারই সাক্ষ্য।

অতুলপ্রসাদের 'দেবতা' পর্যায়ে গানগুলি তাঁর হৃদয় ব্যথায় জারিত দুঃখের লেখনী দিয়ে অশ্রুর আখরে লেখা। এজাতীয় গানে তাঁর প্রবল ঈশ্বরানুরাগ, শিশুর নির্ভরতা, বিষাদমধুর অভিব্যক্তি ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি কখনো অভিমান প্রকাশ করেছেন, কখনো দীনতা, কখনো প্রার্থনা আবার কখনো 'তুমিই সব' বলে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। কিন্তু রজনীকান্তর মত তাঁর কোনও গানে কোথাও পাপবোধ প্রকাশ পায় নি।

অতুলপ্রসাদ রচিত যে সব গানে উপরোক্ত ভাব প্রকাশ পেয়েছে সেগুলি সাধারণ স্তরের ভক্তিমূলক গান। কিন্তু তিনি শুধু গীতকার বা সুরকার নন, ভক্ত-সাধকও। তাঁর সে সাধনা গভীর বেদনার ও করুণ দুঃখের। সাধক সে সাধনায় দুঃখের সাগরে অবগাহন করে দুঃখাতীতের উপলব্ধি লাভ করেছেন, চৈতন্যস্বরূপের দিব্য অনুভূতিকে যেন স্বপ্নে, শব্দে, অদৃশ্য আকর্ষণে সর্বদা অনুভব করেছেন। এমনি গভীর ভাবের কয়েকটি গান হল, "কে যেন আমারে বারে বারে চায়"; "কেন তারে পাইনে দেখা নয়নে"; "আমারে এ আঁধারে"; "কে তুমি ঘুম ভাঙায়ে"।

এই জাতীয় উচ্চ অধ্যাত্মমূলক গান অতুলপ্রসাদ কত ও সহজ ভাষায় সরল ভাবে অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন দেখে আমাদের বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

তিনি তাঁর গানে নিজেকে পাগলা ক্ষ্যাপা, ভোলা, বাউল, বাতুল ইত্যাদি বলে উল্লেখ করেছেন। বাউল কবির মতই তিনি অনায়াস প্রয়াসে জীবনের

গভীর সমস্যা এবং পরম জিজ্ঞাসাগুলিকে সুরের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন ; তাঁর সে জিজ্ঞাসা সকল সাধক-ভক্তের অন্তরের জিজ্ঞাসা।

সঙ্গীত রচনায় তাঁর নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গি ছিল। সুরেলা অতুলপ্রসাদের কাছে সুরের আবেদন ছিল সবার আগে। সুর শুনে তিনি প্রথমে গুন গুন করে তা ভাঁজতেন ও পরে তাতে শব্দ প্রয়োগ করে গান রচনা করতেন।

তিনি নিজে সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। গান পরিবেশনের কালে সুরবিস্তার করে প্রথমে জমি তৈরী করতেন এবং এইভাবে গানকে অবসর দিতেন। সুরবিস্তার ও অবসর সম্বন্ধে তাঁর রণজিৎ সেনের সঙ্গে আলোচনা উল্লেখযোগ্য।

তবে এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে যে সব সময়েই তাঁর বাণী সুরের আল্পনার ওপর পা ফেলে চলত। ১৯১৬ সালে অতুলপ্রসাদ কলকাতা থাকতে সদলবলে একাধিকবার বনভোজনে গিয়েছিলেন। একবার লঞ্চে করে সুন্দরবনে পিকনিক করতে গিয়েছিলেন। যাবার পথে প্রকৃতির প্রাচুর্য ও সৌন্দর্য দেখে কবি অতুলপ্রসাদের কণ্ঠে সুর আসার আগেই বাণী ভীড় করে। তিনি তখন রচনা করেন—"ওরে বন, তোর বিজনে সঙ্গোপনে কোন উদাসী থাকে"। আসোয়ারী সুরে "আমার ঘুম-ভাঙানো চাঁদ" রচনার ইতিহাস হল একদিন কবি মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যেতে দেখেন জানলা দিয়ে চাঁদ হাসছে। তখনি মনে মনে গানটি রচনা করলেন, সুর দিলেন পরে।[৪] এমন ঘটনা অবশ্য কম, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুরই তার জয়মাল্য নিয়ে এগিয়ে আসত।

অতুলপ্রসাদ গান রচনাকালে শব্দকে নমনীত করে সুরেলা তৈরী করতেন। রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে লাল জুতো যেমন 'লাল জুতুয়া' হয়েছে তেমনি অতুলপ্রসাদের লেখনীতে চাঁদ একাধিকবার 'চাঁদিয়া' হয়েছে।

তাঁর গানে কমনীয় সুর, নমনীয় শব্দ ও মিড়ের সূক্ষ্ম ব্যবহারের সঙ্গে সঞ্চরিত হয়েছে অনুভূতির ঋজুতা ও সুর প্রয়োগে স্বকীয় নতুনত্ব ; সবার ওপর রয়েছে তাঁর করুণ হৃদয়ের ছাপ ও অভিজ্ঞ জীবনবোধ যার জন্য তা অনন্যসাধারণ রূপ নিয়েছে।

অনুযোগ করা হয় যে অতুলপ্রসাদের গীতিকাব্যে রবীন্দ্রপ্রভাবের ছায়া

৪—বিজনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়—চিঠি।

পড়েছে। পূর্বসূরীদের ধারা পরবর্তীদের কিছু প্রভাবিত করেই থাকে। রবীন্দ্রকাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব দেখা যায়।

নজরুলের মত শব্দচয়নেও অতুলপ্রসাদ অনেক সময় খুব সতর্ক মনোযোগ দেন নি। এর কারণ অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর হওয়ার জন্য অতুলপ্রসাদের প্রবল ভাবাবেগ তাঁর সৌন্দর্যবোধ ছাপিয়ে গিয়েছে। ফলে সাধারণ, অকাব্যিক শব্দ, যেমন 'পুকুর' কাব্যে প্রবেশ করে তার রসভঙ্গ করেছে। তেমনি "থেকে যায় কাঁটা তার বোঁটায়" শ্রুতিকটু শোনায়। আবার 'শঙ্খ' যার স্বর সুস্নিগ্ধ তার সঙ্গে 'ঢোল' যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় বেসুরো মনে হয়। অবশ্য আজকাল ডাস্টবিনও কাব্যজগতে স্থান পেয়েছে সে তুলনায় অতুল-প্রসাদের 'পুকুর' ইত্যাদি দোষণীয় বলা যায় না, তবে যে কালে এবং যে ধরনের গীতিকাব্য রচনা করেছেন তাতে উক্ত শব্দ ব্যবহার শ্রুতিসুখকর হয় নি।

অতুলপ্রসাদের বিরাট সাফল্যের তুলনায় ওটুকু খুঁত কিছুই নয়। তাঁর রচিত মাত্র দুশো আটটি গান পাওয়া গেছে যেখানে রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল আড়াই হাজার থেকে তিন হাজারের মত গান রচনা করেছেন। মাত্র ঐ কটি গান রচনা করে অতুলপ্রসাদ যে অমরতা লাভ করেছেন তা খুবই বিস্ময়-কর সন্দেহ নেই।

কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়কর যে কি কারণে অতুলপ্রসাদী গান রবীন্দ্র সঙ্গীতের সর্বব্যাপী প্রভাব ও জনপ্রিয়তার পাশে জনমনে এমন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হল।

এর সদ্‌উত্তর হল অতুলপ্রসাদী সুর। ইন্দ্রধনুর বিভিন্ন রঙের বিচিত্র ছটার মতই বৈচিত্র্যময় তাঁর সুরসৃষ্টি যা মানুষের মর্ম স্পর্শ করে নতুনত্বের চমক জাগায়, আনন্দে মনপ্রাণ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, আবার ,আর্তবেদনার তীব্রতায় হৃদয়বিদারি অশ্রুধারায় বিগলিত হতে হয়।

তাঁর গান যেন এক মহৎ শিল্পীর দুঃখ-সাধনার পর জাগতিক সব কিছুর উর্ধ্বে পরম প্রেমের রাজত্বে অবাধ বিচরণ।

অতুলপ্রসাদের উইল

By this my last Will and Testament executed on this third day of May, Nineteen hundred and thirty, I, Átul Prasad Sen, Bar-at-law, at present practising at Lucknow, revoke and cancel all my previous Wills registered or unregistered, and bequeathe in Trust all my moveable and immoveable properties which belong and will in future belong to me at the date of my death, as follows :

Trustees and Executors :

I hereby appoint Mr. Hemantakumar Ghose, Bar-at-Law, Lucknow, and my cousin Mr. Sudhindra Chandra Das, Bar-at-Law, Lucknow, executors and trustees under this my Will and they will hold all my moveable and immoveable properties in trust and disburse the income thereof and carry out the purposes of this my Will and trust in accordance with the terms of this deed, my Will, and the powers which they have under the law.

On the demise or default of any of the two Executors and Trustees the other will appoint a competent person in his place who will have all the powers and duties of the outgoing Executors or Trustees.

The two Executors and Trustees will have power to and will preferably appoint in their place the Managing body (or Executive Committee and Managing Committee as it may be called) of the Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta after the said body has been registered, as Trustees and Executors, and the

said body will have all the powers of the Executors and Trustees under this Will.

In default of both the Trustees and Executors and in case they have not appointed the said Managing Body of the Sadharân Brahmo Samaj, Calcutta, the District Judge, Lucknow, will kindly appoint two competent Trustees or the said Managing Body of the Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta, Trustees to carry out the provisions of this Will.

The two Trustees can by mutual arrangement entrust the duties of carrying out the provisions of this Trust and Will to any one of them.

The Trustees and Executors whoever they may be will have power to sell or transfer my properties moveable and immoveable if they deem it proper and convert them into money and diposit the same into some safe Bank, say Imperial Bank of India, and pay the Beneficiaries under this Will from the income or interest of the investment. The Beneficiaries under my Will will be paid out of the usufruct or income of my properties and not out of the properties themselves.

Beneficiaries under my Will :

1. My wife Hem Kushum Sen will receive one hundred rupees per month for her life, and this, in view of the income from my assets and in view of the fact that she has received a legacy of twenty-five thousand ruppees from her father Sir K. G. Gupta, and other circumstances which need not be stated here, is a decent allowance. On her death this sum of one hundred rupees per month will revert to other charities mentioned in this Will and will proportionately augment the benefit

of which the Trustees may contribute towards other charities of similar nature.

2. My son Dileep Kumar Sen will receive one hundred rupees a month for his life only and after his death this sum of one hundred rupees a month will be spent on charities mentioned in this Will or other religious or social or educational charities of similar kind.

The Trustees will also pay the premium of the Life policy for Ten Thousand rupees in favour of Dileep Kumar Sen started by me in the Empire of India Life Insurance Co. till it is mature for payment to him.

3. Whatever remains out of the income and usufruct of my properties after the payment of above allowances will be distributed as under. If the income or usufruct are not sufficient to meet the total sum the benefit will be proportionately reduced or if there is surplus this benefit will be proportionately increased or the surplus may be spent by the Trustees on other similar charities.

(a) Ramkrishna Mission Sevashram's wing *Hemanta Seva Sadan* erected in memory of my beloved mother will receive rupees twenty five (Rs. 25) per month. This charity will receive preference to other charities.

(b) To charitable institutions organised by or under Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta rupees twenty five per month (Rs. 25 per month) and the Trustees will select them.

(c) Charities to be distributed at Dacca (Bengal) under the auspicies of the Dacca Sadharan or Nababidhan Brahmo Samaj rupees twenty five per month. The Trustees will make the selection.

(d) Pancha Palli Guru Ram High School in or near my village home Maigar, Sub Division Mandaripur, District Faridpur, Bengal, will receive twenty five rupees per month (Rs. 25 per month).

(e) Towards maintenance of Brahmo Missionaries rupees twenty five per month (Rs.25 per month).

(f) Bengali Club and Young Men's Association at Lucknow, rupees ten (10/-) per month.

(g) Bengalee Girls' School, Lucknow, rupees fifteen per month.

(h) Muslim Orphanage at Mumtaz Park or any other deserving Muslim Orphanage five rupees per month.

(i) Hindu or Arya Samaj Orphanage at Lucknow or elsewhere rupees five per month.

(j) Any other similar charities which the Trustees select and which the Fund (income) will permit.

Properties : Properties at present owned by me are mainly these :—

(1) My home at Charbagh (A. P. Sen Road, Lucknow) and the land to the East of it.

(2) All my books (Law books and other books) and furniture and other goods and chattels.

(3) Motor car.

(4) Postal cash certificates of the value of ten thousand rupees.

(5) Life Insurance money due from Scottish Union and National Insurance Co. (Policy No. 78100).

(6) Other shares.

(7) Income out of the publication of my books of songs (   ) and Gramophone records (composer's royalty.

May God bless this Will and Testament.

Executant and Testator.

Atul Prasad Sen.

3. 5. 30.

Witnesses :—

(1) M. H. Kidwai (of Mushir Manzil, Jopling Road, Lucknow), 3. 5. 30.

(2) Janki Prasad, clerk to Mr. A. P. Sen. 3. 5. 30

অতুলপ্রসাদের বংশ তালিকা

- রামধন সেন
  - রাজবল্লভ সেন
    - কৃষ্ণচন্দ্র সেন
      - দুর্গাপ্রসাদ
      - ভবসুন্দরী
      - গুরুপ্রসাদ
        - সত্যপ্রসাদ
      - উমাতারা
      - রামপ্রসাদ
        - অতুলপ্রসাদ
          - দিলীপকুমার
            - মালা
        - হিরণ্ময়ী
        - কিরণময়ী
        - প্রভাবতী

যাঁরা ব্যক্তিগত সাক্ষাতে সাহায্য করেছেন

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅশোকপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅমৃতলাল নাগর
শ্রীযুক্তা ঊষা হালদার
শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দত্ত
শ্রীগোপালচন্দ্র সিন্‌হা
শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্ত
শ্রীযুক্তা ছায়া মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্না সেন
শ্রীত্রিলোকী সিং
শ্রীদিলীপকুমার সেন
শ্রীদিলীপকুমার রায়
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল
শ্রীনলিনীবিহারী হালদার
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ আদিত্য
শ্রীপাহাড়ী সান্যাল
শ্রীযুক্তা বেলা সেন
শ্রীবসন্তকুমার ঘোষাল
শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীভাইয়াজী
শ্রীভিক্টর নারায়ণ বিদ্যান্ত
শ্রীযুক্তা মীরা চৌধুরী
শ্রী এম. রহমন
শ্রীরাজনারায়ণ শুক্লা
শ্রীযুক্তা ললিতা দাস
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসত্যজিৎ রায়
শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
শ্রীসঞ্জীবকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীসুধীন্দ্রচন্দ্র দাস
ডাঃ এস. এন. বোস
শ্রীযুক্তা স্নেহলতা চৌধুরী
শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ
শ্রীহরগোবিন্দ্ দয়াল শ্রীবাস্তব
শ্রীহরিসেবক মিত্র

এই গ্রন্থের অনেক তথ্য সেন পরিবারের একজন নিকট আত্মীয়ার কাছে পেয়েছি। তিনি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক; সেইজন্য তাঁর নাম প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

যে সব ডায়েরী, প্রবন্ধ ও পুস্তকাদির সাহায্য নিয়েছি

অতুলপ্রসাদের ডায়েরী : শ্রীযুক্তা বেলা সেনের সৌজন্যে

সত্যপ্রসাদ সেনের ডায়েরী : শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্না সেনের সৌজন্যে

সত্যকুমার মুখোপাধ্যায়ের ডায়েরী : শ্রীসঞ্জীবকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

শিশিরকুমার দত্ত-র ডায়েরী : শ্রীরণজিৎ কুমার দত্তের সৌজন্যে

জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরী : শ্রীকমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

'উত্তরা' এবং অতুপ্রসাদের কবিতা ও চিঠিগুলি } শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সৌজন্যে

সত্যপ্রসাদ সেনকে লেখা অতুলপ্রসাদের চিঠিগুলি : শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্না সেনের সৌজন্যে

শোকজ্ঞাপক পত্রগুলি : শ্রীযুক্তা বেলা সেনের সৌজন্যে

অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছ : বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

অতুলপ্রসাদের উইলের নকল : শ্রীযুক্তা বেলা সেন ও সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সৌজন্যে

জুবিলী গার্লস্ কলেজের ইতিহাস : শ্রীযুক্তা কমলা ঘোষের সৌজন্যে

আমার কয়েকটি রবীন্দ্র-স্মৃতি : অতুলপ্রসাদ সেন : উত্তরা

তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে : কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : উত্তরা

অতুলপ্রসাদ : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : উত্তরা

অতুলপ্রসাদ সেনের জীবন ও গান : রাধাকমল মুখোপাধ্যায় : উত্তরা

অতুলদা : অসিতকুমার হালদার : উত্তরা

স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেন : রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় : উত্তরা

স্মৃতিকথা : শ্রীঅমল হোম : উত্তরা

সুরেলা : শ্রীদিলীপকুমার রায় : উত্তরা

অতুল : সুবালা দেবী : উত্তরা

এ. পি. সেন : সি. ওয়াই. চিন্তামণি : উত্তরা
কবি অতুলপ্রসাদ সেন : পাঁরুল দেবী : উত্তরা
অতুলপ্রসাদ সেন : সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : উত্তরা
মর্মর মূর্তি স্থাপনা দিবসে ভাষণ : সরোজিনী নাইডু : উত্তরা
অতুলপ্রসাদী গান : জয়দেব রায় : উত্তরা
সঙ্গীত স্মৃতি : পরিচয় এবং গানের স্মৃতি : (লক্ষ্ণৌ পর্ব)
শারদীয়া কালান্তর : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেন : শ্রীযুক্তা বেলা সেন : আমাদের কথা
গীতকার অতুলপ্রসাদ সেন : শ্রীযুক্তা রেণুকা দাসগুপ্ত : আমাদের কথা
খুল্লতাত স্মরণে : শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্না সেন : আমাদের কথা
অতুলপ্রসাদ ও তাঁর গান : রণজিৎ সেন (টুলু সেন) : আমাদের কথা
অতুলপ্রসাদ স্মরণে : শ্রীযুক্তা ললিতা দাস : আমাদের কথা
সুরে ভরা দিনগুলি : শ্রীযুক্তা সাহানা দেবী : দেশ
রবীন্দ্র দর্শন : হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
মুক্তির সন্ধানে ভারত : যোগেশচন্দ্র বাগল
পিতৃ-স্মৃতি : বিমলা দাস
আচার্য কেশব : গৌরগোবিন্দ রায়
ঘরোয়া : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ
দীনেন্দ্রনাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ : আদিনাথ সেন
বাংলার গীতকার : রাজ্যেশ্বর মিত্র
ঢাকার ইতিহাস : যতীন্দ্রমোহন রায়
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র : জি. সি. বি.
The Centenary report of High Court of U. P.
Historic Lucknow—Sydney Hay
Indian Annual Register—Mitra : শ্রীতরুণেন্দ্রনাথ মিত্রের সৌজন্যে
ভারতের জাতীয় আন্দোলন } প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র জীবনী } প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

চিত্তরঞ্জন
শিক্ষাগুরু আশুতোষ } মণি বাগচি

তীর্থঙ্কর
স্মৃতিচারণ : দ্বিতীয় খণ্ড } দিলীপকুমার রায়

মনে এলো
ঝিলিমিলি
বক্তব্য } ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দির গীতিকবিতা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

অতুলপ্রসাদের গান
অতুলপ্রসাদ } শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় : উত্তরা

Condolence Speeches by :

(i) Hon'ble Chief Justice Mr. Bisweswar Nath Srivastava, Oudh Chief Court, Lucknow.

(ii) Dr. R. P. Paranjpye, Vice Chancellor, Lucknow University and

(iii) Dr. Jagat Narain Mulla :
(By Courtesy of Sri S. N. Ghosh, Editor, The Pioneer, Lucknow.)

যাঁরা চিঠির মাধ্যমে সাহায্য করেছেন

স্বামী দেবেশানন্দজী মহারাজ : রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ
শ্রীবিজনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীএস. এন. রতনঝঙ্কার

যাঁরা ছবি দিয়ে সাহায্য করেছেন

শ্রীযুক্তা বেলা সেন
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল

সংযোজন

বই ছাপা হয়ে যাবার পর কিছু কিছু নতুন তথ্য পেয়েছি এবং সেই অনুসারে কিছু অদল বদল করা হল।

৫ পৃষ্ঠার ১৬ লাইনে ৫ চিহ্নিত উক্তিটি সত্যপ্রসাদ সেনের নয়; সেন পরিবারের একজন নিকট আত্মীয়ার কাছে শোনা। কিন্তু সত্যপ্রসাদ সেনের ডায়েরীতে আছে "...এমন কি স্ত্রী হেমন্তশশীকেও বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতেন।"

১২ পৃষ্ঠার ৯ লাইনে "হে প্রাণারাম তোমায় প্রণাম করিতেছি" এই উক্তিটি কালীনারায়ণ গুপ্তর এবং উহা " " ডবল কোটেশনের মধ্যে থাকবে।

৩৫ পৃষ্ঠার ১ লাইনে ১৯০১ সালের বদলে—'১৯০২ সালের ৩রা জানুয়ারী' হবে।

৪৩ পৃষ্ঠার ৭ লাইনে—'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হয়' হবে।

৭১ পৃষ্ঠার ১৮ লাইনে ১৯১১-১২ বদলে—'১৯১৩' হবে। এই পাতার ১-এর ফুটনোটের লেখাটির বদলে—'অতুলপ্রসাদ ১৯১৩ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে কলকাতা যাবার পূর্ব পর্যন্ত লখনৌ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। এই পদে থাকাকালীন তিনি Public Works Committee, Public Health Committee এবং Education Committee-র সদস্য ছিলেন' হবে।

২৫শে আগষ্ট, ১৯২৩-এ বেনারসে অনুষ্ঠিত প্রদেশীয় লিবার‍্যাল ফেডারেশন পার্টির অধিবেশনে সভাপতিরূপে অতুলপ্রসাদ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন :—

"The event that dominates our mind at the present moment is the decision of the British Cabinet about Indians in Kenya. That decision has deeply wounded our self-respect, and it has made us pause and reflect as to the future course of our conduct. Kenya question is not a local question. It has raised large issues. The controversy has brought into prominence serious problems affecting our attitude towards the British Empire. It has once again disclosed to us the ugly truth that race prejudice still prevails in the counsels of the Empire; that the imperial doctrine of equal citizenship is a snare; that threats of aggression have proved more effective than power of persuasion".

It is difficult to speak with restraint regarding the treatment of Indians in most of the white colonies especially South Africa where our is even worse than in Kenya. In Natal things are daily getting from bad to worse. In the Transvaal and else where in Africa, the Boers are openly hostile to Indians and they treat Indians like helots.

Can we take no practical measures to demonstrate our resentment? I believe we can. South Africa exports large quantities of coal to India; so much so that this year some of the Indian coal mines had to be closed down because of the abundant import of cheaper South African coal. Dictates of self-defence and self-respect alike demand the Government should stop this import altogether. It ought not to be beyond the resources of the people and of the Government to devise an effective scheme of stern reciprocity. More than what we will lose materially in following such a course we will gain in self-respect.

THE REFORMS

Mr. Sen next dealt with the question of reforms and said :—

I do not for a moment concede that there is not a sufficient number of Indians available in each province who can competently discharge the duties of administration. What is the experience of the last three years Can it be asserted that Ministers in charge of transfered departments had been found inefficient and

unable to shoulder their duties? On all reports they have proved themselves perfectly able to administer their respective department and they do not suffer by comparison with their European colleagues in the reserved branch of the administration. In the Provinces, therefore, we must ask for complete control.

As regards the Central Government, we are as strong as ever in our belief that without substantial popular control over many of the subjects of the Imperial concern, we cannot make a real advance towards Swaraj. I maintain that all subjects except defence, foreign affairs, relation with Indian States and ecclesiastical affairs should be transfered to the popular control in the Central Government. As these expected subjects appertain to matters which partly concern affairs outside the limits of India, we are content for the present not to press our claims with regard to them. I am not prepared, however, to concede that Indian representatives should have no voice in relation to these subjects. Their views should be consulted and they should be allowed to influence final decisions.

HINDU MOSLEM RELATIONS

Having spoken in favour of limitation of the Viceroy's powers of certification and in condemnation of the salt tax, Mr. Sen turned to the question of Hindu-Moslem relation and said :—

It will be mere affectation to deny that the relationship between the two communities is not all that could be desired. The Liberal Party has as lively a sense of supreme importance of perfect amity between the two communities, as any other political party in India. My own idea is that in the past many of our attempts, at bringing about an approachment between these two sections of Indian population have been conceived from a wrong stand point. Unity that is based on a common grievance or common dislike of another is a transient thing, and has little moral value. Unity of which a common provocation is the only cement is a thing of the moment and has no life. The tie of hatred is an ephemeral tie. I want some thing more enduring than even the Khilafat agitation to bring the two communities together.....

I will tell you my own conviction in the matter. Passionately as I desire harmony and friendship between Indians professing different faiths, I sincerely feel that for a true foundation of that unity we must come nearer home. All of us realise that without Hindu-Moslem unity Indians cannot be a nation. With-

out that there can be no internal peace in the country. Without that the mission of India can never be fulfilled. Without that Swaraj is a mere dream. How shall we attain that unity? A little introspection will convince us that at the root of this disunion is ignorance, religious intolerance and social prejudice. It is more knowledge, mutual, social respect, large religious tolerance and common love of India that must be at the base of lasting amity between different communities of our country. India is a land of divorce creeds and of diverse social system. How are we to bring all these diverse elements into friendly relationship then?

The remedy lies in discovering the fundamental unity of all varieties. When Hindus, Moslem, Christians, Buddhists, Sikhs, Zoroastrians and numerous other denominations in India realise the basic unity of their faiths, they will find out the futility of clash of creeds. In India of all place in the world must be found a secret of ultimate harmony of human faiths. Religious tolerance will only come when people realise that they are all worshipper of but one God and that they are all children of the same Father. True fraternity will then be established. Then a Hindu will not spurn a Moslem as a Mlechha. The Mohomedan will not reject a Hindu as a Kafir; the Christian will not regard others as heathens. It should be the endeavour of all who are interested in the welfare of India and of humanity to preach and practice this doctrine in their public utterances and public life. The spread of knowledge alone will bring the fanatical and ignorant sections of Indian communities to a sense of appreciation of this attitude of mind. It may be a slow process, but it is the only sure panacea.

Political provocation will not make us a nation. Proselytising propaganda will not make us one united whole. We must dive deep within ourselves and find out the essential concord of all creeds, otherwise fanaticism will inflame disunion, narrow sectarianism will raise numerous dividing walls, and India will remain where she is.

THE LIBERAL PARTY

I cannot let this occasion pass without saying a few words about the party to which I have the honour to belong. I am anxious to clear certain misconceptions regarding our party. Nothing is further from fact that we are merely a party of supporters of the Government right or wrong. Those who judge our party fairly recognise that we have on several occasion opposed

Government measures when we thought they were harmful. True, we have not indiscriminately opposed the Government. But it is not because we have been fawning for favour, but because we thought that even the Government need not always be wrong. Opinions may differ as to whether we were right in so thinking; but pray, do not question the motives of the Liberal Party. The constitutional action to which we adhere is often made the subject of taunt and hostile criticism. Doubtless we have been disappointed in some of our anticipations as regards the progress of reforms; I do not deny that our attitude to-day is more of opposition than of discriminate co-operation. May I in all humility ask those who taunt us whether they have not been driven to change their programme of work in the light of new experiences? Mahatma Gandhi declared the "boycott" of Councils as the "pivot" of his moment. There is a large and growing party among the followers of Mahatma who would break that pivot and enter the Council. Within the Swaraj Party itself there are different camps of responsive co-operation, responsive non-cooperation and irresponsive obstruction. Let me not be misunderstood I do not for a moment complain of any change of opinion or of programme. New experiences justly have new experiments. But those who seriously find fault with our constitutional methods will perhaps allow that the process of entering Councils and of being in opposition, however constant, is a recognised constitutional method. I will not mention names, but some of the stalwart Congressmen have confessed to me that it is a form of constitutional agitation. Is it not the Liberal Party therefore entitled to be more charitable judged for its methods.

We are accused in certain quarters of being hostile to landlord. It is an unjust accusation. If we have advocated the cause of tenants, it is not because we were in any way antagonistic to the interest of the Landowners, but because we thought that the claim of the cultivators for better security and easier terms of tenure called for our support both in their own interest as well as in the ultimate interest of the proprietors of the soil. Surely it would not be urged seriously that the tenants had no grievances which needed remedy. If therefore on any particular occasion the Liberal Party expoused their cause and strove to remove some of their grievances, our friends, the landlords, have no reasonable ground for complaint. Has not the Liberal Party strongly supported the claims of Zemindars for longer settlements? I would beg the landlords to believe that we have no animus against them. We are as much their friends as we undoubtedly are of the tenants.

২১শে অক্টোবর, ১৯৩৩ এ এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত প্রদেশীয় লিবারাল ফেডারেশন পার্টির অধিবেশনে সভাপতিরূপে অতুলপ্রসাদ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন :—

After thanking the conference for being elected President for the responsible and delicate task of guiding the deliberations at this critical period of constitutional development, Mr. Sen said that his first melancholy duty was to offer homage to the memory of the great leaders whom India had lost within recent times. He paid eloquent tribute to the services done to the country by Mrs. Annie Besant, Pandit Motilal Nehru, Sir Bipin Krishna Bose, Mr. Hasan Imam, Sir Ali Imam, Mr. J. M. Sengupta and Babu Anand Sarup.

THE REFORM

Proceeding the speaker said that the chief subject for the consideration of the conference must naturally be the scheme of constitutional changes embodied in the White Paper. He had hope that in view of the persistent claim of Indians of all parties for complete Provincial Autonomy and responsibility in the Central Government at least in the entire sphere of internal civil administration, the British Government would recognise the wisdom of conciliating India by formulating a scheme of reform which would constitute a step forward towards the goal of Indian Self-Government.

The proposals of White Paper were subject to further alternations by the Joint Committee and also by the two Houses of Parliament, during the passage of the Constitution Act, but he would be a blind optimist who hope that, as a result of the deliberation of the Joint Committee and the discussion in the Parliament the White Paper proposals would be improved upon or the modifications effected would be satisfactory from an Indian stand point.

The chances were that further concessions would be made to the persistent clamour of the Diehards of Great Britain, led by Mr. Churchill and Lord Lloyd. The Diehards had not been defeated but had only been put off by the assurance that White Paper proposals were not final.

NOT DOMINION STATUS

Continuing he said that the constitution formulated in the White Paper proposal was certainly not Dominion Status nor any real self-government either in the Province or the Centre, nor was it truly a government responsible to its people through its legislatures.

The White Paper appear to be a mere catalogue of safeguards rather than proposals for real autonomy. Whatever autonomy there might be in outward appearance, it was more or less neutralised by the numerous limitations with which these so-called reforms were hedged.

Repeatedly, political India had asked for Dominion Status or a very substantial instalment. His Majesty's Government, through their accredited agent, declared that Dominion Status for India was Government aimed at. When the Labour Government was in power, hopes were raised in the minds of the Indian people that Dominion Status was in sight, but there was a dramatic change for the worse since the advent of the Conservative Party into power. Attempt had since been made to explain away the declarations made by the previous Viceroys and Secretaries of State for India and the policy of the Government had become retrograde and the expression "Dominion Status" was carefully avoided even as pious hope.

The speaker then dealt with the broad features of the White Paper scheme and criticised them in detail:

"I cannot conclude consideration of the White Paper proposals without drawing attention to another vital defect in the scheme. The future constitutional development and political profress of India is not to be in our hands. The scheme makes no provision for self-development. For every constitutional step forward we shall have to depend upon the sweet will of our rulers. We are not to be the architects of our own destiny, but are to be supplicants to another nation for favour. England is to determine the stage and pace of India's progress and Indian is to remain as hopeless as before in the matter of self-development. No self-respecting Indian can help feeling humiliation at such an abject position. If the scheme has been devised to conciliate Indian aspirations, then it will prove to be an utter failure: if, however, it is intended to secure British interests it may be deemed to be a success. If the intention is to put off a real advance towards self-government for yet a long time the scheme of White Paper successfully carries out that intention".

SAFEGUARD

The speaker said, the constitutional safeguards were more in British interest than in the interest of India and the so-called hadges did not protect Indian interests but stood in the way as hindrances to progress.

Mr. Sen was astounded to find that there were men in England who considered even this White Paper scheme disastrous to British interest and to the peace and tranquility of India herself. If the Diehards succeeded in throwing out the White Paper proposal, he said, they would have won victory over a shadow.

Indian themselves were to be blamed for many of their ills. In a country divided by so many religions and sects, communities, castes and sub-castes and difference of language, the task of building up a united nation was fraught with considerable difficulties.

COMMUNAL PROBLEM

The gravest menace to harmonious progress was the existence of communal discord. Hindus, Muslims, Christians and other religious communities of India must cultivate religious of the Harijans with such devotion.

The communal unity could not be achieved by the mere adjustment of electorates or the allotment of offices and favours. Without unity of heart, which could only be brought about by mutual tolerance, there could be no communal concord in India.

The necessity of the social reconstruction of Hinduism in the interest of the national salvation was urged by the speaker who express gratitude to Mahatma Gandhi for taking up the cause of the Harijans with such devation.

Referring to the terrorist movement the speaker said that it was with sorrow that he recognised the existence of revolutionary parties in India. Smarting under the humiliation of the political, domination of India by another country and due to many economic causes, some young men belonging to respectable families had strayed into the evil path of anarchy. Revolutionary violence was morally sinful and politically indefensible and he appealed to those young men to desist from such activities which were against the moral traditions of Indian civilisation and were politically wrong and injurious.

APPEAL TO CONGRESS

The speaker then appealed humbly to the Congress Party to consider in the light of experience, whether there was any use of continuing the civil disobedience movement in any shape or form. He shrewdly suspected that many of those who supported the movement had discovered the futility of its continuance.

He felt that in the present stage of the country the movement was not likely to be successful. He was honestly convinced that India would have been better off if Indian enthusiasm and Indian sacrifice were utilised for some other patriotic movement.

Reverting to constitutional matters, he said that he was not one of those who held that no good had come to India out of the connection with the British. On the contrary he honestly believed that India had profited much by that connection. But he was not blind to the evils that had grown from their political subjection.

He did not consider that all the country's misfortunes were attributable to the British connection. He was of opinion that for much of their misfortunes the blame must be laid at Indians own door. He implored his country-men to do all that lay in their power for the regeneration of the country so that India would be in a better position to fight her battle against the force of reaction.

(By Courtesy of Sri S N. Ghosh, Editor. The Pioneer, Lucknow)